সূচী।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত।

সূচনা।

প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দেহ-লীলার অবসান হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে তাঁহার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়। তাঁহার কণ্ঠে মধুর হরিনাম শ্রবণ করিয়া একদিন বঙ্গবাসী উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছিল, ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বঙ্গদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। যতদিন ভক্তির আদর থাকিবে, বঙ্গবাসীর প্রাণ হরিনামের মাহাত্ম্য অনুভব করিবে, ততদিন তাঁহার পুণ্য-নাম বিলুপ্ত হইবে না।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের নামের সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন মহাপুরুষের স্মৃতি এ দেশের নরনারীর প্রাণে মুদ্রিত রহিয়াছে। তিনি শান্তিপুরের গোস্বামী বংশোদ্ভূত মহাত্মা অদ্বৈতাচার্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মের পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশ ঘোর তার্কিকতা ও প্রাণ-হীন ক্রিয়া-কাণ্ডে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, ভক্তি-দেবী যেন অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন, তখন দেশের হীনাবস্থা দর্শনে তিনি ব্যথিত-চিত্তে অশ্রুপাত করিতেন; এবং মাতা যেমন অন্ধকার রজনীতে প্রদীপ জ্বালিয়া বিপথগামী পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করে, তিনিও তেমনি দেশের ঘোর দুর্দ্দিনে ধর্ম্মসাধনার প্রদীপ জ্বালিয়া দিনের পর দিন আশাবদ্ধ হৃদয়ে কোন মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা

করিতেন। প্রবাদ এই, ইঁহার ঐকান্তিকী প্রার্থনার বলেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করেন; এবং বঙ্গসমাজ পুনরায় ধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়া প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য অদ্বৈত-গোস্বামীর জ্ঞান-গভীরতা ও তপস্যার প্রভাব বঙ্গদেশে কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার তপস্যার ফল ব্যর্থ হইবার নয়। সেই তপস্যার ফলে তাঁহার কুল পবিত্র হইয়াছে, জননী জন্মভূমি কৃতার্থা হইয়াছেন; এবং অদ্বৈত বংশে কত কত ভক্ত-সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশের নরনারীর ভক্তিশিক্ষার সহায় হইয়াছেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই স্বনাম-ধন্য অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর।

বিজয়কৃষ্ণের পিতৃ-দেব আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্মভীরুতাদি নানা সদ্গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি বশতঃ তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দরের অর্চ্চনা ও সেবা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। যে কাষ্ঠদ্বারা দেবতার ভোগ রন্ধন হইত তিনি উহার প্রত্যেক খানি গঙ্গা-জলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতেন। এ কারণ শান্তিপুরের লোকেরা তাঁহাকে "লাকড়ি-ধোয়া গোঁসাই" বলিত। ভক্তি-গ্রন্থ পাঠে তাঁহার এরূপ অনুরাগ ছিল যে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন; ক্ষণে ক্ষণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হইয়া পুস্তকের পাতা ভিজিয়া যাইত; আর মাঝে মাঝে 'রাধাকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া এমন হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন যে তাহাতে দূরস্থ লোক পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিত। তিনি সর্ব্বদা গলদেশে শালগ্রাম-শিলা ধারণ করিতেন; এবং স্বীয় বাস-ভূমি শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে পুরীর জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। মৃত্তিকার ঘর্ষণে তাঁহার বুকে ঘা হইয়া গিয়াছিল; সঙ্গে তাঁহার এক পিসী ছিলেন, তিনি ঘায়ে কাঁথা জড়াইয়া

দিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও নিরস্ত হন নাই। এইরূপ কঠোর ক্লেশ-সহকারে শ্রীগন্নাথ দর্শনের পর তাঁহার এই ক্ষণজন্মা সন্তান বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়।

সাধনার প্রিয়-সন্তান বিজয়কৃষ্ণ উত্তরকালে যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও ক্লেশ-স্বীকারের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রেরই উপযুক্ত। পিতার এই সাধন-নিষ্ঠা মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন।

আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় শিষ্য-ব্যবসায় ও ভাগবতাদি শাস্ত্র-পাঠ দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। শিষ্য-ব্যবসায়ী হইয়াও তিনি শিষ্যের বিত্তাপহারী ছিলেন না; বরং নিঃস্ব দরিদ্র শিষ্যদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার ঈদৃশী সহৃদয়তা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা আপামর সাধারণের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির কারণ হইয়াছিল। তিনি অকালে দুইবার বিপত্নীক হন; এবং বহুদিনান্তর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। এই শেষোক্ত পত্নী স্বর্ণময়ীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ব্রজগোপাল এবং কনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়।

জননী স্বর্ণময়ীদেবী নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। দয়া, ঈশ্বর-ভক্তি এবং উদারতাতে এই নারী আবালবৃদ্ধ সকলের ভক্তি ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। জাতিনির্ব্বিশেষে দীন দুঃখীর অভাব মোচনে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যগ্র হইতে দেখা যাইত। তাঁহার হৃদয় আকাশের ন্যায় প্রশস্ত ছিল; তিনি আত্মপর বিচার বিরহিত হইয়া সকলকে ভাল বাসিতেন।

কোন সময়ে তাঁহার গৃহে একটি পরিচারিকার পুত্র প্রতিপালিত হইত; তিনি নিজ পুত্রদিগের সঙ্গে তাহার কোনরূপ প্রভেদ করিতেন না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ একদিন মায়ের ভালবাসার কথা এইরূপ বলিয়াছিলেন,—"তিনি দাসী-পুত্রকে আমাদের সঙ্গে তুল্যরূপ ভালবাসিতেন একখানা থালা, একটী ঘটী, একটী গেলাস, একখানা পিঁড়ে তাহাকেও

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।” এ বিষয়ে অপরের কোনরূপ কথায় তিনি কর্ণপাত করিতেন না; বরং দাসীপুত্র বলিয়া কেহ অবজ্ঞা করিলে বেদনা অনুভব করিতেন। কৃপণদিগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দুঃখের সহিত বলিতেন, “আহা, ইহারা বড় কৃপার পাত্র, ইহারা নিজের মহাপ্রাণীকে সর্ব্বদা বঞ্চিত করে।” এজন্য তিনি কৃপণদিগকে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন।

অপরকে খাওয়াইয়া তাঁহার এত সুখ হইত যে, প্রতিদিন অন্ততঃ চারি পাঁচ জন লোককে না খাওয়াইলে তৃপ্তি বোধ করিতেন না। তিনি বিধবা-বস্থায় বহুদিন সংসারে ছিলেন। এজন্য অনেক সময় স্বপাকে একাকিনী আহার করিতেন; কিন্তু বলিতেন, “যে কেবল আপনার জন্য রান্না করে সে শেয়াল কুকুরের মত; পাঁচ জনের কম কিছুতেই রান্না করা উচিত নয়।” এজন্য পাঁচ ছয় জন লোকের উপযোগী দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া লোকদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন।

তাঁহার হৃদয় এরূপ কারুণ্য-পূর্ণ ছিল যে, লোকের দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার তাঁহার গৃহে—শান্তিপুরে—এক কাষ্ঠ-বিক্রেতার সঙ্গে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের কাঠের দর লইয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল; কাঠওয়ালা একদর, এবং গোস্বামী মহাশয় অন্য দর বলিতেছিলেন। কাঠওয়ালা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, ‘আপনি মা-ঠাকুরাণীকে ডাকুন।’ ইতিমধ্যে মাতা তথায় আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন; এবং বলিলেন, ‘গরীব লোকের দুই চারি আনা মারিয়া কি তুই বড় লোক হবি? উহা-দিগের সহিত গোল করিস্ না, উহারা যা’ চায় তা’ই দে। উহারা গরীব লোক, উহাদিগকে কিছু বেশীই দিতে হয়; নতুবা উহাদের স্ত্রী-পুত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?’

এই দয়াবতী নারী অনেক সময় শান্তিপুরের বাজারে যে সমস্ত দুঃখিনী

বিধবা শাকসব্‌জী বিক্রয় করিতে আসিত, এবং তাঁহারই গৃহের পার্শ্বদিয়া চলিয়া যাইত, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। তাহাদের শুষ্ক-মুখ দেখিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিত; তিনি তাহা-দিগকে না খাওয়াইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি এরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন যে, কাহারও দুঃখ দেখিলে নিজের অভাব ভুলিয়া গিয়া শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দান করিতেন।

টাকা পয়সার বিষয়ে তিনি আপন পর হিসাব করিতে জানিতেন না। একবার শেষ বয়সে তিনি যখন ঢাকায় যাইতেছিলেন তখন একজন ভদ্র-লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু এই ভদ্র-লোকের পাথেয় ছিল না। তিনি নিজের গাঁঠুরী বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে পাথেয়ের সংস্থান করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। অকপট বাৎসল্যে মানুষের মন কিরূপ নির্ম্মল হয় এই নারীর জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার জননীর কথা-প্রসঙ্গে এক দিন বলিয়াছিলেন,—"আমি বিদেশে যদি কোন আঘাত পাইতাম, রোগযন্ত্রণায় কাতর হইতাম, অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়া মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী এক এক দিনের ঘটনা আশ্চর্য্যরূপে উল্লেখ করিতেন। গয়ার পাহাড়ে এক দিন পাথরে পা ঠেকিয়া আমার এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলাম। পরে বাটী আসিলে মা বলিলেন, 'তুই কি একদিন আঘাত পেয়েছিলি? পায়ে পাথর ঠেকিলে যেমন আঘাত লাগে, হঠাৎ এক দিন আমার তেমনি হ'ল। আমি ভাবিলাম ঘরে বসে আছি, পাথর কোথায়? তখন তোর ডাক আমার কাণে বাজিল। মনে হ'ল তুই কষ্ট পেয়েছিস।' তিনি এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ করিতেন।"

এমন পুণ্যশীলা স্নেহবতী নারী যে শিশুর পোষণ করিয়াছেন, স্তন-দুগ্ধের

সঙ্গে সঙ্গে যে শিশুর মনে স্বীয় মনের মহদ্ভাব-নিচয় অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছেন, তাঁহার ভবিষ্য জীবনের গতি কোন্ দিকে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ভবিষ্যতে যে করুণাপূর্ণ, শুদ্ধ, ভক্তিময় জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার পিতামাতা এবং পূর্ব্ব পুরুষগণের চরিত্রের প্রভাব তাহাতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী জীবনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বঙ্গদেশের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি রূপে গণ্য হইয়াছিলেন। চরিত্রের নির্ম্মলতা, ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা, এবং ঈশ্বরে অকপট ভক্তি তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের নিকট এমন সুপরিচিত করিয়াছিল। পুরুষানুগত ধর্ম্মতৃষ্ণাবলে তিনি বাল্যে নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; তখন তাঁহাকে কুলগত রীতি নীতিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং সরল বিশ্বাসের সহিত গৃহদেবতার পূজার্চ্চনায় নিরত দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যৌবনের শিক্ষা, সংসর্গ ও সহজধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহার চিরাগত বিশ্বাসের পরিপন্থি হইয়া তাঁহাকে ঘোর সংশয়বাদে উপনীত করিল। তৎপর প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণাবলে আশ্চর্য্যরূপে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া একেশ্বরের পূজার্চ্চনা আরম্ভ করিলেন; এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়া দারুণ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক একেশ্বরের উপাসনা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তৎকালের জ্বলন্ত প্রচারোৎসাহ এবং ক্লেশ স্বীকারের কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

প্রচার, সেবা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় তাঁহার যৌবন অতীত হইল, কঠোর পরিশ্রমে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, তবু উৎসাহের লাঘব হইল না; প্রমত্ত উদ্যমে নরনারীকে ধর্ম্মোৎসাহে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না; ব্রহ্মযোগে মগ্ন হইয়া নিরাপদ অবস্থা লাভের প্রবলাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। এই ধর্ম্মোন্মত্ততা তাঁহাকে যোগশিক্ষায় প্রবৃত্ত করিল। হিন্দু যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া ক্রমে সকল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। এই অবস্থায় কোন

সামাজিক বন্ধন তাঁহার রহিল না, সকল সমাজ আমার, সকল সম্প্রদায় আমার প্রভুর, এই উদার ভাবস্রোতে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন।

তিনি সাকারোপাসনার পরিবর্তে একেশ্বরের পূজা আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যুক্ত হইয়াছিলেন, এখন যোগমার্গে অগ্রসর হওয়ায় ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করায় যদিও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতভেদ ঘটিল, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ—'ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান' তাঁহার চিরসঙ্গী রহিল। তবে ব্রাহ্মসমাজে যুক্ত থাকিতে সাকারবাদের প্রতি যে তীব্র প্রতিবাদের ভাব ছিল তাহা রহিত হইল। সমস্ত বাদ প্রতিবাদ রহিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রাণরূপে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রাণ পরব্রহ্মকে সর্ব্বভূতে দর্শন করাই মূলমন্ত্র হইল।

তাঁহার জীবনের এইরূপ বিবিধ অবস্থা ও মত পরিবর্ত্তনের মধ্যে এ লক্ষ্য হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই যে, 'ধর্ম্মের উৎস স্বরূপ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিতে হইবে, এবং দিবস-যামিনী তাঁহার সহবাসে বাস করিয়া নিরাপদ ও উদ্বেগ-বাসনা বিহীন হইতে হইবে।' এই লক্ষ্য সাধনে চিত্তের সরলতা, অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা, সত্যের অনুসরণে একনিষ্ঠতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। কোন মতকে ভ্রমপূর্ণ জানিয়া তিনি কখনও তাহার সমর্থ করেন নাই। যখন যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, সমগ্র উদ্যমের সহিত, লাভ ক্ষতির বিচার না করিয়া, সুহৃদ বন্ধুবর্গের বিরাগ সন্তোষের প্রতি উদাসীন হইয়া, তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। নিজের নিকট এবং ঈশ্বরের নিকট এইরূপ খাঁটি রহিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণের ও একান্ত শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তদীয় চরিত্রের এই বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার মত ও কার্য্যের সমালোচনা যথাসম্ভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ ঘটনা, উপদেশ ও উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার অকৃত্রিম

লোক-হিতৈষণা, প্রবল ধৰ্ম্মতৃষ্ণা, অনুরাগ, ভক্তি, ব্রহ্মানুভূতি শ্রদ্ধার সহিত এই গ্রন্থে বিবৃত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইরূপ একজন প্রভাবশালী সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। জ্ঞানে গুণে ও ধর্ম্মে উন্নত তাঁহার বহু শিষ্য ও বন্ধুজন বর্ত্তমান থাকিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ও অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত দুঃসাহসের বিষয়। এই দুঃসাহসের ফলে পদে পদে অক্ষমতা ও ক্রুটী লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হইক, এই গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি। যদিও ১৯০১ সন হইতে, ১৯১০ সন পর্য্যন্ত কতবার নিরস্ত হইয়াছি, তবু ঈশ্বর হইতে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ আসিয়াছে। তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ না পাইলে ইহা কখনও এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। এই ভক্ত-জীবনী সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিল, এজন্য সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে আমাদের ভূমিষ্ঠ প্রণাম, এবং পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট অক্ষমতার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বঙ্গাব্দ ১২৪৮ সনে ১৯শে শ্রাবণ, সোমবার (১৭৬৩ শক, ইংরেজী ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ ২রা আগষ্ট) ঝুলন পূর্ণিমার দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকুল গ্রামে, মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণের মাতুল গৌরীপ্রসাদ জোদ্দার একজন পরোপকারী, সহৃদয় লোক ছিলেন। ইনি একজন বিপন্ন লোকের জামিন হইয়া তাহাকে

টাকার দায় হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু লোকটী সময়কালে পলায়ন করে। ইহাতে জোদ্দার মহাশয়ের দ্রব্যাদি নিলামে ক্রোক হয়। যে দিন দ্রব্যাদি ক্রোক হইতেছিল ঐ দিন ঐ সময়ে স্বর্ণময়ী দেবীর প্রসব বেদনা উপস্থিত, এবং বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়।

কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে স্বর্ণময়ী দেবী কঠিন আমাশয়ের পীড়ায় অত্যন্ত রুগ্ন হইয়াছিলেন। তখন এক দিকে প্রসূতির অসুস্থাবস্থা, পক্ষান্তরে গৃহে দ্রব্যাদি ক্রোকের হাঙ্গামা। প্রসূতি ভয়ে সদ্যোজাত শিশুকে ন্যাকড়ায় জড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থের বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন, এবং পরে কবিরাজ আসিয়া মুসব্বর খাওয়াইতে বলিলে ভুলিয়া আফিং খাওয়াইয়া ফেলিলেন। ইহাতে ধনুষ্টঙ্কার হইয়া শিশুর জীবনাশা বিলুপ্ত-প্রায় হইল। কিন্তু ভগবৎ-কৃপাতে একে একে সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়া শিশুর জীবন রক্ষা হইল।

বিজয়কৃষ্ণের জন্মের অল্প দিন মধ্যে জননীকে শান্তিপুরে স্বামীগৃহে আসিতে হইল; এবং যখন শিশুর বয়স আট মাস তখনই মহা সমারোহে অন্নারম্ভ ও নামকরণ হইল।

আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা গোপীমাধব গোস্বামী পরলোক গমন সময়ে বিপত্নীক কনিষ্ঠকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার একটী পুত্রকে স্বীয় নিঃসন্তান বিধবা পত্নীর হস্তে দত্তক প্রদান করেন। আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় দত্তক প্রদানের পূর্ব্বেই পরলোক-গত হন। জননী শিশুর পাঁচ বৎসর বয়সে স্বামীর প্রতিশ্রুতি পালন জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া কৃষ্ণমণির হস্তে বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক প্রদান করেন। *

---

* শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামী মহাশয়ের বালক বিজয়কৃষ্ণ' গ্রন্থ দৃষ্টে সংশোধিত।

বালক বিজয়কৃষ্ণ গর্ভধারিণীকে মা এবং পালয়িত্রীকে মাজননী বলিতেন। এই পালয়িত্রী মা অধিক দিন জীবিতা ছিলেন না। সুতরাং অচিরে স্বর্ণময়ীর উপরই বালকের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল।

পঞ্চম বৎসর বয়সে বালক বিজয়কৃষ্ণের বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ ভগবান্ গুরুর পাঠশালায় প্রেরিত হন।

বালক বিজয়কৃষ্ণ মাতার সঙ্গে কখনও মাতুলালয়ে, কখনও শান্তিপুরে বাস করিতেন; এবং যখন যেখানে থাকিতেন সেখানকার পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষা করিতেন। যদিও শৈশবে পড়ার প্রতি তাঁহার বড় বেশী মনোযোগ ছিল না, এবং একাদিক্রমে একই পাঠশালায় অধিক দিন অধ্যয়ন করাও তাঁহার ঘটে নাই, তবুও স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে তিনি যখন যে পাঠশালাতে যাইতেন সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া গুরু-মহাশয়দিগের ভালবাসা লাভ করিতেন। তাঁহার প্রথম শিক্ষক ভগবান গুরু মহাশয় নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বেশী রাগ ছিল, রাগিলে যা, তা শব্দ উচ্চারণ করিতেন ও ছাত্রদিগকে মারিতেন। বোধ হয় অধ্যাপনা অপেক্ষা নিষ্ঠাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল; আর হয়ত উহাই তাঁহার প্রসিদ্ধির কারণ। বালক বিজয়কৃষ্ণ শিক্ষোন্নতি দ্বারা এই গুরু মহাশয়েরও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

এই গুরুমহাশয় সম্বন্ধে একটা গল্প আছে;—এক দিন ইনি বালক শিষ্যদিগকে বলিলেন, "ওরে ছেলেরা, কাল সকালে আসিস এক সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যা'ব, সেখানে আমি দেহত্যাগ করিব।" রাত্রিতে এই সংবাদ লোকের মুখে মুখে শান্তিপুরময় ব্যাপ্ত হওয়ায় পরদিন পূর্ব্বাহ্নে পাঠশালা স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধে পরিপূর্ণ হইল। গুরুমহাশয় সকলকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাযাত্রা করিলেন। গঙ্গায় গিয়া প্রথমে স্নান, আহ্নিক করিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন, এবং তৎপর

গঙ্গার জলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, ও জনতায় গঙ্গার ঘাট পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হরিনামের জয়ধ্বনিতে যেন গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে জপ শেষ করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন, "ছেলে সব, আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ, আমি তোমাদিগকে কত তাড়না করিয়াছি। এখন বাপু সকল, তোমরা আমার মাথায় পা দাও। আর দেরী নাই। এই দেখ আমার রথ আসিল।" ইহা বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং নাম জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিলেন। তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ-শূদ্র ছাত্র মিলিয়া যেমন পিতা মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করে তেমনি তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ভগবান গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার পাঠশালা উঠিয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণ পাদ্রি হেজল সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী সংস্কৃত বাঙ্গালা তিনটি বিভাগ ছিল। বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ব্রজগোপাল সংস্কৃত বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এই স্থলে অঘোরনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। *

শৈশবে বালক বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবে চঞ্চলতা ও একগুঁয়েমী দেখা গিয়াছিল। একবার কোন বিষয় ধরিলে কাহারও সাধ্য ছিল না উহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করে। গ্রন্থারম্ভে যে ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বাল্যকালে সেই গৌরচন্দ্র কিরূপ চঞ্চল, দৌরাত্মপরায়ণ ও একগুঁয়ে ছিলেন তাহা বৈষ্ণব-গ্রন্থ পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু সরলতা ও মাধুর্য্যে তিনি বাল্যেই তদ্দেশবাসী পুরুষ-নারী সকলের প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। বালক বিজয়কৃষ্ণের চরিত্রেও শৈশব চঞ্চলতার সঙ্গে এক অপূর্ব্ব কোমল ভাব, সরলতা ও স্বর্গীয় মাধুর্য্য জড়িত ছিল; এবং উহাই তাঁহাকে সর্ব্বত্র আদৃত ও সস্নেহে অভ্যর্থিত করিয়াছিল।

* 'বালক বিজয়কৃষ্ণ' গ্রন্থ দৃষ্টে।

তাঁহার বাল-সুলভ চপলতার সঙ্গে কোনরূপ কপটতা বা অসদ্‌বুদ্ধি ছিল না। বাল্যকালে তাঁহার ঘোড়া চড়িবার সখ অত্যন্ত অধিক ছিল। এজন্য একবার সহচর বালক-দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আস্তাবল হইতে না বলিয়া ঘোড়া লইয়া গিয়া ঘোড়া দৌড়াইয়াছিলেন। অবশেষে যখন ধরা পড়িবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইল, অপরাপর বালক পলায়ন করিল, তখন তিনি নির্ভীকচিত্তে ত্রুটী স্বীকার করিলেন; এবং ঘোড়া চড়িবার সখ মিটাইতে গিয়াই যে এরূপ কাজ করিয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিলেন। তাঁহার স্বীকারোক্তিতে সাহস, সত্যবাদিতা ও সরল স্বভাবের পরিচয় পাইয়া উক্ত ডেপুটী মহোদয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এবং বালককে কোনরূপ তিরস্কার করেন নাই। বিজয়কৃষ্ণের বাল্য জীবনের এই নির্ভীক সত্যপ্রিয়তার দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল।

বাল্যকালে পায়রা, কুকুর, বিড়াল, পাখী ইত্যাদি ইতর-প্রাণিদিগকে খাওয়াইতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সময়ে সময়ে ধামাতে করিয়া প্রচুর ধান পাখীদিগকে খাইতে দিতেন। যে দয়া শেষ জীবনে তাঁহাকে মহা-দানব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিল, বাল্যে ইতর জীবের সেবায় তাহা এইরূপে চরিতার্থ হইয়াছিল।

তাঁহার বয়স যখন সাত আট বৎসর তখন তিনি একবার তাঁহার জননীর সঙ্গে এক জমিদার শিষ্যের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। একদিন ঐ ব্যক্তি এক দরিদ্র কৃষকের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করেন। তাহা দেখিয়া বালক বিজয়কৃষ্ণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহার এই পর-দুঃখ-কাতরতারও ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়াছিল।

এক সময়ে তাঁহার জননী একটী হীন-চরিত্রা নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোককে দয়া-পরবশ হইয়া আশ্রয় ও দীক্ষা দেন; এবং অবশেষে ঝির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গৃহের সমস্ত ভার তাহার উপর ন্যস্ত করেন। ইহাতে

ঐ স্ত্রীলোকটীর মতি ফেরে এবং ধর্ম্মের দিকে মন যায়। স্ত্রীলোকটী সময় সময় তাহার সম অবস্থাপন্ন অন্যান্য স্ত্রীলোকের দুর্গতি দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিত, "মা আমাকে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়াছেন; আশ্রয় না দিলে আমারও দুর্গতির সীমা থাকিত না। ঐ অমুকের কি ক্লেশ হইতেছে, রোগে জলটুকু পায় না, পথ্য পায় না।" এই পরিচারিকার মুখে দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগের ক্লেশের কথা শুনিয়া বালক বিজয়কৃষ্ণ মাতার নিকট হইতে পথ্য লইয়া গিয়া তাহাদিগকে দিয়া আসিতেন। তাহারা দুই হাত তুলিয়া বালকের কল্যাণ কামনা করিত।

বিজয়কৃষ্ণ যে বংশের সন্তান ঐ বংশে ভক্তির বিশেষ প্রভাব। তাঁহাদের গৃহে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, আর নিত্য উহার পূজা, আরতি, অর্চ্চনা, ভোগ হইত। তাঁহার জননী স্বহস্তে বিগ্রহের ভোগ দিতেন। জননীর এই সমস্ত ক্রিয়া দর্শনে বাল্যে তাঁহার ভক্তি বিকাশের সহায়তা হইয়াছিল। পূর্ব্বপুরুষগণের ভক্তি-পূত শোণিতধারা বিজয়কৃষ্ণের দেহে বিদ্যমান থাকায়, আর তপস্যা-নিরত, হরিভক্তিপরায়ণ, অধ্যাপকের শিক্ষাধীনে এবং সংসর্গে বাস করায়, শিক্ষা, সংসর্গ, এবং বংশের প্রভাব সকলই তাঁহার পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল। সকল প্রকার অনুকূলতা যেন তাঁহার ভক্তি-পুষ্পকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল। অথবা বিধাতা মানব জাতির ভক্তি শিক্ষার জন্য বিজয়কৃষ্ণকে অপার্থিব ভক্তি-ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া, হরিনাম-মুখরিত পুণ্য-ভূমি শান্তিপুরে পাঠাইয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন শান্তিপুরের গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের টোলে শিক্ষা করেন। টোলে প্রথমে ব্যাকরণ শিখিতে হয়। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি হইলে সাহিত্যের পড়া আরম্ভ হয়। ব্যাকরণের জ্ঞান লাভের জন্য তিনি মুগ্ধবোধ পাঠ করেন; এবং অল্প দিন মধ্যেই একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন।

বাল্যে কুলগত প্রথানুসারে তাঁহার উপনয়ন ও দীক্ষা হয়। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তখন তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। নিষ্ঠাবান ও আনুষ্ঠানিক হিন্দুর যে যে লক্ষণ থাকা উচিত, সে সমস্ত তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। এজন্য শান্তিপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দর্শন করিত। তিনি প্রতিদিন নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সন্ধ্যা অর্চ্চনাদি করিতেন এবং আবশ্যক সময়ে শিষ্যবাড়ী গমন করিয়া তাহাদিগকে মন্ত্র দিতেন।

তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেনঃ—"আমার বয়স যখন বার বৎসর সেই সময় আমার একজন বাল্য সঙ্গীর মৃত্যু হয়। ইহার সঙ্গে আমি একত্র খেলা করিতাম। ঐ সময় আমি আমাদের গৃহে একটী মেটে দেলকোয় প্রদীপ রাখিয়া পড়িতাম। সঙ্গীটীর মৃত্যুর পর একদিন ঐ দেল্‌কো দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে হইল, এই মাটির জিনিষটা আছে আর সে নাই, ইহা হইতে পারে না। তার পর আমি যে কাঁটাল তলায় খেলিতাম সেখানে গিয়াও আমার মনে হইল, কাঁটাল গাছ আছে আর সে নাই ইহা হইতে পারে না। সে অবশ্যই আছে।" মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতা বোধ ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস তাঁহার মনে বাল্যেই জন্মিয়াছিল, এই ঘটনাটি দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

শান্তিপুরের টোলে অধ্যয়ন করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখনও তাঁহার প্রকৃতি শিশুর ন্যায় সরল। যৌবনের কোনরূপ চাপল্য তাঁহার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বালক বিজয়কৃষ্ণ চঞ্চল ও একগুঁয়ে ছিলেন; কিন্তু যৌবনে তাঁহাতে কোন চঞ্চলতা ছিল না; তখন তিনি গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ এবং স্বাধীনতায় একান্ত তেজীয়ান হইয়াছিলেন। এই স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ জন্যই তিনি জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যখন যাহা ধরিয়াছেন তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সরলতা, দয়া ইত্যাদি গুণে যেমন

অঘোরনাথ গুপ্ত।

তাঁহার চরিত্র কুসুমের কোমলতায় অলঙ্কৃত ছিল, তেমনি তৎসঙ্গে ন্যায়পরতা, সত্যানুরাগ, অন্যায়-অসত্যে ঘোর বিতৃষ্ণা তাঁহার স্বভাবকে বজ্রাদপি কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি শান্তিপুরে তাঁহার এমন একটি দল ছিল, যে দলের প্রধান কার্য্যই ছিল অন্যায়কারী ও মাতালদের দমন করা। অন্যায়কারীরা এজন্য তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। একবার তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার মন পরীক্ষার জন্য মুখে মদ মাখিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল। তাহাতে তিনি বন্ধুকে মদ্যপায়ী মনে করিয়া এরূপ বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার ঐ বন্ধু দুঃখে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। বন্ধুর প্রতি অকপট প্রণয় সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতি তাঁহার এমন তীব্র ঘৃণা ছিল।

যাহা হউক যৌবনের প্রারম্ভে শিশুপ্রকৃতি, সতেজ ও স্বাধীন মন লইয়া বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সমবয়স্ক বালাবন্ধু অঘোরনাথ গুপ্তের সঙ্গে টোলের পড়া ছাড়িয়া কলিকাতা চলিলেন। অঘোরনাথ বিজয়কৃষ্ণের চারি মাসের ছোট ছিলেন। উভয়ের চরিত্রে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল; সরলতা, ধর্ম্মানুরাগ তুল্যরূপ ছিল। চুম্বক ও লৌহ যেমন পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয় ইহারাও তেমনই পরস্পর পরস্পরের গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। একই জন্মভূমির জল-বায়ুর এবং একই হরিনামের গুণে তাঁহাদের জীবন-কলিকা একইভাবে বিকশিত হইতেছিল। পরে তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রণয় ও ধর্ম্মপ্রচারে তুল্য উৎসাহের সঞ্চার হইলে উভয়ে একই মহৎ ব্রতে জীবনকে উৎসর্গ করিয়া একই মহৎ গৌরবের যোগ্য হইয়াছিলেন। যে শান্তিপুর চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ আদি মহাভক্ত-গণের সমাগমে পুণ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, সেই শান্তিপুর আবার এই দুই স্বভাব সাধুর সম্মিলনে গৌরবান্বিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা ১২৬৫।৬৬ সনে যুবক বিজয়কৃষ্ণ বন্ধু-বর অঘোরনাথের সঙ্গে কলিকাতা আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কলিকাতা সহরে বাস করা নিরাপদ ছিল না। যেমন ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে সমুদ্র-বারি প্রবলরূপে বিক্ষোভিত হয়, তেমনি তখন নানাবিধ ঘটনার সংঘাতে কলিকাতা সহর তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান্ মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব, এবং মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, ও ব্রাহ্মসমাজে নব-শক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা, ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটী বঙ্গ-সমাজকে প্রবল-রূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।" *

কলিকাতার শিক্ষার্থীদের এই সকল আন্দোলনের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ ছিল না। গ্রাম্য-সরলতা ও কুলগত-সংস্কারের ক্রোড়ে প্রতিপালিত যুবক বিজয়কৃষ্ণ এইরূপ বিবিধ আন্দোলনে সংক্ষুব্ধ কলিকাতা সহরের প্রবল-তরঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার মন শান্ত ছিল, কোনপ্রকার বাদ-প্রতিবাদ শ্রবণে আন্দোলিত হয় নাই। তখনও তাঁহার মাথায় টিকি, গলায় মোটা মালা, ও কপালে তিলক। তাঁহার তৎকালের আড়ম্বর-হীন পরিচ্ছদ ও অনুলেপনাদি দর্শনে তাঁহাকে সহজেই শান্তিপুরের গোঁসাই বলিয়া অনুমান হইত।

---

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ।

এই সময় "খৃষ্টীয় প্রচারকবর্গের চূড়ামণি ডাক্তার ডফ স্বীয় অধ্যবসায় ও ধর্ম্মোৎসাহে অনেকগুলি যুবককে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালী ধর্ম্ম, নীতি ও বিজ্ঞান-সংমিশ্র হওয়াতে যুবকগণের মন অনেক পরিমাণে প্রচলিত কুসংস্কারের বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অথচ ধর্ম্ম ও নীতির সংস্রব থাকাতে কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হয় নাই। এ দিকে হিন্দুকলেজের ধর্ম্ম-হীন শিক্ষায় ছাত্রগণের সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল।" "ছাত্রগণ যথেচ্ছ পান-ভোজনে রত হইয়াছিলেন। এই যথেচ্ছ পান-ভোজন সে সময়ে এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, যে সকল ছাত্র অন্য প্রকারে নীতিমান ছিলেন তাঁহারাও উহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।" *

গ্রাম্য-শিক্ষা ও সংস্কারের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যুবক বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতার এই প্রকার অবস্থার মধ্যে আসিয়া কুলগত সংস্কার এবং বংশমর্য্যাদা ভুলেন নাই। উহা তাঁহাকে এইরূপ ঘোর পরীক্ষার মধ্যেও পান-দোষ হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু সঙ্গীগণের বিভিন্ন প্রকার ভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাস অবশেষে তাঁহার প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসে সংশয় এবং ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদিতে অনাস্থা জন্মাইয়া দিল।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সময়ে তিনি কতক দিন কলিকাতার ওপারে হাওড়ার নিকটবর্ত্তী সাঁতাড়াগাছি নামক গ্রামে চৌধুরী বাড়ীতে বাস করিতেন। তখন গঙ্গার পুল ছিল না। প্রতিদিন তিন চারি মাইল পথ পদব্রজে আসিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইতেন। ঝড় বৃষ্টির জন্য পথের ক্লেশ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁহার কিছুতেই কষ্টানুভব হইত না। যৌবনের তেজ, মনের প্রবল উদ্যম সমস্ত বাধা অতিক্রমের পথে তাঁহার সহায় ছিল।

সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন কালেই তিনি রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়া

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তখন যোগমায়া দেবী ছয় বৎসরের বালিকা। এই শিশু-বালিকার সঙ্গে তাঁহার জীবন এক-সূত্রে গ্রথিত হইল। যোগমায়া দেবীর সম্বন্ধে এই শুনিয়াছি যে তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির নারী ছিলেন। মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিতেন। অধিক কথা বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করিতেন। সকল অবস্থায় স্বামীর অনুকূল ও ধর্ম্মসাধনে আজীবন তাঁহার সহায় স্বরূপা ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণের মনে সংস্কৃত হিন্দু-শাস্ত্র অধ্যয়নে ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মিল। বেদান্তালোচনায় ব্রতী হইলেন। কিন্তু বেদান্ত চর্চ্চা করিতে করিতে অল্পদিন মধ্যেই প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মিল। তিনি ঘোর বৈদান্তিক হইলেন। যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে দেবার্চ্চনা না করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, তিনিই এখন অদ্বৈতবাদের "অহং ব্রহ্মবাদ" গ্রহণ করিয়া পূজা অর্চ্চনার আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গুরুগিরি তাঁহার কুলগত ব্যবসায় ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এই ব্যবসায়ের অনুরোধে তাঁহাকে শিষ্য-বাড়ী গমন করিতে হইত। সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন সময়ের পূর্ব্বে তিনি একবার বগুড়ার অন্তর্গত কোন গ্রামে এক শিষ্য-বাড়ী গমন করেন। গুরু, শিষ্য-গৃহে উপস্থিত হইলে শিষ্যকে গুরুর পাদ-বন্দনা করিতে হয়। এজন্য তাঁহার আগমনে তথাকার এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার পদ পূজা করিলেন; এবং পূজান্তে কর-যোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো আমি অকূল-ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি, কিছুতেই ইহা হইতে উদ্ধার হইতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।" * এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে

* এই বৃদ্ধা স্বহস্তে গোস্বামী মহাশয়ের পদ ধৌত করিয়া না দিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার অপেক্ষা অধিক বয়সের একটী স্ত্রীলোকের এইরূপ ব্যবহারে ও কাতরোক্তিতে তাঁহার মনে বিবেক জাগ্রত হইয়াছিল।

তাঁহার মনে অকস্মাৎ এই প্রশ্নের উদয় হইল, "আমার কি এ ক্ষমতা আছে? আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব, তাহার নিশ্চয়তা নাই, আমি অপরের পরিত্রাণ করিব কিরূপে? দূর হউক, আর এরূপ কপট আচরণ করিব না।" অপরাপর গুরু ব্যবসায়ীর কর্ণে যে কথা সুখকর জ্ঞান হয় তাঁহার নিকট তাহাই তীব্র যন্ত্রণার কারণ হইল। ইহার পর আর এক দিন শুনিলেন, "পরলোক চিন্তা কর। তুমি পরলোক চিন্তা কর।" কোথা হইতে এই শব্দ আসিল বুঝিতে পারিলেন না, কে তাঁহাকে তাঁহার জীবিকার নিশ্চিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য অনিশ্চিত রাজ্যের অনুসন্ধানে আহ্বান করিল তাহাও নির্ণয় করিতে পারিলেন না, কিন্তু ভয়ে উদ্বেগে তাঁহার দেহ জ্বরগ্রস্ত হইল।

তাঁহার ন্যায় সরল ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের শিথিলতার অবস্থায় শুষ্ক-ভাবে জীবন যাপন করা কিরূপ ক্লেশকর হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যখন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তখন তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান—পূজা, অর্চ্চনা, তিলকাদি ধারণ করিয়া তাঁহার দিন শান্তিতে অতিবাহিত হইত; কিন্তু বেদান্তের অহং ব্রহ্মবাদ তাঁহার সেই শান্তির ভূমি উৎখাত করিয়া দিয়াছে। আবার তৎপরিবর্ত্তে সত্য-ধর্ম্ম কি এবং কি উপায়ে সেই ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সময় কতকদিন সংশয়াত্মিকা-বুদ্ধি এবং তজ্জনিত শুষ্কতায় তাঁহার অন্তরে যে যাতনার সঞ্চার হইয়াছিল, অন্তর্য্যামী ভিন্ন অপরে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে কোন সময়ে পাঠ্য পুস্তকের কোন স্থানে একেশ্বরের উপাসনার কথা পড়িয়া তৎপ্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং উহা সংশয়ের অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার নিকট যেন একটী আলোক-রেখার ন্যায় বোধ হইয়াছিল; কিন্তু তদ্দ্বারা সংশয় দূর হয় নাই।

যাহা হউক, কিছুদিন পরে গুরু-ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে বগুড়া যাইতে হইল। তথায় তাঁহার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

"গোস্বামী মহাশয় বগুড়ার উত্তর দিকস্থ কোন কোন গ্রামে শিষ্য-বাড়ী আসিতেন; এবং শিষ্য-বাড়ী হইতে বগুড়া আসিয়া শিববাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীনাথ রায়, হারাধন বর্ম্মণ, এবং গোবিন্দচন্দ্র পাঁড়ে নামক তিন জন শিক্ষিত লোকের সহিত মিলিত হইতেন। ইঁহারা সকলেই একেশ্বর-বাদী ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ ও পৌত্তলিকতা পরিবর্জ্জন, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিতেন। গোস্বামী মহাশয় ইঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া ইঁহাদের ব্যবহারে ও কার্য্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। তিনি ইঁহাদের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া এবং আত্মচিন্তা বলে গুরু-ব্যবসায় অন্যায় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে গুরু-ব্যবসায় ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বনে ইচ্ছুক হইলেন।" *

তখনকার ব্রাহ্মসমাজ আর বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা, তাঁহার প্রীতি ও প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান মত ছিল। বিশ্বাস অনুযায়ী পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করার প্রতি তখনও ব্রাহ্মসাধারণের দৃষ্টি পড়ে নাই। বগুড়ার উক্ত তিন জন সাধু-চরিত্র ব্রাহ্মের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের পরিচয়, বন্ধুতা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গসূত্রে তাঁহাদের নিকট ইনি ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় একদল

* বগুড়ার পূর্ব্বতন প্রবাসী পেন্সনপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

ব্রহ্মজ্ঞানী যথেচ্ছাচারী হইয়া সুরাপান ও মাংসভোজন করে।' ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে এইরূপ অলীক-কথা তৎকালে অনেকের ভ্রান্ত-ধারণার কারণ হইয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতার শিক্ষিতদের মধ্যে সুরার স্রোত যেরূপ অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত ছিল, তাহাতে শিক্ষিতদিগের সম্মিলন স্থান ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ঐরূপ দোষারোপ অদ্ভুত ব্যাপার নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ শ্রবণাবধি মদ্য-মাংসের ঘোরবিরোধী বৈষ্ণব-সন্তান বিজয়কৃষ্ণের মনে তাঁহাদের প্রতি প্রতিকূল ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। এমন কি তিনি ব্রাহ্মসমাজকে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু বগুড়ার তিনজন সাধু-চরিত্র ব্রাহ্মের বিশুদ্ধ-জীবন সেই ভ্রান্ত-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিল। তিনি তাঁহাদের সাধুতায় এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহাদের সঙ্গে স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া নিজকে অত্যন্ত হীন মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলেও পবিত্র হওয়া যায় তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মিল; এবং তাঁহাদের সরলতা, বিনয় এবং মধুরতায় আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মিল।

তাঁহাদের এইরূপ বন্ধুতা পরস্পরের প্রতি পরস্পরকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিল, কিন্তু তাহাতে মতভেদ দূর করিতে পারিল না। তাঁহারা ব্রাহ্ম আর বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় বৈদান্তিকই রহিলেন। ব্রাহ্মগণ অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতা গিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া দিলেন। অভিপ্রায় এই :—কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলে প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রাণ-স্পর্শী উপাসনা ও জ্বলন্ত উপদেশে এই সরল-বিশ্বাসী, পবিত্র-চিত্ত যুবকের মন সহজে উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে।'

গোস্বামী মহাশয় বগুড়া হইতে কলিকাতা আসিলেন। এখানে তাঁহার কোন বন্ধুর দুশ্চেষ্টায় তিনি ঘোর ক্লেশে পতিত হইলেন। এক দিন

দেখিলেন কে যেন তাঁহার বাক্স হইতে সমস্ত টাকাকড়ি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি বাসায় ঠিকা খাইতেন; খাইলে পয়সা দিতে হইবে, কিন্তু হাতে একটাও পয়সা ছিল না। এজন্য বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিলেন না, গোলদীঘির ধারে ও পথে শুইয়া বসিয়া, কখন কখন সমস্ত দিন রাত্রি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। দিবসে অনাহারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাসস্থান অনুসন্ধান করেন, ক্ষুধা অসহ্য হইলে অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করেন, আর রজনীতে কলেজের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া অতি কষ্টে যাপন করেন। এই ভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল; কিন্তু তবুও কোথায়ও কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে একজন সুবিখ্যাত দয়াবান * ব্যক্তির গৃহে সাহায্য প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইনি ইঁহার গৃহে স্থানপ্রাপ্ত কতিপয় ভদ্র-সন্তানের ব্যবহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর কাহাকেও গৃহে স্থান দিবেন না। সুতরাং তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ-মনে ফিরিতে হইল। তৎপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াও বিফল-মনোরথ হইলেন। কতিপয় ব্যক্তির দুর্ব্ব্যবহারে ইঁহারও মনের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে এই বিপন্ন যুবকের প্রকৃত অবস্থা অন্বেষণ না করিয়াই তাঁহার আবেদনপত্র হস্তগত হওয়া মাত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তাঁহার মনে নিরাশা জন্মিল না। তিনি বগুড়াস্থ ব্রাহ্মদের মুখে শুনিয়াছিলেন, "ঠাকুরবাবু অত্যন্ত মহৎ লোক।" তজ্জন্য তাঁহার প্রতিকূল ব্যবহারেও তৎপ্রতি বিরক্তি না জন্মিয়া তাঁহার মনে হইল—"ইনি বহু লোকের প্রবঞ্চনায় বিরক্ত হওয়াতেই আমার প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন। আমার প্রকৃত-অবস্থা অবগত হইলে কখনও এরূপ করিতেন

---

* ইনি সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়।

না।” সেই নিঃসম্বল অবস্থায় কয়েক দিন তাঁহাকে কিরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাহার নিদর্শন।

এক দিবস এক ব্যক্তি দিনান্তে তাঁহার মুখ শুষ্ক দেখিয়া আহার হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। এবং আহার হয় নাই শুনিয়া একটী সিকি তাঁহার হাতে দিল। তিনি ঐ সিকিটী লইয়া এক খাবারওয়ালার দোকানে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বাসাস্থ একটী লোক সঙ্কুচিত হইয়া গা ঢাকা দিয়া চলিয়াছে। তিনি দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। লোকটী অবাক হইয়া বলিল, “আমি তোমার বাক্স হইতে সমস্ত চুরি করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাই, জুয়া খেলিয়া সকলই খোওয়াই-য়াছি; এবং কয়েক দিন উপবাসী আছি। তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আর উপায় নাই।” তিনি বলিলেন, “অতীত কথা ভুলিয়া যাও, এস আমার হাতে একটী সিকি আছে, ইহা দ্বারা জলযোগ করি।” এই বলিয়া তাঁহারা দোকান হইতে জলখাবার খাইলেন এবং আবার দুই বন্ধু মিলিত হইলেন।

কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না; কিন্তু বিপদকালে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলে যদি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বন্ধুতা নষ্ট হইবে, এই ভয়ে বহুক্লেশ সহ্য করিয়াও তিনি তাঁহাদের কাহারও দ্বারস্থ হইলেন না। ইহার পর তাঁহারা দুই-বন্ধু বহু চেষ্টায় কোন একটী ভদ্র-লোকের গৃহে স্থান লাভ করিলেন। কিন্তু ইনি সুরাপানের একজন প্রধান উৎসাহদাতা, ও সুরাপান সভার সভাপতি ছিলেন; এবং বন্ধুবান্ধবকে লইয়া দল বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। সুরার ঘোর-বিরোধী বিজয়কৃষ্ণকেও দল-ভুক্ত করিতে তাঁহার চেষ্টা হইল; যদিও সে চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই, বরং কুলগত সংস্কারের প্রতি অনুরক্তি বশতঃ তিনি তাঁহাদের কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার প্রতিবাদ, তিরস্কার ও চরিত্রের প্রভাবে

অবশেষে তাঁহাদিগেরই পরাভব হইল। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাতে মদ্যপান হইতে বিরত হইলেন।

তিনি বলিয়াছেন ঃ—"তাঁহারা আমাকে সুরাপায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। আমি প্রাচীন-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক সুরার নিন্দা করিতাম। আমি অদ্বৈত বংশের গোস্বামী, আমি সুরাপান করিলে অথবা অন্য কোন পাপাচরণ করিলে আমার নির্ম্মল পিতৃ-কুল কলঙ্কিত হইবে, কেবল এই সংস্কার অনেক সময় আমাকে কুসংস্কার-নরক হইতে রক্ষা করিয়াছে।"*

এইরূপ নানা প্রতিকূল-ঘটনার মধ্য দিয়া কতিপয় দিবস অতীত হইলে, এক দিন বগুড়ার ব্রাহ্মদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তথায় যে কয়েকজন ব্রাহ্মের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নিজকে পবিত্র মনে করিয়াছিলেন, এই দুর্দ্দিনে তাঁহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তাঁহাদের চরিত্র দেখিয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার যে বিরুদ্ধ-ভাব ছিল ইতিপূর্ব্বেই তাহার মূল শিথিল এবং তৎসঙ্গে একটী শ্রদ্ধার ভাব উদিত হইয়াছিল ; কিন্তু তথাপি তাঁহার মতের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আজ উহার ফল প্রত্যক্ষ হইল। তাঁহারা যে তাঁহাকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনায় যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন আজ তাহাই তাঁহাকে উৎসাহযুক্ত করিল।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি শুনিয়াছিলেন, 'ব্রহ্ম-জ্ঞানীরা তবলা বাজাইয়া গান করে, বেদ পাঠ করে, অবশেষে সুরাপান ও মাংস ভোজন করিয়া তাঁহাদের কার্য্য শেষ করে। এইরূপ বিরুদ্ধ ও ভ্রান্ত-সংস্কার সত্ত্বেও কেবল একদিকে মনের অশান্তি এবং তাহা দূরীকরণের উপায়ান্তরের অভাব, অন্য দিকে বগুড়াস্থ ব্রাহ্ম-বন্ধুদের

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুরোধ ও তাঁহাদের শুদ্ধচরিত্রের স্মৃতি তাঁহাকে ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে প্ররোচিত করিল। সে দিন বুধবার, তিনি সায়ংকালে ব্রাহ্ম-সমাজে গমন করিলেন। তথাকার আলোক মালা, তানলয়যুক্ত মধুর সঙ্গীত, ভক্তিভাবে স্তোত্র পাঠ, বহুসংখ্যক লোকের গম্ভীর ভাব, দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজকে তাঁহার নিকট স্বর্গধাম বলিয়া মনে হইল; এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার যে ভ্রান্ত-ধারণা ছিল, উহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায়, তৎপরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা সমন্বিত উদার-ভাব আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। ঐ দিন প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীতে আসীন ছিলেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, সতেজবাণী, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সকলই এই সরলচিত্ত যুবকের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'পাপীর দুর্দ্দশা এবং ঈশ্বরের বিশেষ করুণা' সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে উপদেশ দিলেন তৎশ্রবণে তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল; এবং সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, তেমনি সত্য প্রকাশিত হইয়া তাঁহার মনের সংশয়-অন্ধকার বিদূরিত করিল। তখনকার ভাব ভাষায় সম্যক ব্যক্ত করা কঠিন। বস্তুতঃ তিনি একটী নূতন মানুষ হইয়া গৃহে আসিলেন।

যাঁহার উপদেশে ঘোর অবসাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ আশার আলো প্রাপ্ত হইলেন, সেই দেবেন্দ্র নাথ বঙ্গদেশের একজন ক্ষণ-জন্মা পুরুষ। সাধনা ও ধ্যানপরায়ণতা দ্বারা তিনি সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মহর্ষি অর্থাৎ মন্ত্র দ্রষ্টা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার উপদেশাবলী দৈবশক্তি প্রভাবে শত শত নর-নারীর ধর্ম্ম জীবনের সহায় হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা ১২৬৩ সনে (১৭৭৮ শক) কতকগুলি কারণে তাঁহার মনে অত্যন্ত বৈরাগ্য জন্মে; এবং উহা তাঁহাকে গভীর-রূপে এই চিন্তায় নিমগ্ন করে যে, "কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আসিলাম, আবার কোথায় যাইব; অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশিত হইল না। অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়

তাহা আমার জানা হইল না; আর আমি লোকদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্র-চিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না।"* এই ভাব হইতে ঐ সনের ১৯শে আশ্বিন তিনি গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং বহুদিন হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া কঠোর তপস্যা বলে সিদ্ধ-জীবন লাভ করেন। তাঁহার তখনকার তপস্যার বিবরণ শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। সেই তপস্যার ফলস্বরূপ তিনি অনেক বিষয়ে নব-আলোক প্রাপ্ত হইয়া গিরি-শৃঙ্গ হইতে ১২৬৫ সনের ১লা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় নামিয়া আসেন, এবং পুনরায় ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে সমাসীন হইয়া অগ্নিময়ী ভাষাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহার হৃদয়স্থ অগ্নি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়া নূতন অগ্নি প্রজ্বলিত করিল, এবং ব্রাহ্মসমাজে এক নব শক্তি ও নব-উৎসাহ দেখা দিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে সময়ে প্রথমে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন:—"তাঁহার (মহর্ষির) এক দিনের উপদেশ শুনিয়া আমরা সাত দিন মন স্থির রাখিতে পারিতাম না। হৃদয়ে কি নবভাব জাগিত, চক্ষে কি নূতন জগত আসিত।" † মহর্ষির জীবন্ত উপদেশে গোস্বামী মহাশয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মতৃষ্ণা—যাহা বেদান্তের শুষ্ক-তর্কে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা সহজেই জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* মহর্ষির আত্মচরিত।

† রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

তিনি বলিয়াছেন ঃ—"এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্বকার ভক্তি-ভাব স্মৃতি-পথে উদিত হইল। এতদিন যে ইষ্ট-দেবতার পূজা করি নাই তজ্জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীর গলদ্ঘর্ম্ম ও কম্পিত হইতে লাগিল। অশ্রু-জলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়া অন্তরে দয়াময়ের নিকট এই প্রার্থনা করিলাম যে, "দয়াময় ঈশ্বর, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হয় না, অন্য কোন ধর্ম্মেও আমার বিশ্বাস নাই, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ন্যায় হতভাগ্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যখন পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, তখন ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম, এখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এইমাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাথ, প্রভো, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে রাখ, আর আমি কোথায়ও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম"। *

এইরূপ কাতর প্রার্থনায় তিনি শান্তি পাইলেন; তাঁহার মনে হইল প্রার্থনার ন্যায় শান্তিলাভের সহজ উপায় আর নাই। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথকে মনে মনে ধর্ম্ম জীবনের গুরু-পদে বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার তৎকালীন অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার মনের স্বাভাবিক উদারতা ও অনাবিলভাব বিশেষ সহায় হইয়াছিল। নতুবা তাঁহার ন্যায় অদ্বৈত বংশের একটি যুবকের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কঠিন হইত। বস্তুতঃ মতের গণ্ডী কোন দিনই তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই; ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যখন যাহা সত্য মনে করিয়াছেন, বিনয় ও শ্রদ্ধা সহকারে অবনত মস্তকে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন; এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও দেশাচার অতিক্রম করিয়াছেন।

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ শ্রবণাবধি তিনি তাঁহার কতিপয় সহাধ্যায়ী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া নিয়মিতরূপে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হিন্দুসমাজের সংস্পর্শ ও তাহার আড়ম্বরপূর্ণ-প্রভাব অতিক্রম করিতে এবং নূতন সত্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহার কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে এই একটা বিশেষত্ব বাল্যকাল হইতে ছিল যে যখন যাহা সত্য মনে করিতেন তাহা দৃঢ়ভাবে ধরিতেন, এবং মিথ্যাকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতেন। যাহা সত্য তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে, যাহা মিথ্যা তাহার বর্জ্জন করিতেই হইবে, এই ভাব তাঁহার নূতন পথে সবলভাবে চলিবার সহায় হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বগুড়ায় গমন করেন। তথাকার ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের এই অকপট বন্ধুর পরিবর্ত্তন দেখিয়া এই পরিবর্ত্তনের মূলে ঈশ্বরের গূঢ়-অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে, মনে করিলেন।

বগুড়া হইতে কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই সময় পথে তাঁহার জন্মস্থান শান্তিপুরের বাড়ীতে তাঁহার জীবনের আরও পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল।

তিনি তথায় একদিন আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন—"পরমেশ্বর সমস্ত মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলের পিতা মাতা; এজন্য প্রত্যেক নর-নারীকে ভ্রাতা, ভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে বাস করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, সুতরাং মনুষ্য মনুষ্যকে ঘৃণা করিলে মহাপাপ হয়। অতএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।" এইরূপ আলোচনা শুনিয়া একটী একাদশ বর্ষীয় বালক তাঁহাকে বলিল—"যদি তুমি জাতিভেদ মান না, তবে পৈতা রাখিয়াছ

কেন?" বালকের উক্তিতে যেন তাঁহার চেতনা জন্মিল; এবং উপবীত-ধারণ অসত্য ব্যবহার মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বালকটী ঐ কথা তখনই গিয়া তাঁহার জননীর নিকট বলিয়া আসিল; এবং তিনি সন্তানের এইরূপ জাতি-নাশক কার্য্যে মর্ম্মাহত হইয়া, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জননীর তৎকালের সেই করুণ-দৃশ্য ও আর্ত্তনাদ তাঁহার কোমল-প্রাণে সহ্য হইল না, তিনি পুনরায় উপবীত গ্রহণে বাধ্য হইলেন। শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশীয় একজন গোস্বামী-সন্তানের পক্ষে উপবীত ত্যাগ করা ঐ সময়ে কিরূপ ভয়ানক ব্যাপার, অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে তাহার ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু মহাত্মা বিজয়-কৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধর্ম্মের জন্য কোন কঠিন কার্য্যই তাঁহার অসাধ্য ছিল না।

তাঁহার অন্যতম সহাধ্যায়ী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন,— "বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ (মুখোপাধ্যায়) ও আমি এই পাঁচজনের মধ্যে একসময় সুদৃঢ় প্রণয়-বন্ধন ছিল। সংস্কৃত-কলেজের ঘোর-নাস্তিকতার সময় আমরা পাঁচবন্ধু "ভাগবত" বলিয়া উপহসিত হইতাম। সেই ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্যদিয়া আমাদের ভগবদ্ভক্তি দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল। গৃহে এবং কলেজে নিরন্তর নির্য্যাতনে আমাদের পরস্পরের প্রেম দিন দিন অধিকতর ঘনীভূত হইতে লাগিল। বিজয় আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তিনি আমাদের দলের একরূপ নেতা ছিলেন। আমরা নির্য্যাতন ভয়ে কয়জনে মিলিত হইয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিতাম। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে, হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর পরিমার্জ্জিত মনে করিয়া আমরা আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে নিয়মিত রূপে যাইতাম।" *

* বীরপূজা, নব্যভারত, ১৩০৬

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সহাধ্যায়ী যুবকদলের নেতা ছিলেন। আর এই যুবকদলসহ তিনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যাইতেন। কিন্তু কেবল সপ্তাহান্তে উপাসনায় গিয়াই তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা চরিতার্থ হইত না, গৃহেও প্রতিদিন নির্জ্জনে ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনা যোগেই দিন দিন তাঁহার প্রাণে বল ও উৎসাহ আসিতে লাগিল।

তিনি সর্ব্বদা আশা, উৎকণ্ঠা ও অনুরাগের সহিত প্রার্থনার উত্তরের অপেক্ষা করিতেন; এবং যখন যে সত্য হৃদয়ে প্রকাশিত হইত, তদনুযায়ী জীবন পরিচালনের জন্য শ্রদ্ধার সহিত উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। পরে উহা 'ধর্ম্মশিক্ষা' নাম দিয়া মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ, এবং অবশেষে একশতখণ্ড পুস্তকসহ গ্রন্থের স্বত্ব কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দান করেন। উক্ত পুস্তিকায় আত্মার প্রকৃতি, পরমাত্মার স্বরূপ, মানবের অধিকার, ধর্ম্ম, সংসার, পরকাল, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, সুখদুঃখ, আত্মোন্নতি, প্রার্থনা, ঈশ্বর দর্শন, উপাসনা ইত্যাদি ধর্ম্ম বিষয়ক কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ লিপিবদ্ধ হওয়ায় এক সময়ে উহা ধর্ম্মশিক্ষার্থীর বিশেষ উপযোগী ও সহায় হইয়াছিল। উক্ত পুস্তিকার শেষ উপদেশটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস না হইলে প্রীতির উদয় হয় না। প্রীতি না হইলে প্রিয়কার্য্য সাধন করা যায় না। ঈশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার হৃদয় পাষাণময়, তাহা কর্ত্তৃক কোন পাপই অকৃত থাকে না। সে কখনই নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হয় না। শ্রমজীবী কৃষক কি চির-শুষ্ক মরুভূমিতে সুস্বাদ ফলের প্রত্যাশা করিতে পারে? ঈশ্বরেতে দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করিবে। তাঁহাকে প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবে। সদা সত্য কহিবে, প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিবে না। পরিহাস স্থলেও মিথ্যা কহা অনুচিত। একটী মিথ্যা কথা বলিলে

যদি রাজ্য-লাভ হয়, তাহাও তৃণ-বৎ পরিত্যাগ করিবে। একটী মিথ্যা না বলিলে যদি সহস্র সহস্র লোক খড়্গ-হস্ত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্যের জন্য প্রাণ-দান করিবে, তথাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতঃ অব্যর্থ ধৈর্য্যাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে না পারিলে মনুষ্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে। সকল মনুষ্যকেই স্নেহ করিবে। দরিদ্রকে ধন দান, রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রদান করিবে। নম্রতা ও বিনয়কে অঙ্গের ভূষণ করিবে। প্রাণপণে পরোপকার করিবে। পিতা মাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিবে। যাহা মুখে কহিবে, কার্য্যেও তাহা করিবে; বাক্য ও কার্য্য একপ্রকার না হইলে কপটতা করা হয়। অতএব পৌত্তলিকতার সহিত কিছুমাত্র সংস্রব রাখিবে না; উপবীত প্রভৃতি পৌত্তলিকতার কোন প্রকার চিহ্ন ধারণ করিবে না। যাঁহারা পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব রাখেন এবং উপবীত প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করেন, তাঁহারা যদি ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন তাহা হইলে ভয়ানক কপটাচার করা হয়। যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত-সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। এইরূপ ব্রাহ্ম হইবে।”

“পাপ-চিন্তা মনে করিবে না; পাপালাপ মুখে আনিবে না। পাপকার্য্য প্রাণান্তেও আচরণ করিবে না। ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে। কি বিদ্যাধ্যয়ন, কি পরিবার প্রতিপালন, কি অর্থোপার্জ্জন, সমুদয় কার্য্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়াই সম্পন্ন করিবে। যশোমান বিস্তারের জন্য একটী কার্য্যও করিবে না। দেবদেবী পূজা করা ও জাতিভেদ স্বীকার প্রভৃতি যেরূপ পৌত্তলিকতা, যশোমান ও ইন্দ্রিয়-গণের অধীনতাও সেইরূপ পৌত্তলিকতা। সম্পূর্ণরূপে এই উভয়বিধ

পৌত্তলিকতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক হইবে। যেরূপ ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিবে, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া অকৃত্রিম প্রীতি স্থাপন করিবে। এইরূপে জীবনকে মধুময় করতঃ ধর্ম্মের উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেকের প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তী হওয়াতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের গুরু-ব্যবসায়ে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এখন তিনি ভবিষ্যতের উপজীবিকার সংস্থান আশায় সংস্কৃত কলেজের পড়া ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ যেরূপ কারুণ্য-পূর্ণ ছিল তাহাতে বোধ হয় উপজীবিকার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পর-সেবার ইচ্ছা, তাঁহাকে মেডিকেল কলেজের শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিয়াছিল। তিনি কাব্যের নিম্ন শ্রেণী হইতে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করায় তথা হইতে কোন উপাধি প্রাপ্ত হইলেন না; অথবা সাধু হইবেন বলিয়াই জগতের জননী তাঁহাকে অপর কোন উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইতে দিলেন না।

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইতিমধ্যে একদিন শুনিতে পাইলেন, উন্নতির জন্য দীক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা শুনিয়া তিনি দীক্ষার জন্য ব্যগ্র হইলেন। যে উপায় অবলম্বন করিলে আত্মার উন্নতি হইতে পারে, কঠিন পরীক্ষাপূর্ণ হইলেও তদুপায় অবলম্বন করিতে তাঁহাকে কখনও বিমুখ হইতে দেখা

পায় নাই। এজন্য যদিও ঐ সময় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করা সহজসাধ্য ছিল না, তবুও তিনি দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াই বন্ধুবর অঘোর নাথের সঙ্গে একত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন (১২৬৭।৬৮ বঙ্গাব্দ)।

'জাতিভেদ স্বীকার না করিয়া উপবীত ধারণ-কুসংস্কার' এই বিশ্বাসে তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার শান্তিপুরের গৃহে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু জননীর প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হওয়াতে পুনরায় উহা গ্রহণে বাধ্য হন। তদবধি তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—"উপবীত ত্যাগ না করাতে আমার মনে অত্যন্ত অশান্তি হইতে লাগিল। এমন কি প্রতিদিন প্রার্থনার সময় হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। লোকে বলে, "পৈতা কি গায়ে কামড়ায়?" বাস্তবিক ইহা কাল-ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন আমাকে দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার, অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বর দর্শন হইবে না, এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির হইত।" *

মনের উদ্বেগ অসহনীয় হওয়াতে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপবীত ধারণ ও মৎস্য মাংসাহার উচিত কি অনুচিত এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—"উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি। মৎস্য মাংস না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না——ইত্যাদি।" * এই সময় মহর্ষি উপবীত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বলা বাহুল্য, যজ্ঞসূত্র যাঁহার নিকট গললম্বিত ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছিল, মহর্ষির ঐরূপ উত্তর কখনও তাঁহার মনোমত হয় নাই।

---

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

ইতিমধ্যে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পূর্ব্ববঙ্গবাসী কতিপয় ছাত্রের সম্মিলনে হিতসঞ্চারিণী সভা নামে একটী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। গোস্বামী মহাশয় উক্ত সভার একজন সভ্য ছিলেন। ঐ সভাতে একদিন আলোচনা হয় যে, যাহা সত্য বুঝিব তাহা প্রতিপালন না করা মহাপাপ ও কপটতা। এইরূপ আলোচনার দিবসই বিজয়কৃষ্ণ কপটতার চিহ্ন মনে করিয়া উপবীত দূরে নিক্ষেপ করিলেন (১২৬৯ বঙ্গাব্দ ১৭৮৪ শক); এবং পত্র লিখিয়া এই অভিপ্রায়ে গৃহে মাকে এবং অন্যান্য আত্মীয়কে সে সংবাদ জানাইলেন যে, 'যেন তাঁহারা কি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন পূর্ব্বেই তাহার জন্য প্রস্তুত থাকেন।' জননীর ক্লেশ নিবারণের জন্য পরিত্যক্ত উপবীত পুনর্গ্রহণ অবধি তাঁহার মনে অশান্তি জন্মিয়াছিল, এখন তাহা দূর হইল। কিন্তু তৎসঙ্গে কলিকাতার ছাত্রদের বাসায় বাসায় তর্কের ধূম পড়িয়া গেল। 'প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম দেবেন্দ্র বাবু উপবীত ত্যাগ করেন নাই, অতএব তোমার পক্ষে উপবীত ত্যাগ করা উচিত নয়' এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া তাঁহার পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয়, বন্ধু সকলেই উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অযাচিত উপদেষ্টার অভাব না হইলেও সাহস ও উৎসাহ দিবার লোকের অত্যন্ত অভাব হইল। ব্রাহ্মগণের অনেকেও তাঁহার এই কার্য্যের বিরোধী হইলেন। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে সকল সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা সোমপ্রকাশের সম্পাদক সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিশেষরূপে যুক্ত না হইয়াও স্বাধীন ভাবে প্রকাশ্য পত্রে তাঁহার এই কার্য্যের সমর্থন করিয়া উৎসাহ দিলেন।

'উপবীত ত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য' তখনও ব্রাহ্মগণের এরূপ ধারণা জন্মে নাই। তাঁহারা জাতিভেদ স্বীকার না করিয়াও জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত ধারণ করিতেন। এ বিষয়ে তিনি সময়ের শিক্ষা ও সংস্কারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মনের দ্রুতগতিরই পরিচায়ক।

তিনি যখন যাহা সত্য বুঝিতেন তাহা এই ভাবে সকল বাধা* অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন করিতেন।

যিনি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মালা-তিলক-শিখা-সূত্রসমন্বিত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, শান্তিপুরের গোঁসাই ছিলেন, অল্প দিন মধ্যেই তিনি উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম ও নব্য দলের অগ্রণী হইলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষাদ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়াও নবযুগের নবীন উদ্দীপনায় উৎসাহিত এবং সকল প্রকার সংস্কারের পাশ হইতে বিমুক্ত হইলেন। পাশ্চাত্য ভাব তাঁহার এই পরিবর্ত্তনের কারণ নয়; কিন্তু ধর্ম্মের আলোক ও ন্যায়ানুগত যুক্তিই তাঁহার এই পরিবর্ত্তনের মূল। স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ এই নব সাধনার পথে সহায় হইয়া তাঁহাকে দিন দিন অগ্রসর করিতে লাগিল।

যদিও তিনি অত্যন্ত উন্নতিশীল ছিলেন, এবং এজন্য অনেকের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ ঘটিত, কিন্তু এই মতভেদ তাঁহার আন্তরিক সদ্ভাব কখনও নষ্ট করে নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হইতে না পারিলেও তৎপ্রতি তাঁহার কোন প্রকার বিরুদ্ধ-ভাব জন্মে নাই, চিরদিন ভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল

গোস্বামী মহাশয় মেডিকেল কলেজের বঙ্গীয় বিভাগে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। "স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বশতঃ শিক্ষক প্রমুখাৎ শ্রুত-বিষয় কখনও তাঁহাকে পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হইত না; একবার যাহা শ্রবণ করিতেন তাহা অন্য ছাত্রগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতেন। বঙ্গীয় বিভাগে যে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।" †

---

* স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় প্রথম উপবীত ত্যাগ করেন; তৎপরে ইনি উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন।

† ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮২১, ১লা আষাঢ়)।

তাঁহার সংস্কৃত কলেজের সহাধ্যায়ী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন কালেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি তিনু চাটুযোর বাড়ী থাকিতেন। একদিন একজন আসিয়া বলিলেন, 'ওরে, বিজয় গোঁসাই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হ'য়েছে, চল তাঁকে দেখ্‌তে যাই।' আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইলে বিদ্রূপকারী বন্ধুগণের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আমি তথায় রহিলাম। বিজয় বাবু আমার পরম বন্ধু, তিনি আমাকে আগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে আমরা দুই বন্ধুতে যখন আহার করিতে বসিলাম, তখন ভোজন-পাত্র দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইলাম। উহা আর কিছুই নয়,—মেটে সানুক। আমি বলিলাম, 'ও বিজয় এ কি? এ যে মেটে সানুক।' তিনি বলিলেন, 'যাও যাও, কাঁসাতে আর মাটিতে প্রভেদ কি?' ইহার পর একজন ঝিকে ভাত নিয়া আসিতে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম 'এ কি? বামনের জাত্‌ মার্‌লে?' তিনি বলিলেন, 'ও কি? জাত্‌ টাত্‌ আবার কি? ও সব কিছু নয়। এখনও তোমার কুসংস্কার গেল না?' যাহা হউক আহারাদি ত কোনরূপে শেষ হইল; কিন্তু সমুদয় রাত্রি আমার শরীর ঘিন ঘিন করিতে লাগিল। ভাল ঘুম হইল না।" এই সময় যদিও শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় গোস্বামী মহাশয়ের আরও কতিপয় বন্ধু নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় গমন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা সংস্কারের পথে ততোধিক অগ্রসর হন নাই।

গোস্বামী মহাশয়ের মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের শেষবর্ষে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বঙ্গীয় বিভাগের ছাত্রগণের যে ঘোরতর বিবাদ হয় তাহার মধ্যে তিনি নেতৃস্থানীয় থাকায়, অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটে। কলেজের কোন অন্যায় আচরণে গোস্বামী মহাশয় ছাত্র-বন্ধুগণ সহ একযোগে কলেজ

ত্যাগ করেন। ইহাতে অনেকে তাঁহার দলস্থ হইয়াছিল। আর যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তিনি গোলদীঘিতে বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগকেও দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিবাদে গোস্বামী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্য-প্রার্থী হন। তিনি ছোটলাট বিডন মহোদয়কে সমস্ত ঘটনা জানাইলে ছাত্রগণ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হয়; এবং কর্ত্তৃপক্ষ শান্তভাব অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণকে পুনরায় কলেজে গ্রহণ করেন। গোস্বামী মহাশয় অতঃপর বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

মেডিকেল কলেজের গোলযোগে বৃত্তি কাটা যাওয়ায় অনেক বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্র বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ তহবিল হইতে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের গোলযোগ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ন্যায়ানুরাগ, তেজস্বিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হন ও তাঁহার প্রতি উচ্চভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। আমরা শুনিয়াছি, এই সময় ছোটলাট মহোদয় কলেজের অভাব দূরীকরণোদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক রিপোর্ট প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের উপর এই কার্য্যভার অর্পণ করেন। গোস্বামী মহাশয় অনেকগুলি সংশোধন ও নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্পণ করিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদনুসারে রিপোর্ট করেন, এবং কলেজের অনেক উন্নতি হয়, ও বাঙ্গালা বিভাগ স্বতন্ত্র হইয়া ক্যাম্বেল বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

এক দিন গোস্বামা মহাশয়ের মুখে ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষু অশ্রুতে আর্দ্র হওয়ায় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, 'তবে কেন লোকে আপনাকে নাস্তিক বলে?' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আমাকে লোকে কি হেতু নাস্তিক বলে?' গোঁসাইজী বলিলেন, 'বলে,

লোকটী একেবারে নাস্তিক, একখানা বই লিখেছে তা'তে ঈশ্বর বিষয়ক কোন কথা নাই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'ইহার পরের সংস্করণে ঈশ্বরের কথা থাকিবে।' ইহা হইতে বোধোদয়ের পরবর্ত্তী সংস্করণে ঈশ্বর বিষয়ক একটী পাঠ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করিলেন। মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করিবার পর উক্ত কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার তামিজ খাঁ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"গোঁসাই, ভগবান তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তাই তুমি রক্ষা পাইয়াছ; তুমি কলেজ ত্যাগ করিয়া বড় ভাল করিয়াছ। নতুবা তোমাকে ঘোর-বিপদে পড়িতে হইত। কেন না তুমি গোলযোগের নেতা ছিলে।" মেডিকেল কলেজের গোলযোগের মূল কারণ অন্যায়ের প্রতিবাদ ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন। তাঁহার পক্ষে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করিয়া স্থির থাকা সম্ভব ছিল না। অন্যেরা সামান্য জ্ঞানে যাহা তুচ্ছ করিত তাঁহার নিকট তাহাও অত্যন্ত আপত্তিকর বিবেচিত হইত। ডাক্তার তামিজ খাঁর উক্তি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে, তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে ভীত করিতে পারে নাই।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে অধিকতর অগ্রসর হইয়া ক্রমে তাঁহার মনে এমন ধর্ম্মোৎসাহ জন্মিল যে, নর-নারীর পাপ-তাপ ও ভ্রম-কুসংস্কার দর্শনে ক্লেশে অভিভূত হইয়া অনেক সময় অশ্রু-পাত করিতে লাগিলেন। সন্তানের জন্য মাতার স্তন্য যেমন আপনা আপনি উছলিয়া পড়ে, পাপীর জন্য তাঁহার দয়া তেমনই উছলিয়া উঠিল। এজন্য "পথে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে" ইচ্ছা করিলেন। এবং প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন প্রচারক ছিলেন না, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের ভাব কাহারও মনে আসে নাই তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। 'অপরে

যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই, আমি তাহাতে কিরূপে প্রবৃত্ত হইব, তাঁহার মনে এ প্রশ্নের উদয় হইল না। নর-নারীর প্রতি প্রেমই তাঁহাকে পবিত্র ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল। তিনি অপরাহ্নে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল সত্য 'একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বাহ্য-পূজা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক পূজায় বিশ্বাস, নর-নারী পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা ভগিনী, জাতিভেদ ভগবানের বিধি বিরুদ্ধ'—ইত্যাদি বাক্য কাগজে লিখিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। যদিও বক্তৃতার কোনরূপ আয়োজন ছিল না, বিজ্ঞাপন দিয়া লোকদিগকে আহ্বানও করা হয় নাই, তবুও শ্রোতার অভাব হইল না। তাঁহার ভক্তিভাবে-পূর্ণ আড়ম্বর-হীন ও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা চারি পাঁচ শত লোক মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। ভগবৎ-প্রেরণার অধীন হইয়া কথা বলিলে তাহা এমনই প্রাণ-স্পর্শী হয়। গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারোৎসাহের মূলে এই ভগবৎ-প্রেরণা বলবতী থাকায় এই কার্য্যে তাঁহার দেহমন ও প্রাণের সমগ্র-শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে তিনি একদিন সঙ্গত সভার বার্ষিক অধিবেশনে গমন করিলেন। তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের **অনুষ্ঠান** নামক একখানি ক্ষুদ্র-পুস্তিকা তাঁহার হস্তগত হইল। উহার একস্থলে লিখিত ছিল যে 'উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে না।' এই অংশ পড়িয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, উপবীত গ্রহণ না করা সঙ্গতসভার মত। ইহাতে সঙ্গতসভাকে তাঁহার স্বীয় মতের একমাত্র অনুকূল-স্থল মনে করিয়া সঙ্গতসভার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী জনৈক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া সঙ্গতসভায় গমন করিলেন; ও তাহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তথায় ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন নবীনভাব ও উদ্দীপনার প্রবর্ত্তক প্রিয়-দর্শন, অব্যর্থ-বাক্ বাগ্মী আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের মধ্যভাগে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ) আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সঙ্গতসভার প্রতিষ্ঠা হয়। 'পঞ্জাবীদিগের সুহৃদ্গোষ্ঠির সঙ্গতসভা নাম দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার নাম সঙ্গতসভা রাখেন। সঙ্গতসভা ব্রাহ্মসমাজের নবশক্তির অদ্ভুত উৎস-স্বরূপ।' স্বাধীন প্রকৃতি, সাহসিক ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণকে সঙ্গতসভাই জন্ম-দান করিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে সদালাপ দ্বারা ভ্রাতৃভাবের উদ্দীপনা ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একতা স্থাপন করা সঙ্গত-সভার উদ্দেশ্য ছিল। "তখন নবানুরাগের সময়, সমাজের উন্নতিকল্পে যে কোন উপায় অবলম্বিত হইত উৎসাহশীল যুবকগণ তাহাতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। মতের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ডে ও জীবনে আনিয়া বিশ্বাসকে সমুদয় সাংসারিক, পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যের সহিত একীভূত করণার্থে এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, জীবনে সাধনের জন্য এবং পবিত্র সাধুভাব, সরলতা ও সত্যপ্রিয়তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইহাতে অতি নিগূঢ় প্রশ্ন সকল আলোচিত হইত। কেবল বাক্য-ব্যয়ের জন্য বাক্য, কিম্বা আলোচনার জন্য আলোচনা হইত না। কিন্তু বিবেক ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির আদিষ্ট কঠোর কর্ত্তব্য সকল কার্য্যে পরিণত করিয়া সংসারের সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার উপায় অন্বেষণ করা হইত। এই সমস্ত জীবনগত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় সকল আলোচিত হওয়াতে যখন প্রত্যেকের গূঢ়-ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন বিবেকী ব্রাহ্মগণ আপনাদের পবিত্র, উন্নত, আদর্শ অনুসারে ধর্ম্ম সাধন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।" *

উৎসাহশীল স্বাধীন-চিত্ত ও বিবেক-পরায়ণ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গতসভায় প্রবেশ করিয়া সঙ্গতের আলোচিত সত্যসমূহ নির্ভীকভাবে ও দৃঢ়তার সহিত,

* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত।

জীবনে সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:— "সঙ্গতেই অধিকাংশ ব্রাহ্ম-ভ্রাতার সঙ্গে পরিচিত হই। ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের সহবাসে কি অসীম আনন্দ ভোগ করিতাম তাহা স্মরণ করিয়াও এখন হৃদয় আনন্দিত হয়। সঙ্গত এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়াই মনে হইত আবার কখন সঙ্গতে গমন করিব, সমাজে গমন করিব, ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইব। তখন আমি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের নিকট অপরিচিত ছিলাম। এজন্য তাঁহাদের বাটীতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে কোন অনুষ্ঠান হইলে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই বলিয়া আমি অভিমান করিয়া বাসায় থাকিতে পারিতাম না। সেখানে গমন করিলে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিব, ভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব, এই ভাবিয়া সর্ব্বত্রই গমন করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। ধর্ম্মজীবনের এই বাল্য-ব্যবহার জীবনে না থাকিলে অভিমানে মন সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত থাকে। ভ্রাতা-দিগের সহিত সরল ব্যবহার করা যায় না। তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাদের মুখ-নিঃসৃত সামান্য উপদেশও বহুমূল্য বোধ হইত। ভ্রাতাদের মুখশ্রী আনন্দ-মাখা বোধ হইত।" * বলা বাহুল্য বিনয়, শ্রদ্ধা, ধর্ম্মানুরাগ, অভিমানশূন্যতা ইত্যাদি যে সমস্ত সদ্‌গুণ স্বভাবতঃ তাঁহার চরিত্রে নিহিত ছিল, সঙ্গতে যোগ দিয়া তাহার বিশেষ বিকাশ হইতে লাগিল।

সঙ্গতের আলোচনায় নবীন উৎসাহশীল যুবকগণের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা আমরা ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মশীল প্রচারকগণের জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি। গোস্বামী মহাশয় 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া সঙ্গতের প্রতি আকৃষ্ট এবং অনুরক্ত হইয়াছিলেন, উহাতে উপাসনা, আত্ম পরীক্ষা, আমোদ, নির্ভর, সত্য-বাক্য,

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

পৌত্তলিকতা, পবিত্রতা, কর্ত্তব্যশ্রেণী, লোক-ভয়, ত্যাগ-স্বীকার, প্রভৃতি ২১টী বিষয়ের উল্লেখ আছে। "যে কর্ম্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবে, সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবে, সকল ত্যাগ স্বীকার করিবে, কোন যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বোধ করিবে না," "যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকার দেখায় সেই আত্মাপহারী চোর কর্ত্তৃক কি পাপ কৃত না হয়," "কেবল বাহ্য পৌত্তলিকতা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষেধ করিতেছেন এমত নহে, ইহা পরিত্যাগ করাত সহজ, আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা অতীব ভয়ানক। বিষয়-সুখাভিলাষ, মানাকাঙ্ক্ষা, কাম-ক্রোধ-লোভ-দ্বেষ-ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি সকলের শরণাগত অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে," "স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া," ইত্যাদি বহু সারগর্ভ উপদেশ উক্ত পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকারের উপদেশ, আলোচনায় গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ হিতসাধন হইয়াছিল।

তখনকার সঙ্গতসভার কথা স্মরণ করিলে মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। সন্ধ্যার সময় সঙ্গতসভার গৃহে ৪০।৫০ জন যুবক মিলিত হইতেন, এবং রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত গৃহ পূর্ণ থাকিত। ১০টার সময় এক দল যুবক গৃহে গমন করিতেন; এবং ১২টা পর্য্যন্ত আলোচনার পর আর এক দল গৃহে গমন করিতেন। অপর যাঁহারা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও ব্যাকুলাত্মা ছিলেন, তাঁহারা রাত্রি ২।৩টা পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেন। কোন কোন দিন এরূপ আলোচনায় রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত, তথাপি পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িতেন না। তাঁহারা যেমন "আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, কর্ত্তব্য-সাধনে দৃঢ়-নিষ্ঠা, সত্যানুসরণে চিত্তের একাগ্রতা, হৃদয়স্থ-বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর দেখাইয়াছেন, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।"* গোস্বামী

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

মহাশয় এই ঘনিষ্ঠ দলের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। আলোচনায় যাঁহাদের রাত্রি ভোর হইত তাঁহাদের মধ্যে তিনি একজন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন :—“বিজয় বাবু ও আমি কত সময় একত্রে ধর্ম্মালোচনা ও ধ্যান ধারণায় যাপন করিয়াছি, অনেক সময় আলোচনা এমন জমাট হইয়া উঠিত যে আমরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। অনেক সময় আলোচনান্তে আমরা গভীর ধ্যানে বসিতাম এবং প্রাতঃকালের তোপ পড়িলে তবে আমাদের ধ্যান ভঙ্গ হইত। কখন কখন আলোচনান্তে আমরা গৃহে গমনের জন্য রাস্তায় বাহির হইতাম এবং রাস্তায় লাইট পোষ্টের নিকট দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে পূর্ব্বাকাশে উষার কিরণ-রেখা দেখা দিত ও পাখীর কলধ্বনি শুনা যাইত।”

উপবীত ত্যাগের কিছু দিন পরে বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী-পূজা হইতেছিল। তাঁহার শোকার্ত্তা-জননী তাঁহাকে পাইয়া ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, এবং দেবীর সম্মুখে সন্তানের পায়ের উপর সটান হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় তাঁহাকে উপবীত গ্রহণের জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। জননীর পাষাণভেদী-আর্ত্ত-নাদ মাতৃ-ভক্ত সন্তানের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হইল, কিন্তু সেই ক্লেশ নিবারণের কোন উপায় ছিল না ; কারণ তিনি ধর্ম্ম-বিশ্বাসেই জননীর মর্ম্মান্তিক ক্লেশের কারণ হইয়াছিলেন। জননীর ক্লেশ দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ের অবস্থা সম্যক প্রকাশ করা কঠিন। এই ঘটনায় আত্মীয় স্বজন সকলেরই হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল। পরে মূর্চ্ছা দূর হইলে তিনি বলিলেন—“যদি আমাকে পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু ঘটিবে। আমি আর এই অসত্য ধারণ করিতে পারিব না।”

পুত্রের এইরূপ কাতরতা দর্শনে মাতৃ-স্নেহ উথলিয়া উঠিল। তিনি

আর জেদ করিলেন না, পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমাকে আর উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে না, উপবীত গ্রহণের পূর্ব্বে তোমার যে অবস্থা ছিল এখনও তোমার সেই অবস্থা হইল। আমি মনে করিব তোমার উপবীত হয় নাই।"

উপরোক্ত ঘটনার পর তাঁহার জননীর ক্রন্দন অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইল, কিন্তু তদীয় জ্যেষ্ঠ ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয় হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড সভা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অন্যান্য যুবকেরা এই উপবীত-ত্যাগী যুবকের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্ম হইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় শান্তিপুরের গোস্বামীগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন—'ইহাকে কেবল বাড়ী হইতে নয়, শীঘ্র গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দাও।' তখন সকলেই তাঁহাকে সত্বর গ্রাম ছাড়িতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে তথায় এমন এক তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, এবং দেশময় লোক তাঁহার উপর এমন খড়্গ-হস্ত হইয়াছিল যে রাস্তায় বাহির হইলে, কেহ গালি দিত, কেহ প্রস্তর, ধূলি নিক্ষেপ করিত, কেহ বা পাগল মনে করিয়া গায়ে থুথু দিত।

তথায় যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিলেন না। কারণ তখন ব্রাহ্মগণ জাতিভেদ স্বীকার না করিয়াও অনায়াসে জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত ধারণ করিতেন; এমন কি কেহ কেহ উপবীত ধারণ না করা অন্যায় মনে করিতেন। সুতরাং উপবীত-ত্যাগী বলিয়া যে তাঁহাদেরও নিকট ইনি উপহাসাস্পদ হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। এইরূপে ব্রাহ্ম ও প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী—সকলেরই নিন্দা, তিরস্কার, গালি, অত্যাচার তাঁহার উপর বর্ষিত হইতেছিল। কিন্তু তিনি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত সকল অত্যাচার লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন সহ্য করিতেছিলেন। ঘোর নির্য্যাতনের মধ্যেও এই বিশ্বাস তাঁহার মনের শান্তি রক্ষা করিয়াছিল

যে, "সত্য আমার দিকেই আছে, আমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। আর এই সত্য জয়যুক্ত হইবেই।"

তিনি বিনয় ও সহিষ্ণুতা সহকারে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে বিনীতভাবে বলিলেন—"আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি শান্তিপুরে বাস করিয়া ইহার কিছু উপকার করিতে পারি তাহা হইলে আমার জীবন সফল হয়। আমার বিশ্বাস হয়ত কালে এই ঠাকুর ঘর ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইবে।" তাঁহার বিশ্বাস বিনয় ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তির হৃদয় দ্রব হইল, এবং অনেকের উত্তেজনারও লাঘব হইল; কিন্তু প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সমাজ-চ্যুত করিলেন। ইহাতে তিনি নিরস্ত হইলেন না, শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী রহিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার চেষ্টায় এই বৎসরই তথায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এবং তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের প্রভাবে তথাকার অধিবাসিগণের মনেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

বহুদিন পরে গোঁসাই একবার বলিয়াছিলেন;—"আমি যখন ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন কত লোক কত নিন্দা-অপযশ ঘোষণা করিয়াছিল, গ্রামের লোকেরা এতদূর খড়্গ-হস্ত হইয়াছিল যে, আমাকে কেবল সমাজ-চ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিবার জন্য আমার গায়ে রাব-গুড় (তরল গুড়) লেপিয়া বোল্‌তা লাগাইয়া দিয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় সে দিন গিয়াছে। এক সময় যে গ্রামবাসীরা অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিল, এখন তাহারাই এতদূর অনুরক্ত হইয়াছে যে আমাকে পাইলে আর ছাড়িতে চায় না।"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পরে কেবল শান্তিপুরবাসীর নয়, বঙ্গদেশের বহুলোকের অপরিসীম শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচারার্থে গিয়া দেশে দেশে এক সময়ে যেমন ভয়ানক অত্যাচার সহ্য

করিয়াছিলেন, আবার অন্য সময়ে তেমনি লোকের অসাধারণ ভক্তি-ভালবাসা পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব ও ভক্তি-বিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদিতে দলে দলে লোক যোগ দিয়াছিল।

যখন আত্মীয় বন্ধু এবং দেশ বাসী সকলেই তাঁহাকে উপবীতত্যাগী অহিন্দু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, তখন একমাত্র তাঁহার ভগিনী-পতি কিশোরীলাল মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু উৎপীড়নকারিগণের নিকট ইহা মৈত্রেয় মহাশয়ের অপরাধ স্বরূপ গণ্য হইল; এবং এই অপরাধে তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর আর শান্তিপুরের বাড়ীতে স্থান রহিল না। অগত্যা মৈত্রেয় মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে একত্র বাস করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে তাঁহাকে সাংসারিক ঘোর অভাবে পড়িতে হইল। তিনি ধর্ম্ম-বিশ্বাসে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিলেন।

গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—তাঁহাকে (মৈত্রেয় মহাশয়কে) বাসায় আনিলে আমাদের বাসায় প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইতে লাগিল। এক মাসের পর আমার পূজনীয়া জেষ্ঠা ভগিনী বলিলেন, 'পৌত্তলিক উপাসনা অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহার ভাল বোধ হয়।' তিনি ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে যেমন আহ্নিক না করিয়া জল-গ্রহণ করিতেন না, এখনও তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া জল-গ্রহণ করিতেন না। ক্রমে উপাসনার প্রতি তাঁহার গাঢ় অনুরাগ হইল। এখন হইতে ভাই ভগিনীতে পিতার চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম। মৈত্রেয় মহাশয় যেরূপ সাংসারিক কষ্টে পড়িয়াছিলেন, উপাসনায় গাঢ়-অনুরাগ না হইলে সপরিবারে কখনই সে কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মের জন্য মনুষ্য কত দুঃখ সহ্য করিতে পারে তাহা তাঁহাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" *

---

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

গোস্বামী মহাশয় যে সময়ে কিশোরী বাবুর সঙ্গে একত্র কলিকাতা অবস্থান করিতেন, তখনকার দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইহা ৬নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি ;—

প্রথম—"আমি তাঁহার স্ত্রীর শিক্ষার সাহায্যার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে গমন করিতাম। কিন্তু তিনি প্রায়ই গৃহে থাকিতেন না, আমাকে একাকী নির্জ্জনে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শিক্ষকতার কার্য্য করিতে হইত। ইহাতে কিশোরী বাবু বিরক্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—'নগেন্দ্র বাবু একাকী নির্জ্জনে তোমার স্ত্রীর অধ্যাপনা করিতেছেন, ইহা আমি পছন্দ করি না। নগেন্দ্র বাবু যুবক, আমি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব তুমি স্ত্রীর পড়া বন্ধ কর।' গোস্বামী মহাশয় ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—'আমি নগেন্দ্র বাবুকে অত্যন্ত বিশ্বাস করি, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ ভাব পোষণ করা আমি অত্যন্ত অন্যায় মনে করি। এ অবস্থায় আপনার সঙ্গ আমার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু আমার বন্ধুগণ সর্ব্বদাই আমার গৃহে আসিবেন, আর আমি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিবেন, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশের বিষয়।' এই কথা বলিয়া গোস্বামী মহাশয় ঐ দিনই বাড়ী অন্বেষণ করিয়া স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিলেন ; এবং তথায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু উক্ত ঘটনায় হিতৈষী মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই!"

দ্বিতীয়—"এক সময় গোস্বামী মহাশয় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর চরিত্রে কোন রূপ অভাব অপূর্ণতা না থাকে এজন্য সামান্য ত্রুটী দেখিলেই তাঁহাকে উপদেশ দিতেন ; এবং যাহাতে ঐরূপ ত্রুটি আর না ঘটে তদুপায় অবলম্বন করিতে বলিতেন। ইহাতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মনে করিতেন

স্বামী তাঁহাকে সমস্ত দিনই তিরস্কার করিতেছেন। আমি ইহা বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনে গোঁসাইজীকে বলিলাম, 'আপনি যে সর্ব্বদা স্ত্রীকে উপদেশ দিয়া থাকেন ইহা' ভাল নয়, তিনি উহা উপদেশ রূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে করেন, আপনি সমস্ত দিন তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন। এইরূপ ভাব অধিক দিন থাকিলে উহার ফল ভাল হইবে না। প্রীতির ভাব শিথিল হইয়া ক্রমে বিরক্তির সঞ্চার হইবে।' গোস্বামী মহাশয় সহজেই আমার কথার ভাব বুঝিতে পারিয়া কৃতজ্ঞ-চিত্তে উহা গ্রহণ করিলেন। এ দিকে দুই এক দিনের মধ্যে একদিন শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, 'তুমি বিজয় বাবুর কি উপকার করিয়াছ, তিনি তোমার উপকার স্মরণ করিয়া এতদূর কৃতজ্ঞ হইয়াছেন যে তোমার প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরে না।' আমি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, 'তাঁহার কি উপকার করিয়াছি।' কিন্তু শেষে আমার এই বিষয়টী মনে পড়িলে ভাবিলাম, বোধ হয় ইহাতেই গোস্বামী মহাশয় আমার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। কৃতজ্ঞতার বোধ তাঁহাতে এতই অধিক ছিল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে কলিকাতা আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তখন উন্নতিশীল যুবকদল প্রবল-উদ্যমে সঙ্গত সভায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উপবীত ত্যাগ ইত্যাদি সংস্কার-জনিত অসুবিধা ও অত্যাচার তাঁহাদের উৎসাহানলকে নির্ব্বাপিত না করিয়া আরও প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছিল।

'এই সময় নূতন ও পুরাতন শক্তির একটী আশ্চর্য্য সম্মিলন নিবন্ধন দিন দিন সুশিক্ষিত যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। একদিকে দেবেন্দ্রনাথের বহু-দর্শন, প্রগাঢ় ধ্যান-পরায়ণতা, সংস্কৃত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, গাম্ভীর্য্য, ধীরতা প্রভৃতি মহদ্‌গুণ; অপর দিকে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাহস, পরাক্রম, নির্ভীকতা, সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, বাগ্মিতা, কার্য্যতৎপরতা, জীবন্ত-প্রার্থনা এবং বিজয়কৃষ্ণের ও তাঁহার সহযোগিগণের ধর্ম্মানুরাগ, ব্যাকুলতা, সংস্কার-প্রিয়তা, জীবন-প্রদ উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি একত্র সম্মিলিত হইয়া একটী প্রবল শক্তি উৎপন্ন করিল।'

এই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন-স্রোত নানা দিকে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে; এবং চতুর্দ্দিকের ধর্ম্ম-পিপাসু নর-নারীগণ প্রচারকের অভাব অনুভব করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বাগআঁচড়ার কতকগুলি লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়। হিন্দুসমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও উৎপীড়িত তথাকার পিঁড়িলী ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন শুনিয়াই পরদুঃখ-কাতর মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ প্রচার-ব্রত গ্রহণান্তর তথায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"দেশের ভয়ানক দুরবস্থা, লোকালয় সকল ঘোর-অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, অরণ্যাভ্যন্তরস্থ অট্টালিকায় হিংস্রজন্তুগণ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। যে দুই এক ঘর মনুষ্যের বাস আছে তাহাতে দিবানিশি রোদন-ধ্বনি শ্রবণে প্রাণ উদাস হইয়া যায়।"* কাম ক্রোধাদি রিপু-দলের উত্তেজনায় মানব যেন হিংস্র জন্তুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে, আর তাহাদের হিংসা-দ্বেষ-কলহে লোকালয় অরণ্যে

*আশাবতীর উপাখ্যান; এই উপাখ্যান তাঁহার আত্ম-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

পরিণত হইয়াছে ইহাই হয়ত তাঁহার ঐ উক্তির অভিপ্রায়। লোক সমাজের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে তীব্র বেদনার উদয় হইল; এবং আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরহিত-কামনায় প্রচারব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইলেন।

তখনও মেডিকেল কলেজে তাঁহার নাম রহিয়াছে। পড়া ছাড়িবেন শুনিয়া, বন্ধুদের কেহ কেহ বলিলেন—"মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আর অধিক বিলম্ব নাই, এ সময় পড়া ছাড়িলে তোমার পরিবার কিরূপে প্রতিপালিত হইবে?" কিন্তু নিজের ও পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ ভাবিবার তাঁহার অবসর ছিল না। অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, মনে করিলেন—"যিনি মরুভূমিতে তৃণ-গুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীরমধ্যে প্রাণী-পুঞ্জকে প্রতি-পালন করিতেছেন, তিনি কখনও অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন না।" * এইরূপ চিন্তা তাঁহাকে নির্ভয় এবং সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা, অভাব, দুঃখ ও নির্য্যাতন উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের চিন্তা ভগবচ্চরণে সমর্পণপূর্ব্বক প্রচার ব্রত গ্রহণে অগ্রসর করিল।

তিনি বলিয়াছেন——"১৭৮৪ শকের (১২৬৯ সন) শেষভাগে একদিন সঙ্গতে এইরূপ আলোচনা হইয়াছিল যে এখন নানা দেশ বিদেশের লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দেন এরূপ লোকের নিতান্ত অভাব। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখনই বলিলাম, আমি প্রচার ব্রত অবলম্বন করিব। সঙ্গতস্থ সকলেই আনন্দের সহিত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়

---

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

বলিলেন যে, 'ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইতে হইলে রীতিমত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে।' আমি ঐ পরীক্ষা দিতে সম্মত হইলাম। আরও দুইটী ভ্রাতা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় বহু পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরে আদেশ হইল যে প্রথম হইতে সমস্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে হইবে। প্রায় দুই মাস পরিশ্রম করিয়া তত্ত্ববোধিনীও পাঠ করিলাম। তাহার পর আচার্য্য মহাশয় প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি করেন। আমি শ্রীরামপুরে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিয়া গ্রহণ করেন; এবং প্রথমেই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ভার প্রদান করেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিকট সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন। তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করি।" *

১৭৮৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে তাঁহার স্বলিখিত প্রচার বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"১৭৮৫ শকের ভাদ্রমাসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করেন। আমি সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক এই গুরু-ভার প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ইহা সাধন করিতে সক্ষম হইব, তদ্বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। যখন স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন হতাশ হইয়া পড়ি। যখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তখন অতুল-সাহসে পূর্ণ হইয়া উঠি। আমি এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির নিশ্চয় করিলাম যে—'ঈশ্বরের **প্রতি নির্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।'** আমি

* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত।

এই প্রকৃত উপায়টী অবলম্বন করিয়া মহৎ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওতঃ, প্রথমতঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজগুলিতে গমনাগমন করিতে লাগিলাম।”

তিনি এই সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যেতার কার্য্য ও পটলডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। শেষোক্ত স্থানে তিন চারি মাসে ত্রিশটী উপদেশ, লেবুতলা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় আচার্য্যের কাজ ও আটাশটী উপদেশ, রামকৃষ্ণপুর ব্রাহ্মসমাজে তিন দিন উপাসনা, তিনটী উপদেশ, সাঁতরাগাছি ব্রাহ্মসমাজে তিন দিন উপাসনা ও উপদেশ, এবং নানা বিষয়ে ধর্ম্মালোচনা, কোন্নগর সমাজমন্দিরে নিয়মিতরূপে উপাসনা, দশদিন উপদেশ, ও মাঝে মাঝে আলোচনা করেন; শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, বক্তৃতা, এবং শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজে বিশ্বাস, প্রীতি ও অনুষ্ঠান বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এইরূপে চারিমাস কাল নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া উপাসনা, আলোচনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

বাগআঁচড়ার কার্য্যসম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

“১৭৮৫ শকের ১০ই পৌষ আচার্য্য মহাশয়ের আদেশ অনুসারে বাগআঁচড়া গমন করিলাম। উক্ত গ্রাম কলিকাতার পূর্ব্বোত্তর প্রায় ৩৫ ক্রোশ অন্তর। বাষ্পীয় শকটযোগে চাকদহ অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে গমন করতঃ সেই স্থানের পূর্ব্বোত্তর ৮ ক্রোশ অন্তর গোপাল নগর গ্রামের পান্থশালায় সে দিবস অবস্থিতি করিলাম। ১১ই পৌষ প্রাতঃকালে গোপালনগর হইতে গমন আরম্ভ করিয়া প্রায় দুইটার সময় বাগআঁচড়ায় উপস্থিত হই। যদিও পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম কিন্তু অত্রত্য মল্লিক পরিবারের সরলতা ও ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া আমার সমুদয় শ্রান্তি দূর হইয়া গেল। আমি

দেখিলাম মল্লিক পরিবারস্থ প্রায় সকল লোকই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। অনন্তর: আহারান্তে 'ঈশ্বরের করুণা' বিষয়ে কিছু বলাতে সকলেরই অন্তর দ্রব হইতে লাগিল।"

"পরদিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলাম। অনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান ভাব অবগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি সেখানে নয় দিবস ছিলাম; ইহার মধ্যে তেইশটী পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ এককালে পরিত্যাগ করিলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই নির্ধন, কিন্তু ইঁহাদের ধর্ম্মবল, সম্রাটহইতেও অধিক হইয়া উঠিল। ইঁহারা প্রায় সকলেই লেখা পড়া জানেন না; তথাপি প্রীতি, ভক্তি, কৃতজ্ঞতাতে ইঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। যাঁহারা ভূরি ভূরি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, যাঁহাদের অর্থের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না, তাঁহারা একবার ঐ বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিঃস্ব লোকদিগের ধর্ম্মবল প্রত্যক্ষ করিয়া শিক্ষা করুন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ধনী ও পণ্ডিতের জন্য নহে; ইহা পৃথিবীস্থ সমুদয় মনুষ্যগণের চিরসম্পত্তি। অনন্তর সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম।"

ইহার পর তিনি বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে গমন করিয়া বক্তৃতাদি করেন এবং চৈত্র মাসে প্রচারার্থে পাবনা গমন করেন। তথায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরকাল, মুক্তি ও উপাসনা বিষয়ে তাঁহার তিনটী বক্তৃতা হয়। তাঁহার বক্তৃতা এরূপ প্রাণস্পর্শী

হইয়াছিল যে তথাকার সমস্ত শিক্ষিত গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র তলাপাত্রের বাড়ীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা ও আত্মোন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা হয়, পাবনা দেওয়ানগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। চেত্‌লা গ্রামে দুই দিবস ঈশ্বরসহবাস ও ব্রাহ্মধর্ম্ম অসীম বিশ্বরাজ্যের একমাত্র ধর্ম্ম, বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা হয়। পাবনাতে পনর দিবস অবস্থান করিয়া তথাহইতে কুমারখালি গমন করেন। তথায় উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। তৎপর কুমারখালি হইতে শিলাইদহ গমন করিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন :—"এখন প্রচণ্ড রৌদ্র, অতএব এ সময় পথে পথে ভ্রমণ করা ভাল নয়, তুমি কলিকাতায় গমন কর।" প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি ১৭৮৬ শকের ১লা বৈশাখ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার উৎসাহ ও অনুরাগের আভাস এই আট-মাসের প্রচার-বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। যখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, জল ও স্থলপথ নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপদে পূর্ণ ছিল, সেই সময় প্রতিদিন আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, বাতের ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করা কিরূপ ক্লেশসাধ্য ব্যাপার ছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অনুভব করা কঠিন।

প্রচারার্থে উৎসৃষ্ট-প্রাণ বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে এইরূপে সমগ্র-শক্তি প্রয়োগ করিলেন। 'ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়', এবং এই উপায়টী অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার প্রাণ, মন ঢালিয়া দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তলেখক বলিয়াছেন—"প্রচারকের ব্রত গ্রহণ

করিয়া তিনি প্রচারকের অতি উচ্চতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অগ্নিময় উৎসাহ, পবিত্রজীবন, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাশক্তিতে অনেক লোকের মনকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তাঁহাকে অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি সংসারের সমুদয় উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”

আমরা বাগআঁচড়ার প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য স্কুল, ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ এবং রোগাতুর নরনারীর চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বলিতে কি, বাগআঁচড়ার উন্নতির পথ তাঁহার চেষ্টাতেই মুক্ত হয়। তৎকালে বাগআঁচড়ার দুঃখী ভ্রাতাদের সাহায্যার্থে তত্ত্ববোধিনীতে ও পরে ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার যে সমস্ত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া সহৃদয় নরনারী অকাতরে অর্থ পাঠাইয়াছিলেন।

বাগআঁচড়ার একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—“এই ক্ষুদ্র পল্লীবাসী জনমণ্ডলীকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সামাজিকতায়, শিক্ষায় সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি (গোস্বামী মহাশয়) পিতৃ-সম ক্লেশ ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ঐকান্তিক প্রাণে আমাদের জন্য খাটিয়াছিলেন তাহা যদি আমারা কোনও দিন ভুলি তবে আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হইবে। তিনি যে সাধুতার, নিষ্ঠার, ভক্তির, ঈশ্বরপরায়ণতার মূল্যবান দৃষ্টান্ত সকল পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন তাহা যদি আমরা কুড়াইয়া লইয়া অঞ্চলে বাঁধিতে পারিতাম তবে বোধ হয় এত দিনে আমরা চরিত্রে ধনী হইয়া উঠিতাম।” *

“বাগআঁচড়ায় তাঁহার উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনিই উপাসনার

* তত্ত্বকৌমুদী।

ভার লইয়া তথায় প্রতি শনিবার ব্রহ্মোপাসনা, রবিবার সঙ্গতসভা, মঙ্গলবার বাগুড়ি গ্রামে সকলকে লইয়া পারিবারিক উপাসনা, বুধবার ফুলবাড়িয়া গ্রামে, শুক্রবার শঙ্করপুর গ্রামে পারিবারিক উপাসনা, শনিবার উক্ত চারি-গ্রামের লোক লইয়া ভক্তির সহিত মিলিত উপাসনা করিতেন।

তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দৈনিক উপাসনা, ঈশ্বরচিন্তা ও ধ্যানে অন্ততঃ একঘণ্টা নির্জ্জনে যাপন করিয়া পরে রোগী দিগকে দেখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাদি করিতেন। যে সকল রোগী তাঁর নিকট আসিতে অক্ষম হইত নিজে তাহাদের বাড়ীতে হাঁটিয়া গিয়া দেখিয়া ব্যবস্থা দিতেন। এইরূপে প্রতিদিন প্রায় ৩০।৩৫ জন রোগীকে দেখিতেন। কিন্তু কাহার নিকট কিছু লইতেন না। রোগী দেখিয়া স্নান আহারাদি করিয়া বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। ৫টা পর্য্যন্ত এই কাজে থাকিয়া পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পত্নীকে পড়াইতেন। তৎপর পালামত যে গ্রামে যে দিন উপাসনা তথায় গিয়া উপাসনা করিতেন। পরে বাজারের নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, পরে ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ইহা ছাড়া স্ত্রীশিক্ষাদান, সঙ্গতসভার পরিচালন করিতেন।" *

তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে তৎসময়ের তত্ত্ববোধিনীর মন্তব্য ঃ—"যিনি বাগআঁচড়া গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার সরলতা, ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া সেখানকার সকল লোকই একমুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব স্বীকার করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্ত যে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে এই আছে যে—"এখানে সম্প্রতি আমাকে এই কয়েকটী কার্য্য করিতে হয়—'প্রাতঃকালে চিকিৎসা, মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষকতা, রাত্রিতে রজনীবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৈকালে ব্রাহ্মিকা

* নব্যভারত ১৩২২, ভাদ্র।

বিদ্যালয়ের উপদেশ, শনিবার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা। এখানকার জল বায়ু ...ী হইতেছে না ; তথাপি ঈশ্বর-প্রসাদে সুখে কালযাপন করিতেছি।"

উক্ত পত্রিকায় আরও লিখিত হইয়াছিল যে,—"উক্ত ব্রাহ্মপরিবার ...দগের বিষয় বিশেষ বক্তব্য এই যে, তাঁহাদিগের সরলতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, ...তি আশ্চর্য্য। তথাকার স্ত্রীলোকদিগের ভাব আশ্চর্য্যকর। সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ এবং সকল প্রকার গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ... স্থানে উপাসনা হয়, তথায় তাঁহারা ব্যাকুল চিত্তে ধাবিত হন ; এবং ...র্ব্বদাই এমত আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করেন যে সুহৃদয় ...ক্তি মাত্রকেই তদবলোকনে অত্যন্ত প্রীত হইতে হয়।"

তখন বাগআঁচড়ার অধিবাসিগণের অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। ...হাদের অনেকে সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ...গাস্বামী মহাশয়ের উন্নত জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে ...াহাদের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল "যে তাহারা ক্রেতাদিগের সহিত ...বক্রেয় দ্রব্যের মূল্যনিরূপণ প্রথা এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ...কহ কিছু ক্রয় করিতে আসিলে সরলভাবে এককালে বলিয়া উঠিত এ ...্রব্যের মূল্য এত, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, না হয় করিও না। আমরা ব্রাহ্ম, ...আমরা দর করি না।" যাহারা মোকদ্দমা করিতেছিল তাহারাও অসত্যের ...ভয়ে মোকদ্দমা পরিত্যাগ করিয়াছিল ; এবং যাহারা কোন কারণে প্রতিবেশী ...া গ্রামস্থ লোকদিগের সহিত বিষয় ঘটিত কোন বিবাদ করিতেছিল, ...তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে এককালে নিরস্ত ...হইয়াছিল। বিদ্যাবিহীন লোকদিগের পক্ষে কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বলে ...তদূর করিয়া উঠা সহজ নহে। সামান্য লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা কোন ...ময় ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ...তাহাদিগকে অবলম্বিত প্রথা পরিত্যাগ করিতে রত করা কেমন কঠিন।

যাঁহারা গর্ব্বিতবচনে সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে সাধারণ লোকদিগের „সরল অকপট হৃদয় ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব সকল গ্রহণ বা পালন করিতে পারে না, তাঁহারা বাগআঁচড়াস্থ দুঃখী বিদ্যাহীন ব্রাহ্মদিগের অবস্থা অবলোকন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদিগের বিবেচনা ভ্রম-মূলক কি না।”

বাগআঁচড়াস্থ সাধারণ গৃহস্থদের এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ গোস্বামী মহাশয়ের পবিত্র জীবন। গ্রামবাসীদিগকে অনেক সময় ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদে মত্ত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শে যেমন পুতিগন্ধ নষ্ট হয় তাঁহার সংস্পর্শেও তেমনি বাগআঁচড়ার লোকদের মনের কুসংস্কার, পাপ ও মলিনতা নষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার জীবন্ত উপাসনা, ধর্ম্মসাধনে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, পরদুঃখ-মোচনে প্রাণপণ চেষ্টা, সকলই তাহাদের চরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধনে সহায় হইয়াছিল।

“তিনি নানা স্থানে প্রচার করিতে যাইতেন। একবার বাগআঁচড়া হইতে যশোহর যাত্রা করিয়া উমেশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মনে করিয়াছিলেন তথায় কেবল একদিন থাকিবেন, কিন্তু সকলে তাঁহার সঙ্গে একযোগে কীর্ত্তন উপাসনায় এমন মত্ত হইলেন যে তিন দিন না থাকিয়া পারিলেন না। যশোহর হইতে বরিশাল যাত্রাকালে, পথে মধ্যাহ্নে চেঙ্গুটিয়া গ্রামে কানাইলাল মল্লিকের বাসায় আহারাদি করিয়া পদব্রজে খুলনা গমন করিলেন এবং পথে সন্ধ্যাকালে এক মুদির দোকানে উপস্থিত হইলেন। মুদি শান্তিপুরের গোসাইকে পাইয়া আনন্দ ও আদরে গ্রহণ করিল ও প্রসাদআশায় আহারাদির আয়োজন ও ঘি, দুধ সংগ্রহ করিল। গোস্বামী মহাশয় মুদির মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—“আমার জাত নাই, আমি সকলজাতির অন্ন খাইয়া থাকি।” শুনিয়া মুদি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তখনই ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। এবং তিনি গিয়া এক বৃক্ষতলে

আশ্রয় লইলেন। কিছু না বলিলে অবশ্যই পরম সমাদরে থাকিতে পারিতেন। সত্য গোপন না করার ফলে সমস্ত রজনী অনাহারে বৃক্ষতলে যাপন করিতে হইলেও তাঁহার তাহাতে নিরানন্দ জন্মে নাই।

পরে বাগেরহাট হইয়া বরিশাল গমন করিলেন। তথায় তাঁহার উদ্যোগে রাখাল বাবুর কর্ম্মচারী বৈকুণ্ঠ বাবুর সঙ্গে ফুলবাড়িয়া গ্রামের এক বিধবা কন্যার বিবাহ হইল।

বাগআঁচড়ায় বার্ষিক উৎসব ১৬ই পৌষ হইত। একবার উৎসবের সময় ১৬ই পৌষ প্রাতে নহবত বাজিতেছে, সকলে "চল ভাই সবে মিলে যাই পিতার ভবনে" কীর্ত্তন করিতে করিতে উপাসনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিয়া শ্রোতৃগণ অপার আনন্দে মগ্ন হইলেন। পরে গোস্বামী মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিলেন, আর নিজেই বেদী হইতে গান ধরিলেন,—"আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে, মিলে বন্ধুগণে প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে, ভক্তিকমল ল'য়ে করেন অঞ্জলি দান বিভুচরণে।" ৯—১০টায় প্রাতের উপাসনা শেষ হইলে রাজচন্দ্র বাদ্যকর নহবতের উপর হইতে সানাইযোগে গাহিতে লাগিল, "দয়াময় কি মধুর নাম, আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াইল কি মধুর নাম।" পরে কাঙ্গালি বিদায় ও ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার প্রীতি-ভোজন হইল।

একবার প্রাতের উপাসনার পর বাহির হইলেই ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ প্রসববেদনায় কাতর ছিলেন। গোস্বামীমহাশয় গিয়াই প্রসূতিকে গরমজলের গামলাতে বসাইবার ব্যবস্থা করিলে প্রসূতির যন্ত্রণার উপসম ও অগৌণে প্রসব হইল।

একদিন ধর্ম্মালোচনাসময়ে এক মুসলমানের গৃহে অগ্নিদাহ আরম্ভ হয়। তিনি শুনিবামাত্র কোমরে কাপড় জড়াইয়া ছুটিলেন, এবং বন্ধুবান্ধব মিলিয়া বিপন্ন পরিবারকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

বাগআঁচড়া অবস্থানকালে নিকটবর্ত্তী গ্রামহইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও খৃষ্টান পাদরিরা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবে সকল সম্প্রদায়ের লোক মুগ্ধ হইতেন।" *

গোস্বামীমহাশয় মাঝেমাঝে বাগআঁচড়া গমন করিতেন, কখনও বা কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। একদিন তথায় আলোচনাকালে উপবীত ধারণ ও জাতিভেদের কথা উত্থাপিত হইলে, তথাকার প্রাণনাথ মল্লিক বলিলেন—"যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ হয় তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে।" এই কথাটী গোস্বামী মহাশয়ের মনে লাগিল। তিনি মনে মনে আলো করিয়া স্থির করিলেন যে "ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ অসত্য ব্যবহার থাকা উচিত নহে। যদি ব্রহ্মসমাজের এই কুরীতি সংশোধিত না হয় তাহা হইলে যে সমাজে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।" †

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি সকল বিষয়েই অগ্রগামী ছিলেন। যে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনে অপরে তাঁহার পথপ্রদর্শক হয় নাই; বরং তিনি সকলের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। তিনি বন্ধুবান্ধব কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়া একটী অভিনব সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং উপবীত ধারণের সমর্থন করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অন্যায় বিবেচনা করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে উপবীতধারী আচার্য্যের কার্য্যে আপত্তি করিয়া পত্র লিখিলেন। উক্ত পত্রে একথারও

* নব্যভারত ১৩২২। ভাদ্র, আশ্বিন সংগ্রহ।

† ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

উল্লেখ করিলেন যে, "যদি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীতধারী হন তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।" কেশবচন্দ্র উক্ত আবেদনপত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রদান করিলে তিনি উহার অনুমোদন করিয়া বলিলেন—"বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু কোন ক্রমেই উপবীত ত্যাগ করিবেন না। অতএব দুইজন উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য্য পাইলে তাঁহারাই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইবেন।" ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা আসিলে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে এবং অন্যতম উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উপাচার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রথমে উক্ত ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন না, কিন্তু যখন কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে 'তুমি সম্মত না হইলে এ কার্য্যটী সম্পন্ন হইবে না,' তখন সম্মত হইলেন।

তখনও আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের অনেকে উপবীতধারী ছিলেন। গোস্বামীমহাশয় এবং অন্নদাবাবু উক্ত সমাজের উপাচার্য্য মনোনীত হইলে আচার্য্যগণের পক্ষে উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হইল। ইহার পর বিশেষ দিন নির্দ্ধারণ করিয়া অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়দিগকে উপাচার্য্যপদে বরণ করিবার বিজ্ঞাপন তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত হইলে জানা গেল, পাকড়াশী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করেন নাই। ইহাতে ঐ তত্ত্ববোধিনী দগ্ধ করিয়া পুনরায় দুই জনের নামসহ তত্ত্ববোধিনী মুদ্রিত হইল। পাকড়াশী মহাশয় উপাচার্য্য না হওয়াতে সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ১২৭১ সনের (১৭৮৭ শক) ৭ই ভাদ্র বিশেষ ভাবে উপাসনা করিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয় প্রথমোক্ত দুইজনকে উপাচার্য্যপদে বরণ করিলেন। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনীর মন্তব্য এইরূপ :—

"বিগত ৬ই ভাদ্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মদ্বয় যেরূপ উৎসাহ ও নিষ্ঠাসহকারে এতৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ পালন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকেই উক্ত পদের বিশেষ উপযুক্ত বোধ হয়। কাহারও অকারণ প্রশংসা করা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পক্ষে সম্ভবে না। কিন্তু এই দুই ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য যেরূপ ক্লেশ, গভীর অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণ সকল ব্রাহ্মের অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টান্তস্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। তাঁহাদিগের মত একশত ব্রাহ্ম প্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষের যে অশেষ মঙ্গল হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।"

গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিতরূপে উপদেশ প্রদান করেন ;—

"সৌম্য, তুমি অদ্য ঈশ্বরপ্রসাদে উপাচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইলে তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্য জ্ঞান উপার্জ্জনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে; এবং সর্ব্বসাধারণ মধ্যে তাহা বিতরণ করিবে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনে ও গৃহধর্ম্ম যাজনে নিরলস হইবে নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া পবিত্রস্বরূপের সহবাসে আনন্দ উপভোগ করিবে, এবং সদুপদেশ ও সাধু চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে। গুরুজনকে ভক্তি করিবে, বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে ও সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান দিবে। স্বাধীন হই বিনয়ী হইবে। পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে, কাহারও প্রতি দ্বেষ করিবে না। অন্যে যদি তোমার প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবে। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবে

সম্পদে বিপদে, স্তুতি নিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, অভিপ্রায় মহান হউক, ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক; তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্রকথা শ্রবণ করুক। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি, হরি ওঁ।"

দেবেন্দ্রনাথের এই মধুময় উপদেশ তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছে। স্বাধীন হইয়া কিরূপে বিনয়ী হইতে হয় এবং কিরূপে নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মসাধন করিতে হয়, তিনি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বাধীন হইয়া কিরূপে বিনয়ী হইতে হয় তাঁহার জীবনের দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহার পরিচয় দিতেছি।

মহর্ষি কর্ত্তৃক উপাচার্য্য পদে বৃত হওয়ার পর একদিন মধ্যাহ্নে তিনি ব্রাহ্মসমাজ গৃহের দ্বিতীয়তলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি গরদের বস্ত্র, অঙ্গুরীয় ও একখানি পত্র লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। পত্রখানি মহর্ষির স্বহস্ত লিখিত, কিন্তু উহা তাঁহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত। উহাতে লেখা ছিল যে, অদ্য সায়ংকালে আমার পৌত্রের নামকরণ, আপনি আসিয়া উপাচার্য্যের কার্য্য করিবেন, এবং এই সামগ্রীগুলি গ্রহণ করিবেন। অনুষ্ঠানে দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মসমাজেও ক্রমে হিন্দুসমাজের ন্যায় পৌরহিত্য প্রবেশ করিবে এই ভয়ে তিনি বরণের দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিলেন না; পত্র লিখিয়া ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মহর্ষির দুঃখ প্রকাশ শুনিয়া গোসাইজী তাঁহার নিকট গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অপর একদিন মহর্ষি বলিয়াছিলেন,—"আমি যেখানে যাইতে বলিব, সেখানেই যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন,—"যে জীবন ঈশ্বরচরণে অর্পণ করিয়াছি, সে

জীবনে কিরূপে মনুষ্যের দাসত্ব করিব?" তিনি মহর্ষিকে বলিলেন—"ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচারক্ষেত্রে গমনাগমন না করিলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন। প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।" ইহা শুনিয়া মহর্ষি লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল স্থানে গমন করিতে পারি না। এজন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে যদি তুমি গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।" তৎপর বলিলেন,—"স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর, বীজ বপন কর, ঈশ্বর-কৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের জন্য চিন্তা করিও না, ফল-দাতা ঈশ্বর তোমার সহায় থাকুন।" *

গোস্বামী মহাশয় প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রচারকের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু প্রচারের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ, তৎসঙ্গে নানাপ্রকার সাংসারিকভাব জড়িত হইলে, প্রচারের ব্যাঘাত ঘটিবে ভাবিয়া তিনি উহার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার প্রতিবাদে প্রচারকের বৃত্তি নির্দ্ধারণ স্থগিত হইল।

যাহাহউক সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিলেন, মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু স্নেহময়ী জননীর অশ্রুধারা, বন্ধুগণের অকৃত্রিম অনুরাগ, প্রীতি, যাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিপুল ভালবাসা, এবং কোন প্রকার মতভেদও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি মৃদু পুষ্প-সম হইয়াও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনকথা যখনই শুনিতেন, তখনই বজ্রবৎ কাঠিন্য দেখাইতেন। তখন তাঁহার প্রেম-বিগলিত ছবি যেন একটী উজ্জ্বল বজ্রময় মূর্ত্তিতে পরিণত হইত।

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

এই সময়ে নবীন ব্রাহ্মদলের উদ্যোগে একদিকে ব্রাহ্মসমাজে, উপাচার্য্য নিয়োগ সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত এবং অপরদিকে অসবর্ণ বিবাহাদি * কতকগুলি সংস্কার আরব্ধ হওয়ায়, প্রাচীনগণ অত্যন্ত আশঙ্কাযুক্ত হন; এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবল আন্দোলন উঠে। তখন প্রাচীন ব্রাহ্মগণ পুনঃ পুনঃ নানা কথা বলিয়া মহর্ষির মন পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হন, এবং তাঁহারও মনে হয় 'ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।' বিশেষতঃ যে সমস্ত প্রাচীন ব্যক্তি এতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া, যোগ্যতার সহিত ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, উপাচার্য্যের পদ হইতে তাঁহাদের অবসর গ্রহণ তাঁহার নিকট সুবিচার বলিয়া মনে হইল না। বরং তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ ও অনুরাগ বশতঃ তাঁহার পুষ্প-সম কোমল প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। এজন্য ইহার কি প্রতিবিধান করা যাইতে পারে তিনি সেই চিন্তায় মনোযোগী হইলেন।

* আমরা শুনিয়াছি প্রাচীন ও নবীন দলের বিরোধের প্রধান দুইটী কারণ—উপবীত ত্যাগ ও অসবর্ণ বিবাহের সঙ্গে, গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ যোগ ছিল। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমি একদিন বসিয়া ভাবিতে ছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ হইতে জাতিভেদের শৃঙ্খল দূর করিতে হইবে। কিন্তু কেবল উপবীত ত্যাগে নয়, অসবর্ণ বিবাহ না দিলে এই শৃঙ্খল মোচনের অন্য উপায় নাই। এজন্য অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনে ইচ্ছা হয়। মনে হইল, 'কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ লোক কোথায় পাওয়া যাইবে?' শেষে ভাবিলাম,—'আমার আত্মীয় কিশোরী বাবুর কন্যার সঙ্গে * সেন মহাশয়ের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।' মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া, কেশব বাবুর নিকট অসবর্ণ বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। তিনি প্রফুল্ল মনে আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহের আরম্ভ হইল।" বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার উদ্যোগ ছিল, তিনি এক সময়ে তাঁহার কোন বয়স্কা আত্মীয়ার বিবাহদানে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

এইরূপে দুই দলের মধ্যে মতভেদের বহ্নি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইলে, তাহা হইতে ক্রমে অনেকের মনে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অপ্রেমের বিষ উৎপন্ন হইল। ইতিমধ্যে ১২৭১ সনের (১৮৬৪ খৃঃ অঃ) ২০শে আশ্বিনের প্রবল বাত্যা সংঘটিত হওয়ায় কলিকাতা নগরীতে মহা প্রলয় ঘটিল। ঐ দিন দারুণ ঝড়বৃষ্টিতে বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত, নিপতিত, পথঘাট কর্দ্দমাক্ত হওয়ায়, ভীষণ-দৃশ্য উপস্থিত হইল। হাহাকার আর্ত্তনাদে সহরের লোকের মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল। ভীষণ-প্রলয়ে কলিকাতা সহর তোলপাড় হইতেছে এমন সময়ে বেলাবসানে গোস্বামী মহাশয় গৃহের ছাদে উঠিয়া কলিকাতার অবস্থা দর্শনেচ্ছু হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল 'আজ বুধবার, সমাজের উপসনার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে'। তিনি কোমর বাঁধিয়া মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই দুর্য্যোগের ভিতরে ঘরের বাহির হইতে বন্ধুগণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার নিকট কোন বাধাই কার্য্যকরী হইল না। তিনি অনেক জল ভাঙ্গিয়া মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হ্যালিডে ষ্ট্রীটে গিয়া দেখিলেন গলা জল হইয়াছে। ক্রমে আরও অগ্রসর হইতে হইতে সাঁতার জলে পড়িলেন। তখন সন্তরণ দ্বারা পথ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ঝড়ে মন্দির ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছে। একটী লোকও উপস্থিত হয় নাই। *

* উক্ত ঝড়ের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"ঝড়ের পরদিন মেডিকেল কলেজে ইংরেজ, ইহুদি. উড়ে, বাঙ্গালী, স্ত্রী পুরুষ বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক মৃতদেহ একত্র হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে প্রায় নৌকা ছিল না, নৌকার কাঠ ও গ্রেক পড়িয়া রহিয়াছিল, জাহাজ রাস্তার উপর উঠিয়াছিল। নৌকা করিয়া শান্তিপুরে যাইতে পথে মানুষ, গরু, ছাগল, ঘোড়া, শৃগাল, কুকুর ইত্যাদির মৃতদেহের সঙ্গে, কোটপেণ্টুলনধারী সোণার চেইনঘড়ীশোভিত একটী বাবুর মৃতদেহ দেখা গিয়াছিল।

তখন ভৃত্যদ্বারা একখানি পত্র পাঠাইয়া মহর্ষির মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি লিখিলেন,—"আজ প্রকৃতির মধ্যে যে ভীষণ ব্যাপার হইতেছে, তুমি তাহাতে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন কর।" তৎপর একাকী উপাসনা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি পাল্কি করিয়া মন্দিরে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া পুনরায় দুইজনে মন্দিরে গিয়া উপাসনা করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের এই নিষ্ঠার কথা প্রচারিত হইলে, হিন্দু ব্রাহ্ম সকলেরই নিতান্ত বিস্ময় জন্মিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১২৭১ সনের ২০শে আশ্বিনের ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ভগ্নদশায় উপনীত হওয়ায়, উক্ত গৃহের সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক হয়। এজন্য কিছুদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা চলিতে থাকে। ঝড়ের পরবর্ত্তী বুধবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,—"অন্নদা বাবু পীড়িত আছেন, আসিতে পারিবেন না, অতএব তুমি ও পাকড়াশী মহাশয় অদ্য বেদীর কার্য্য কর।" এই মর্ম্মে তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্রকেও একখানা পত্র লিখিলেন। পাকড়াশী মহাশয় উপবীতধারী ছিলেন। উপবীতধারী ব্রাহ্ম বেদীর কার্য্য করিবেন,—উপাচার্য্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হইবে—শুনিয়া কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহযোগী গোস্বামী মহাশয় উভয়েই অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। এদিকে গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনা-গৃহে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই,

কোন উপবীতধারী আচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনা আরব্ধ হওয়ায় তিনি মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া, দরজায় দাঁড়াইয়া দুই বাহু বিস্তার করিয়া সকলকে উপবীতধারী আচার্য্যের উপাসনায় উপস্থিত হইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে আপন দলের লোক একত্র করিয়া তাঁহাদের সহিত কোন বন্ধুর গৃহে গিয়া উপাসনা করিলেন।

এইরূপে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলের মতভেদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়ায়, উভয় দলের পক্ষে একত্র কার্য্য করা কঠিন হইলে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হইল। কেশবচন্দ্র তাঁহার সহযোগী বন্ধুগণসহ ১২৭১ সনে স্বতন্ত্র প্রচার বিভাগ গঠন করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইলেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নবীন ব্রাহ্মদলকে দারুণ ক্লেশে পড়িতে হইল। যেন "চতুর্দ্দিকে অকূল সমুদ্র। তাহার মধ্যে সহায় সম্পত্তি বিহীন হইয়া কয়েক ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র-পরিবারসহ ভাসিতে লাগিলেন। বাহিরের বিপক্ষদিগের বিষাক্ত বাক্য-বাণে, আত্মীয়বর্গের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে, দিবানিশি তাঁহাদের শরীর মন ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। সাংসারের মধ্যে শান্তিলাভের আর কোথাও স্থান রহিল না, তাই অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরের আদেশ পালনের জন্য পরম আত্মীয় বন্ধুদিগের নিদারুণ ব্যবহার সকল অম্লান বদনে সহ্য করিতে লাগিলেন।" * 'এই সময় ব্রাহ্মসমাজের জীবনে এক অভিনব ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। যে সমস্ত স্বাধীন-প্রকৃতি উৎসাহশীল ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এক এক জনের মুখমণ্ডলে নিরন্তর উৎসাহের জ্যোতি প্রতিফলিত হইত। তাঁহারা অন্তস্ফূর্ত্ত নবজাত ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত হইয়া, রাশি রাশি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ সাহসের

* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত।

সহিত, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই উৎসাহী দলের অন্যতম। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ গঠন করিয়া তাঁহাদের সেই নবীন ভাব ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারে উদ্যোগী হইলে, গোস্বামী মহাশয় তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া প্রভূত উদ্যম সহকারে শত শত ক্রোশ পদব্রজে গমন করিয়া, অনলোপম উৎসাহে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণের প্রতি তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত হইল।

"জ্বলন্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎ কৃপা সহায় করিয়া বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্ষার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরি-তরঙ্গিনী যেমন প্রবল-বেগে উভয়কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহোৎসাহে সমুচ্ছ্বসিতপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মনামে সেইরূপ দেশ দেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। প্রভেদ এই—গিরিনদী উভয়কূলের চিরসঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি ধৌত করিতে যাইয়া আপনি মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ দেশের পাপ কুসংস্কার দূর করিতে যাইয়া স্বয়ং নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইতে লাগিলেন।" * 'তাঁহার উৎসাহপূর্ণ, প্রেমোদ্দীপ্ত, একত্বময় জীবন্তপ্রাণের মহাপ্রচার দর্শন করিয়া লোকে মুগ্ধ হইল; তাঁহার অনলবর্ষী, মর্ম্মস্পর্শী, অমৃতোপম মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া সকলের প্রাণ জাগ্রত ও মন শীতল হইল।'

"বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত স্বর্গ-দূতের ন্যায় প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় নামিলেন। 'যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।' যেমন কথা তেমনি কাজ। দেহমনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ মহামন্ত্র সার করিয়া প্রভুর চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, প্রভুর মহাকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর কার্য্যে তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার অবসর রহিল না। তিনি আপনার

* তত্ত্বকৌমুদী (১৮২১ শক)।

শরীরের দিকেও দৃক্‌পাত করিলেন না। পরিজনের অসুবিধা সুখ স্বচ্ছন্দতার পানেও চাহিলেন না; এবং নিন্দা প্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন না। অবিচলিত উৎসাহে,' অটল অধ্যবসায়ে পূর্ণপ্রাণে প্রভুর কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গতি অবারিত এবং বাণী অপরাঙ্মুখা হইল।' *

১২৭১ সনের (১৭৮৬ শক) কার্ত্তিক মাস হইতে নবীন ব্রাহ্মদলের মুখপত্র ধর্ম্মতত্ত্ব মাসিক আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। উক্ত পত্রে তাঁহারা আপনাদের স্বাধীন ধর্ম্মমত মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখনকার ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় উহা কিরূপ স্বাধীনতা ও তেজের সহিত সম্পাদিত হইত। ধর্ম্মতত্ত্বে অনেক সময় গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধ বাহির হইত। ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, সংস্কার-প্রিয়তা ও উন্নতিশীলতা বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মতত্ত্ব পরে পাক্ষিকে পরিণত হইয়াছে।

কলিকাতায় উভয়দলের ব্রাহ্মগণের মধ্যে ঘোরতর মতভেদের আরম্ভ হইলে, গোস্বামী মহাশয় ধর্ম্মপ্রচারার্থ মফঃস্বল যাত্রা করিলেন। তখন ঢাকাতে ৺দীননাথ সেন, ৺ব্রজসুন্দর মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা একজন ব্রহ্মজ্ঞ শিক্ষকের জন্য আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে পত্র লিখিলে, গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বন্ধু অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া ১২৭১ সনের শেষভাগে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, ঢাকায় গমন করেন। অঘোরনাথ উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র কুড়িটাকা মাত্র বেতনে শিক্ষক হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, ঢাকার লোকদের মনে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছিল। কারণ, অর্থ গ্রহণ ব্যতীত অপর কোন মহত্তর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, এ বোধ তখন অতি অল্প লোকেরই ছিল।

* তত্ত্বকৌমুদী ১৮২১ শক।

সাধু অঘোরনাথকে ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে পূর্ব্ববাঙ্গালার খ্যাতনামা এবং ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উৎসাহ-দাতা ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমানিটোলাস্থ বাটীতে বাস করিতেন। তথায় বাস করিয়া একজন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য্যে ও অপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী ছিলেন। ব্রজসুন্দর বাবু কর্ম্মোপলক্ষে কুমিল্লায় অবস্থান করিয়াও ঢাকার উন্নতির জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তিনি তাঁহার আরমানিটোলাস্থ প্রশস্ত গৃহের নীচের ঘর স্কুলের জন্য ও উপরের একটী বড় ঘর ব্রহ্মোপাসনার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি উক্ত স্কুলের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা সাহায্য করিতেন।

আমরা মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট অবগত হইয়াছি, আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র প্রচার বিভাগ গঠন করিয়া ফণ্ড স্থাপনে উদ্যোগী হইলে, মিত্রমহাশয় উহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। গোস্বামী মহাশয় এক-দিন ব্রজসুন্দর বাবুর কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"তিনি (ব্রজসুন্দর বাবু) আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদ্বারা আমি বহু প্রকারে উপকৃত হইয়াছি; ব্রাহ্মসমাজও তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত। একদিন ঢাকার বাসায় তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে আমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদের কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম, 'একটী ফণ্ড না থাকায় তাঁহাদের কোন কোন দিন আহারেরই সংস্থান হয় না।' শুনিয়া ব্রজসুন্দর বাবু ব্যথিত হইলেন; এবং সেই দিন সমাজে (তখন তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইত) যত লোক উপস্থিত হইলেন সকলের নিকট প্রস্তাব করিয়া চাঁদা ধরিলেন; নিজেও স্বাক্ষর করিলেন। একদিনে সাতশত টাকা স্বাক্ষরিত হইল, এবং সেই টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় পাঠান হইল।" এইরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডের সূত্রপাত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে পূর্ব্ববাঙ্গালায় সর্ব্বাগ্রে গোস্বামী মহাশয় গমন করেন। ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য; এই কার্য্য সম্পাদনার্থে তিনি ঢাকাতে যে সমস্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন, উহাতে তথায় বিশেষ আন্দোলন ও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়; এবং শিক্ষিত লোকের প্রাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে। তিনি বক্তৃতাতে এই সত্যটী বিশেষরূপে শ্রোতাদের হৃদয়ে নিবদ্ধ করিতে যত্ন করিতেন যে, 'শুধু ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে বিশ্বাস করিলে চলিবে না, তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে'। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, নীতি, চরিত্র, ধর্ম্ম ইত্যাদি তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত অনুরাগ ও আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। ক্রমে তাঁহার বক্তৃতায় অনেক যুবকের মনে স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইহার ফলস্বরূপ বিখ্যাত গৌর সুন্দর রায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় উপবীত পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। গোবিন্দ বাবু ঢাকার প্রথম উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম এবং ঢাকার বিখ্যাত উকীল আনন্দ রায় মহাশয়ের ভ্রাতা। উন্নতিশীল দলের মুখপত্র ঢাকা-প্রকাশের পরিচালনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

ইতি পূর্ব্বে ৺দীননাথ সেন প্রভৃতি উদ্যমশীল ব্রাহ্মগণ ব্রজসুন্দর মিত্র মহোদয়ের বিধবা কন্যার বিবাহে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতায় তাঁহাদের উৎসাহানল পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তাঁহারা নব-উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদিন ঢাকাতে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল তাহার সঙ্গে হিন্দুসমাজের বিশেষ কোন বিরোধ ছিল না। উহার কার্য্যাবলী হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া সম্পন্ন হইত। হিন্দুসমাজের সঙ্গে কতদুর যোগ ছিল তাহা ইহাদ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে যে, একবার আরমানিয়ান খৃষ্টানগণ ব্রাহ্মসমাজের

উপাসনায় উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না দিয়া, বাহিরে আসন দেওয়া হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতায় এই প্রাচীন ভাব দূর হইয়া শ্রোতাদের মনে নূতন ভাব ও চিন্তার উদয় হইল।

তাঁহার বক্তৃতায় প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় দীনবাবু প্রভৃতি উপবীত-ত্যাগী গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আহার করিলেন। ইহাতে সামাজিকগণের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, এবং যে ঢাকার অধিবাসিগণ এতদিন ব্রাহ্মগণকে কোনরূপ ভীতির চক্ষে দর্শন করে নাই, তাহাদেরও মনে আতঙ্ক জন্মিল। হিন্দুসমাজের অন্যতম দলপতি ৺কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায়, অগ্রসরদলকে নির্য্যাতন করিবার জন্য হিন্দুসমাজ জাগিয়া উঠিয়া হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং তাঁহাদের উদ্যোগে ঢাকাপ্রকাশের প্রতিযোগিনীরূপে হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা বাহির হইল। এইরূপে দুই দলের দুইখানি পত্র পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে সজাগ করিয়া তুলিল।

গোস্বামী মহাশয় এই সময় উৎসাহে মত্ত হইয়া যাতায়াতের অসুবিধা সত্ত্বেও প্রচারার্থে পূর্ব্ববাঙ্গালার নানাস্থানে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ৺ ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় কুমিল্লা অবস্থিতি করিতেন। গোস্বামী মহাশয় ঢাকা হইতে বাহির হইয়া, প্রথমেই কুমিল্লায় তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। প্রখর রৌদ্র-তাপে শুষ্কমুখ এবং পথশ্রমে কাতর হইয়া, মধ্যাহ্নকালে ব্রজসুন্দর বাবুর কুমিল্লাস্থ গৃহে তিনি যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পিতৃদেবের কুমিল্লায় অবস্থান কালে একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময়ে দুইটী ভদ্রলোক আসিয়া সদরের ঘরের বারাণ্ডায় বসিলেন। ভৃত্যেরা

ঘুমাইয়াছিল, কেহ তত্ত্ব লয় নাই। অপরাহ্ন ৪ টার সময়ে পিতৃদেব তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভৃত্যগণকে স্নানের তেল ইত্যাদি দিতে ও বাড়ীর ভিতর হইতে জলখাবার আনিয়া জল খাওয়াইয়া শীঘ্র রান্নার আয়োজন করিয়া দিতে বলিলেন ; এবং অন্দরে আসিয়া বলিলেন, 'শান্তিপুরের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আলিয়ার-গঞ্জ হইতে হাঁটিয়া আসিয়া বেলা একটার সময় হইতে বসিয়া রহিয়াছেন, বাসার লোকগুলি ঘুমাইয়া ছিল, একবার সংবাদ লয় নাই। ইহাতে মনে ক্লেশ পাইয়াছি। ইনি সাতশত ঘর শিষ্য ছাড়িয়া পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন।' তৎপর গৃহে এবং ব্রাহ্মসমাজে গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় কুমিল্লা সহর জাগিয়া উঠিল। পিতৃদেবের সঙ্গে ইঁহার অত্যন্ত বন্ধুতা জন্মিল। (অবশ্য পিতৃদেবের বয়স বেশী এবং ইঁহার বয়স কম ছিল) ইঁহার স্বার্থত্যাগ, ধর্ম্মপিপাসা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ইঁহার উপর আমাদের অত্যন্ত ভক্তির উদ্রেক হইল। সেই হইতে গোস্বামী-পরিবারের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা।"

কুমিল্লার ব্রাহ্মগণ এতদিন নিতান্ত নির্জ্জীবভাবে বাস করিতেছিলেন। এখন নবাগত উদ্যমশীল প্রচারক ভ্রাতার আগমনে তাঁহাদের মৃতভাব অপনীত হইল। তাঁহার বক্তৃতা, উপাসনা ও উপদেশ তাঁহাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিল। ব্রজসুন্দর বাবুর সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের কিরূপ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল তাহা তাঁহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"মহাশয়ের স্নেহে আমি নিতান্তই বাধ্য হইয়াছি। বলিতে কি, সময়ে সময়ে মহাশয়কে মনে করিয়া হৃদয় ক্রন্দন পর্য্যন্ত করিয়াছে। আপনিও আমার মত কষ্ট পাইতেছেন তাহা আমি অগ্রেই জানিয়াছি। মহাশয় ঢাকায় থাকিলে যে কত উপকার হইত তাহা বুঝিতেই পারিতেছি।

যদিও দীনবাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তথাপি প্রাচীনদিগকে আনা হইতেছে না। কিন্তু যে তিনশত সাড়ে তিনশত লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উপকার হইয়াছে।"

গোস্বামী মহাশয় কুমিল্লা গিয়াই নিরস্ত হইলেন না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া ব্রাহ্মগণের জীবনের অবস্থা অনুসন্ধান করিতে এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবনগঠনে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেখিতে পাইলেন, অধিকাংশ স্থানে ব্রাহ্মগণ কেবল সপ্তাহান্তে উপাসনা করেন, কিন্তু প্রতিদিন উপাসনা করেন না; এবং পৌত্তলিকতার সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ যোগ রহিয়াছে। এমন কি, অনেক স্থানের ব্রাহ্মগণ গোস্বামীমহাশয়কে উপবীত-ত্যাগী বলিয়া গৃহে স্থান দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে গৃহে স্থান দিয়া সমাজচ্যুত হইলেন। তিনি যেখানে গমন করিতেন, সেখানেই যাহাতে ব্রাহ্মগণ প্রতিদিন উপাসনা করেন, এবং পৌত্তলিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তাঁহার আলোচনা ও বক্তৃতায় অল্পদিনমধ্যে পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেক স্থানে সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেক স্থানে ধর্ম্মান্দোলন উত্থিত হওয়াতে সঙ্গতসভার প্রতিষ্ঠা হইয়া নিয়মমত আলোচনাদি হইতে লাগিল। অনেকে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভক্তিভাবে উপাসনাদি করিয়া ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রাচীন লোকেরা বলিয়াছেন,—"গোস্বামী মহাশয়দ্বারা উক্ত প্রদেশে যেরূপ ধর্ম্মপ্রচার হইয়াছে এমন আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে ধর্ম্মান্দোলন প্রজ্বলিত করিয়া তুলেন।"

এই সময়ের কার্য্য সম্বন্ধে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন :—"দলে দলে লোক নামে ব্রাহ্ম হইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কার্য্যতঃ ব্যভিচার ও ধর্ম্মহীনতার সমর্থন করিতেন। তাঁহারা সপ্তাহান্তে উপাসনায় আসিতেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উপাসনার অনুরূপ জীবনগঠনে ব্রতী ছিলেন না। গোস্বামী মহাশয় মফঃস্বল ঘুরিয়া ঘুরিয়া এইরূপ হীনাবস্থা দর্শনে ব্যথিত হন, এবং কার্য্যতঃ ব্রাহ্ম হইতে সকলকে উপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশে এবং খাঁটি ব্রাহ্মজীবন দেখিয়া লোকের জীবনের পরিবর্ত্তন আরব্ধ হয়।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন :—"পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ গোস্বামী মহাশয়। একজন প্রধান প্রচারককে বলিতে শুনিয়াছি যে, পশ্চিম বাঙ্গালায় যেমন কেশবচন্দ্র পূর্ব্ববাঙ্গালায় সেইরূপ বিজয়কৃষ্ণ। বরিশালে গিয়া শুনিলাম যে সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা উন্নতি হইয়াছে বিজয়কৃষ্ণই তাহার প্রধান কারণ। ঢাকার নবকান্ত বাবুর মুখে সেই কথাই শুনিলাম। সমগ্র পূর্ব্ববাঙ্গালায় যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ গোস্বামী মহাশয়েরই যত্নে।" *

ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয় "ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য" নামে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু অর্থাভাবে উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখেন;—"শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন মহাশয় উহার কাগজ দিতে সম্মত হইয়াছেন; অধুনা মহাশয় মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়টী দিলে ভাল হয়। এ পুস্তকের স্বত্ব আমার নহে, যাঁহাদিগের ব্যয়দ্বারা পুস্তক প্রকটিত হইবে ইহাতে তাঁহাদেরই স্বত্ব হইবে।"

ঢাকাতে অল্পদিন মধ্যে তাঁহার কার্য্যের সুফল দর্শনে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কলিকাতায় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কর্ণে তাঁহার

* ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা; তত্ত্বকৌমুদী (১৮১০ শক)

কার্য্যকুশলতার বার্ত্তা পঁহুছিলে তিনি উৎসাহান্বিত হইয়া তাঁহার প্রচারক ভ্রাতাকে নিম্নলিখিত উদ্দীপনাপূর্ণ পত্র লিখেন:—

"জয় জগদীশ।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

জয় জয়, বিজয়ের জয়! তুমি যে জয়-পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি! তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আসিয়া আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? আবার বলি জয় জয়! ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। আর আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর; বৈরাগী হইয়া সংসারকে পদানত কর। উৎসাহের দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর। প্রীতি-সূত্রে সকলকে বদ্ধ কর; এবং দেশ বিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তৃত কর; এবং তোমার সঙ্গতের দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে সম্রাট অপেক্ষা ধনবান কর। আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি। তুমি যত প্রচার করিবে, ততই আমাদের ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। ভাল, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি কি একা সমুদয় সুখ ভোগ করিবে? ঢাকাতে যে সকল অমূল্য-রত্ন ঢাকা ছিল তাহা কি কেবল আপনি গ্রহণ করিবে? আমাকে কি একবারও ডাকিতে নাই? নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে পড়িয়া আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হইতে দিবে না?

আমার কি ঢাকায় যাইবার কোন সুবিধা নাই? তুমি না পথ দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসর হইবার যো নাই।

কলিকাতা, কলুটোলা। } অভিন্নহৃদয়
২৪শে মাঘ, ১৭৮৬ শক। } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এইরূপে চতুর্দ্দিকে তাঁহার কার্য্যের সুফল উৎপন্ন হওয়ায়, যেমন উহা তাঁহার উৎসাহের কারণ হইয়াছিল, পক্ষান্তরে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মগণকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া তাঁহার ক্লেশেরও অবধি ছিল না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া গিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন;—"প্রত্যাবর্ত্তনকারী দল আমাকে কেবল বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইত না, নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিত। প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া আমাকে নানা স্থানে এইরূপে এত উৎপীড়ন ও অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছে যে সে সকলের উল্লেখ করিলে, একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখিত হইতে পারে।

গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্ববাঙ্গালার নানা স্থানে ঘুরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপর সাধু অঘোরনাথকে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যে রাখিয়া শান্তিপুর গমন করেন। সেখানে তাঁহার শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে। তখন তিনি এরূপ অর্থাভাবে ছিলেন যে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থাও করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববাঙ্গালাস্থ বন্ধু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় তাঁহাকে অনেক সময় পত্রাদি লিখিতেন, ও অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি অর্থ গ্রহণ করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ প্রকাশ করিতেন। বন্ধুর স্নেহই তাঁহার নিকট অধিক মূল্যবান ছিল। এইজন্য বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন;—

"এই জীর্ণ রোগে যদি আমাকে শীঘ্র নাশ করে তথাপি পরকালে আপনার মধুময় স্নেহ লাভ করিব। ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পরকালে পুনর্ব্বার সম্মিলন হইবে।" "আপনি আমাকে যে অমূল্য স্নেহ-রত্ন দান করিয়াছেন তদ্ভিন্ন আমি অন্য দানের অভিলাষী নহি। আপনার অর্থ আমাকে চিরকাল সুখী করিবে না, কিন্তু আপনার স্নেহ দ্বারা চিরকাল সুখ ভোগ করিব। আপনার পত্র পাইলে এবং আপনাকে পত্র লিখিতে পারিলে আমার যে আনন্দ হয়, অর্থের সহিত তাহার বিনিময় হয় না। আমি যদি আমার পাষাণ হৃদয়কে ঈশ্বরপ্রেমে বিগলিত করিতে পারি এবং বন্ধুদিগের অমূল্য স্নেহ-রত্ন উপভোগ করি, তাহা হইলে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা আমার নিকটেও আসিবে না। তখন ছিন্ন-বস্ত্র পট্ট-বস্ত্র বোধ হইবে, তৃণশূন্য পর্ণ-কুটীরও রাজ-প্রাসাদকে তিরস্কার করিবে। বলিতে কি, এই অবস্থাই এ অধমের প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনার দয়া অনাথ-দিগকে মাতার ন্যায় লালন পালন করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।" ১৭৮৭ শক ১২ই ভাদ্র। *

ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে আসিয়া যাঁহারা জীবনের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। অনেকে তাঁহার সংসর্গে আসিয়া ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় পূর্ব্বে একজন ব্যবসায়ীর অধীনে সামান্য কাজ করিতেন। তিনি ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া ঢাকায় গমন করেন এবং তথাকার ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদবধি তাঁহার উন্নতির আরম্ভ হয়।

গোস্বামী মহাশয় এই সময় ব্রাহ্মসমাজ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য পাইতেন; তদ্দ্বারা কোনরূপে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু

* ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত

উহাও গ্রহণ না করা তাঁহার নিকট ধর্ম্মসঙ্গত বোধ হইল। তাঁহার কথা এই:—"আমি কাহারও অর্থ সাহায্য না লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে অভিলাষ করিয়াছি। এজন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে মাসিক যে সাহায্য লইতাম তাহাও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ধর্ম্মের কার্য্য করিয়া অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মের জন্য যদি অন্নাভাবে শুষ্ক হইয়া মরিতে হয় তজ্জন্য কি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে হইবে? কখনই নয়। যদিও আমি ধনহীন দরিদ্র, কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার উদার সদাব্রতে কেহই উপবাসী থাকে না। আমি মনে করিয়াছি যে কোন স্থানে কৃষিকার্য্য করিব, এবং সেখানে ডাক্তারি চিকিৎসা করিব, কোন মনুষ্যের অধীনতায় থাকিতে পারিব না; কারণ সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভ্রমণ করিতে হইবে।" ১৭৮৭ শক ১৫ই ভাদ্র শান্তিপুর।

'ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়; এবং স্বাধীনভাবে প্রচার ও পরিবার প্রতিপালন কর্ত্তব্য,' বোধে তিনি পরে কিছু দিন ঢাকাতে চিকিৎসা করেন।

পূর্ব্বহইতেই ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় এই নিষ্ঠাবান প্রচারকের ব্যাকুলতা, ও ধর্ম্মানুরাগে নিতান্ত মুগ্ধ ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইঁহার কার্য্যদ্বারা জনসাধারণের বিশেষ হিতসাধন হইবে। এজন্য তাঁহাকে ঢাকাতে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনুরোধ ও আহ্বান করেন। ঢাকাস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মগণও তাঁহার কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট ছিলেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার পুনরায় ঢাকায় আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করা স্থির হয়। এইবার ঢাকাতে আসিয়া যদিও তিনি কতক দিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অন্তরায় হইলেই পরিত্যাগ করেন। তিনি ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিয়াছিলেন:—"ব্রাহ্মধর্ম্ম আমার জীবন, 'যেখানে

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অসুবিধা হইবে, সেখানে আমার থাকা হইবে না। * * চিকিৎসা দ্বারা ধনী ও মান্য হওয়া আমার কিছুমাত্র উদ্দেশ্য নহে,* কোনরূপে কষ্টে পরিবার ভরণ-পোষণপূর্ব্বক প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য।" ১৭৮৭ শক ৩০ শে ভাদ্র।

সাতশত ঘর শিষ্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ, ও পরে নানা ক্লেশ ও অর্থাভাবের মধ্যেও নির্দ্ধারিত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ স্বাধীনজীবন যাপনে প্রবৃত্ত হওয়া মহৎ স্বার্থত্যাগ বটে। এই স্বার্থ-ত্যাগের পরিণামে কত সময় ক্ষুধায় খাদ্যের অভাবে, রোগে ঔষধ-পথ্যের অভাবে, শীতে শীত-বস্ত্রের অভাবে তাঁহার পরিবার পরিজনকে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। সংসারের শত শত নরনারী স্বচ্ছলতার জন্য অনায়াসে ধর্ম্ম, ন্যায়, প্রেম, বিসর্জ্জন দিতেছে, আর এই মহাত্মা ধর্ম্মের জন্য সকল বিসর্জ্জন দিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইয়াছেন।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শান্তিপুরের বাটীতে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে ১২৭২ বঙ্গাব্দে, কলিকাতা উপস্থিত হইলেন; এবং তথা হইতে কেশবচন্দ্র ও অঘোরনাথের সঙ্গে ৩০শে আশ্বিন পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার যাত্রা করিলেন।

প্রচার কার্য্যে তাঁহার বিশ্রাম ছিল না, যেন ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিতেন। কোথাও এক সপ্তাহ, কোথাও দুই সপ্তাহ, কোথাও বা ততোধিক সময় বাস করিয়া বক্তৃতা উপাসনাদি করিতেন, এবং কার্য্যাবসানে পুনরায় স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই, আহার নিদ্রার প্রতি দৃষ্টি নাই, অথচ কোন কোন দিন দুইবার তিনবার উপাসনা, বক্তৃতা করিতেন। এইরূপ ক্লান্তি-বিহীন পরিশ্রম ও বিশ্রাম-বিহীন পর্য্যটন মানুষ কেবল আপনার ইচ্ছায় করিতে পারে না। তবে প্রচারকার্য্যে তাঁহার এইরূপ অনুরাগের মূল কি? প্রচারকদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত ধর্ম্মতত্ত্বের

প্রবন্ধ লক্ষ্য করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহাতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এজন্য উহা উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন অধম প্রচারক। আমি নামের বা গৌরবের জন্য প্রচার-ব্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে। ইহা আমার যত্ন সাপেক্ষ নহে, ইহার উপর আমার কোন প্রভুত্ব নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গেও ইহার প্রায় কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আমাকে অন্ধের ন্যায় পরিচালন করে, এবং ভবিষ্যতে কোথায় পরিচালন করিবে বলিতে পারি না। ইহা আমার প্রবৃত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুমত কার্য্য-সম্পাদনে ইহাই আমাকে উত্তেজনা করে, এবং নিজ আত্মার মহোন্নতি সাধন করিতেও ব্যাকুল করে। ইহার আদেশ এরূপ পরিষ্কার ও বোধগম্য, যে আমি কখন ইহা বিস্মৃত হইতে ও অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

ইহাই আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি সর্ব্বদা মনকে বুঝাই ; বলি, হৃদয় তুমি কি জানিতেছ না যে তুমি অত্যন্ত মলিন ও অধম। তুমি কি সাহসে প্রচার কার্য্যের গুরুভার আপনার মস্তকে লইতে সাহসী হইলে ? কিন্তু পরক্ষণেই উপরি লিখিত শক্তি আমার অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে ; এবং বলে "তুমি অগ্রসর হও।" আমার বিশ্বাস এই শক্তির আদেশ ঈশ্বরের বাক্য, ইহা প্রচারকের জীবন, ইহাই ভয় বিপদের সম্বল, নিরাশার ঔষধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইহা ব্যতীত, আমি অন্ধ অপেক্ষাও অসহায় হইয়া যাই, মুমূর্ষু অপেক্ষাও নির্জীব হইয়া যাই।

আমি সততই এই শক্তির আদেশ গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক তাহা প্রতিপালন করি ; এবং যখনই প্রতি-

পালন করিতে সাহসী হই, তখনই সফলতা লাভ করি। তখন আমার আত্মাতে আলোক আসে। আমি যাহা বলি লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। আমি যাহা বলি, যাহা করি তাহাতে আমার অনুমাত্র গৌরব নাই। কারণ আমি নিঃসন্দেহ জানিতে পারি যে ইহা আমার শক্তি হইতে নহে। যদি আমার শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে লোকের নিকট এরূপ হাস্যাস্পদ ও বিফল হই যে, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম। কার্য্যের সময় আপনার প্রতি নির্ভর করিতে হইবে ইহা মনে হইলে যথার্থ বলিতেছি আমার শরীর কম্পিত হয়। আমি নিশ্চয় জানিতেছি আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবে না এবং কোন কার্য্যের গৌরবেই আমার অধিকার নাই। পাপ পুণ্যে, সুখে অসুখে, সম্পদে দারিদ্র্যে আমি এই অদ্ভুত শক্তির আদেশ শুনিতে পাই। নিষ্কলঙ্ক নীল-আকাশ দেখিয়া হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রশস্ত হয় তখন ইহা আমাকে বলে, 'তুমি এমত সুন্দর জগতের এক স্থানে বসিয়া কি করিবে?' যখন সুমন্দ সুমিষ্ট মারুত আমার তাবৎ শরীরকে সুখী করে তখন ইহা বলে, তুমি কি সুখে গৃহে বসিয়া আছ, এই অনিল-হিল্লোল কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে বিবেচনা কর এবং তুমিও সেইরূপ সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ কর। ইহার রমণীয়তা দেশভেদে, কালভেদে, অসমান নহে; তোমার অনুরাগ ও চেষ্টা সেইরূপ মধুরবাহিনী হইবে, অগ্রসর হও।' অমনি আমার শরীর মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠে; এবং যেখানে তাঁহার কার্য্য সেইখানেই যাইতে ব্যস্ত হয়। "অগ্রসর হও" এই প্রকার আদেশ শুনিলে আমার হৃৎকম্প হয়, ভয়ে দুঃখে বিশ্বাসে বিস্ময়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়। আমি কোন ক্রমেই ঐ আদেশ না শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমার গৌরব নহে, কিন্তু মনের কথা; এবং কেনই যে এ কথা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার সকল

অবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্ত্তী হইয়াছি; এবং সকল অবস্থাতেই হইব। ইহার বশবর্ত্তী হইয়া সকল সময়েই আমি আশার অতীত ফললাভ করিয়াছি। অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও নিরাশা ইহারই জন্য আমাকে গতাসু করিতে পারে না; নতুবা আমি যেরূপ এই জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড শক্তির ইঙ্গিতে যে তীর্থ স্থানে গমন করিবার আমার এত আশা, যেখানকার কথা শুনিলে আমার নয়নবারি বিগলিত হয় এবং যেখানে যাইবার জন্য সততই আমার দুর্ব্বল চরণ ব্যস্ত রহিয়াছে, পরিণামে নির্ব্বিঘ্নে আমি সেই প্রাণসম তীর্থস্থানে উপনীত হইতে পারিব। পরমেশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি কারণে আমি প্রচারক হইয়াছি এবং কেনই যে আমি অদ্যাবধি প্রচারক নাম ধারণ করিতেছি তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।" *

তাঁহার ঐ সময়ের প্রচার বিবরণ এবং ধর্ম্মতত্ত্বের মন্তব্য, ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"১৭৮৭ শকে সাতজন প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অন্যতম। তাঁহার গভীর উদার উপদেশ, নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, প্রগাঢ় নিষ্ঠা, এবং জীবনের কঠোর ত্যাগ-স্বীকার যেখানে সরল সাধারণ লোকেরা এবং অন্যান্যেরা দর্শন করিয়াছে তাহারাই শ্রদ্ধা ও অনুরাগাঞ্জলী না দিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে নাই। এই সনে বিজয়বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন এবং ছয়মাস কাল ভ্রমণ করিয়া নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি বহু অনুরোধে ঐ প্রচার বিবরণ প্রকাশে সম্মতি দিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের মহচ্চরিত্র ও প্রচারকার্য্য বিষয়ে তাঁহার অসামান্য স্বর্গীয় উৎসাহ তৎকালের কাহারও অবিদিত ছিল না। তাঁহার ন্যায় একাগ্র-চিত্ত ব্রহ্ম-নিষ্ঠ প্রচারকের

* ধর্ম্ম তত্ত্ব।

সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হয়। তাঁহার স্বকীয় স্বাধীন চেষ্টায় বঙ্গদেশে তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের কিদৃশী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল তাহা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। ত্রিপুরা চট্টগ্রামস্থ নিস্তব্ধ গিরি-শিখর অবধি নবদ্বীপস্থ পৌত্তলিকতার দুর্গমদুর্গস্বরূপ চতুষ্পাঠিচয় পর্য্যন্ত তাঁহার চরণদ্বয় নিরবধি পরিভ্রমণ করিয়াছে। তিনি বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমা হইতে অকূল বঙ্গসাগরের ঘননীলাম্বুরাশি মধ্যে সূর্য্যের সন্ধ্যাবগাহন দর্শন করিয়াছেন; তিনি শত শত তরঙ্গাস্ফালিত নদনদীর ভ্রূকুটী অতিক্রম করিয়াছেন; এবং একখানি ক্ষুদ্র তরণীযোগে বিশালবক্ষ ভীষণপদ্মার বিষম আবর্ত্তের সন্নিহিত হইয়াছেন, যে তরণী সংকীর্ণ ভাগিরথীর সামান্য আন্দোলনেও সহজে জলসাৎ হইতে পারে। তিনি অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার হৃদয়ের স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন।" *

'তাঁহারা ৩০শে আশ্বিন কলিকাতা হইতে বহির্গত হইয়া ১২ই কার্ত্তিক ফরিদপুর উপস্থিত হন। তখন কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল; কুষ্টিয়া হইতে নৌকাযোগে ফরিদপুর গমন করেন। ফরিদপুরে দুই তিন দিন তাঁহাদের বক্তৃতা উপাসনা ও আলোচনা হয়, এবং ১৫ই কার্ত্তিক ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে নৌকাতে দুই বেলা তাঁহাদের রন্ধন ভোজন হইত, তিনজন মিলিয়া রন্ধনাদি করিতেন। ১৯শে কার্ত্তিক তাঁহারা ঢাকাতে উপনীত হইয়া প্রথমে বাঙ্গালাবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী জীবন বাবুর বহির্ব্বাটীতে অবস্থান করেন। যে দিন ঢাকায় উপস্থিত হন, সে দিন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণের জন্য ঢাকার লোকের আগ্রহ ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বুড়ীগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া তথাকার ব্রাহ্মগণ উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে পাইয়া সকলের আনন্দের অবধি ছিল না।

* ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮৮৭ শক, আশ্বিন।

কিন্তু তবু কেহ স্বীয় আবাসে, তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। এক বৈরাগীর আখড়াতে তাঁহাদের জন্য সামান্যরূপ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত; আর বেলা দ্বিতীয় প্রহরান্তে একজন ভৃত্য উহা বহন করিয়া লইয়া আসিত। ইহাতে প্রতিদিন ঠাণ্ডা অন্নব্যঞ্জনে তাঁহাদের আহারের কষ্ট সহ্য করিতে হইত।' * কিন্তু এই সমস্ত কষ্টকে তাঁহারা কষ্টজ্ঞান করিতেন না। কয়েক দিন পরে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমাণিটোলাস্থ বাড়ীতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এ স্থানে তাঁহাদিগকে পাচক অভাবে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত। গোঁসাইজী ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিয়াছিলেন;—"সম্প্রতি আমরা (কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ) আপনারই প্রশস্ত ভবনে অথবা মিসন হাউসে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছি। আমাদের রন্ধনাদি পর্য্যন্ত দ্বিতীয়তল গৃহে, কিছুতেই অসুবিধা নাই। কিন্তু ভৃত্যাভাবে রন্ধন করিতে করিতে দিন দিন অসুস্থ হইতেছি। আমাদের এই যে ভৃত্য না পাওয়া ইহাতেও ত্যাগস্বীকারের ধর্ম্ম পরীক্ষা হইল।" ১৭৮৭ শক, ২৪শে কার্ত্তিক।

তাঁহারা প্রায় একমাস কাল ঢাকাতে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রায় প্রতিদিনই উপাসনা, বক্তৃতা কিংবা আলোচনা হইত। বক্তৃতা, প্রার্থনা, এবং আলোচনা সভায় প্রধানতঃ কেশবচন্দ্র সভাপতির কার্য্য করিতেন; আর উপাসনায় গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। গোস্বামী মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজকর্ত্তৃক উক্ত সমাজের আচার্য্যের পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। এই সময় ঢাকাসহরের তিন স্থানে তিনটী ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিত; এবং ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমাণিটোলাস্থ ভবনের একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইত। আচার্য্য কেশব-

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র হইতে সংগৃহীত।

চন্দ্র ইংরাজিতে বিশ্বাস, প্রীতি, প্রত্যাদেশ, মুক্তি ও সহজজ্ঞান সম্বন্ধে এবং বাঙ্গালাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও আধ্যাত্মিকতা, সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় এক এক দিন চারি পাঁচ শত লোক উপস্থিত হইত।

১১ই অগ্রহায়ণ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া ময়মনসিংহ যাত্রা করিলেন; আর গোস্বামী মহাশয় একাকী ব্রজসুন্দর বাবুর আরমাণিটোলাস্থ গৃহে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী রহিলেন। তিনি ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিতেছেন;—"আমি আপনার প্রশস্ত ভবনে একাকী রহিলাম। কিন্তু একাকী নহি, যাঁহার সহিত কোন কালে বিচ্ছেদ হইবে না, সেই চিরজীবন-সখাই আমার সঙ্গী। এইক্ষণে ঢাকার যে প্রকার দুরবস্থা এ অবস্থায় কিছুকাল ঢাকায় অবস্থিতি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। আমি সেই জন্যই ঢাকায় রহিলাম। আপনি পুনঃ পুনঃ কুমিল্লায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য আমার ঔদ্ধত্য বা অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিবেন। আপনার উপরই আমার যত আবদার। স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে হইবে।"

গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে, লালবাগ ব্রাহ্মসমাজে ও বাঙ্গালা-বাজার ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ লোকদিগের চিকিৎসা করিলে, লোকদিগের উপকার সাধন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার এক সঙ্গে হইবে মনে করিয়া, তিনি উভয় কার্য্য একত্র আরম্ভ করেন। চিকিৎসায় তিনি প্রায়ই ভিজিট লইতেন না, কোন কোন স্থলে নাম মাত্র লইতেন। ঢাকার কোন্ প্রাচীন মহিলা বলিয়াছেন, তিনি আট আনার অধিক ভিজিট লইতেন না। অল্প পয়সায় বা বিনা পয়সায় পাইয়া তাঁহাকে লোকে এত

ডাকিত যে, তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার কষ্ট দেখিয়া নবকুমার বাবু একদিন গাড়ীর কথা বলিলে, তিনি পা দুইটিতে হাত দিয়া বলিলেন এই দুইটি ঘোড়া যতদিন পারে খাটুক। সামান্য ভিজিটেও তাঁহার এত অর্থাগম হইত যে প্রচারকের পক্ষে অত অধিক অর্থ গ্রহণ তাঁহার নিকট অনুচিত বোধ হইল। আর তাঁহার সুচিকিৎসায় এবং রোগীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে অল্পদিন মধ্যে তাঁহার হাতে রোগীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রচারেরও ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সুতরাং চিকিৎসা ব্যবসায় ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার চিকিৎসায় সফলতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প শুনিতে পাওয়া গিয়াছে ;—

'স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় এক সময় চিকিৎসায় অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা। তিনি নাকি স্বপ্নযোগে অনেক সময় গোস্বামী মহাশয়কে ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। গোঁসাই তাঁহার পরামর্শানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কঠিন রোগেরও অনায়াসে উপশম করিতেন।' *

চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিয়াছিলেন ;—

"অধমের নিবেদন,

আমি ভিখারীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ব্যবসায় করা আমার কার্য্য নহে। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। বোধ হয় অল্প দিন মধ্যেই আপনার গৃহ শূন্য থাকিবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতারা আমাকে সাহায্য করেন ভালই, না করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক।

---

* কোন শিষ্য হইতে সংগৃহীত।

আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক।" ১৭৮৭ শক পৌষ, ঢাকা।

গোস্বামী মহাশয় ১২ই পৌষ প্রচার উদ্দেশ্যে ঢাকাহইতে বরিশাল যাত্রা করেন। তথায় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের গৃহে পনর দিন অবস্থান করিয়া, নানাস্থানে উপাসনা বক্তৃতাদি করেন। তাঁহার উপাসনা, বক্তৃতায় প্রতিদিন শত শত লোক উপস্থিত হইয়া উপকৃত হইত। বরিশাল হইতে লিখিত পত্র ;—

"বরিশাল আসিয়া দুর্গামোহন বাবুর বাসায় অবস্থিতি করিতেছি। দুর্গামোহন বাবু আমাদের প্রধান বল। ঈশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। দুর্গামোহন বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত সরলা। ইঁহার কোন কুসংস্কার নাই। আমাদের সঙ্গে ইনি সমস্বরে উপাসনা করেন। বরিশালে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ উৎসাহী, এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। বরিশাল হইতে কুমিল্লা যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। * * আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে কপটতা দ্বারা আচ্ছন্ন দর্শন করিয়া দুঃখিত হইতে পারি না। আমার শরীরের এক এক বিন্দু রক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।" ১৭৮৭ শক, ১৮ই পৌষ বরিশাল।

তিনি বরিশাল হইতে নোয়াখালি যাত্রা করেন। পথে নৌকায় ঝড়ে পতিত হন। বিপদে মাঝিদের মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন— "সরল বিশ্বাস বিপদকালের অকৃত্রিম বন্ধু।" নোয়াখালি ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে ৫।৬ জন লোক উপস্থিত হইত, সামাজিক ভয়ে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজে আসিত না। কয়েক দিন অবস্থানের পর, তাঁহার বক্তৃতায় শতাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

নোয়াখালি হইতে তিনি ৫ই মাঘ চট্টগ্রাম যাত্রা করেন ; পথে চট্টগ্রাম পাহাড়, চন্দ্রনাথ পাহাড় ও রঘুনন্দনের পাহাড় দর্শন করেন। চন্দ্রনাথ

পাহাড়ের মহান্ত বাবাজির বিষয়ী কুলীন ব্রাহ্মণের ন্যায় চালচলন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। লবণাখ্যকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, গুরুধ্বনিকুণ্ড, সহস্রধারা ইত্যাদি প্রস্রবণ ও জলপ্রপাত দেখিয়া তাঁহার ভাবপ্রবণ চিত্ত নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—"এই সমস্ত চিত্তচমৎকারিণী শোভা দর্শন করিতে করিতে আমার নীচ মনও ঈশ্বরের দিকে উন্নত হইতে লাগিল। দগ্ধ মৃত্তিকার নির্জ্জীব শুষ্ক শোভাপেক্ষা এই সকল জীবন্ত শোভা যে কি অনির্ব্বচনীয় গভীর আনন্দভাবে পরিপূর্ণ, বাক্য তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।" *

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। তথা হইতে পটিয়া অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। তথায় "মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পুনরায় চট্টগ্রাম আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম, পরকাল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা, ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, উভয় স্থানে লোকের মধ্যে বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহ জন্মে।

চট্টগ্রামের পথের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"পদব্রজে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমনকালে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সীতাকুণ্ডের নিকট পর্ব্বতপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়াছিলাম। তখন দেখিলাম যে সমস্ত বৃহৎকায় নক্ষত্রমণ্ডল, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার সম্মুখে ঘোরবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। তাহার পশ্চাদ্দেশে এক মহান পুরুষকে দেখিলাম। কিন্তু এই দৃশ্য আমি অধিকবার দেখিতে পাইলাম না। আমি সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কে পরিচয় দাও।' তিনি বলিলেন, 'আমি পুরুষ, আর যাহা দেখিতেছ ইহা প্রকৃতি।' প্রাচীন গ্রন্থে পুরুষ ও প্রকৃতি

* ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৮৭, চৈত্র।

সম্বন্ধে নানা কথা পাঠ করিয়াছিলাম। এই ব্যাপারে আমার হৃদয়ের এক দ্বার উন্মুক্ত হইল। ঈশ্বরের সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি কি? পুরুষ সত্ত্বা মাত্র। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইহাই পুরুষ। এই পুরুষের মহিমা বর্ণনাতেই উপনিষদ ও শ্রুতি পূর্ণ।" *

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন যাতায়াতের কোনরূপ সুবিধা ছিল না, পথ-প্রান্তর নানাপ্রকার বিঘ্নবিপদে পূর্ণ ছিল, তখন অনলোপম উৎসাহ লইয়া বিজয়কৃষ্ণ পদব্রজে কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলেন। যে সমস্ত স্থানে নদী খাল ইত্যাদি ছিল কেবল তথায় নৌকার সাহায্য লইতে হইয়াছিল। তিনি উৎসাহে মত্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মের প্রাণোন্মাদ-কারিণী বার্ত্তা প্রচার করিতে করিতে অনায়াসে সুদূর প্রদেশে গমন করিতেন। কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেন না। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারার্থে ভ্রমণ কালে একবার তাঁহাকে খাদ্যাভাবে কর্দ্দম ছাঁকিয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন;—"শরীরের এক এক বিন্দু রক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক ইহাই আমার প্রার্থনা" তাঁহার নিকট যে ঐ সমস্ত কষ্ট নিতান্ত তুচ্ছ ছিল ইহা বলা বাহুল্য।

"কেশবচন্দ্রের ময়মনসিংহে প্রচারের দুই বৎসর পরে বিজয়কৃষ্ণ ময়মনসিংহ গমন করেন। তথায় সমাজ গৃহে তাঁহার ৪।৫টি বক্তৃতা হয়। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ ও উপবীত ধারণের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁহার বক্তৃতায় সহরে খুব আন্দোলন উঠে। অনেকে তাঁহার সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করেন। তৎপর তিনি তথা হইতে সেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে সেরপুর গমন করেন। বস্ত্রাদির গাঁঠুরী কোমরে বাঁধিয়া একাকী ত্রিশ মাইল পথ হাঁটিয়া সেরপুর উপস্থিত হন। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সঙ্গে কোন লোক লইতে সম্মত হন নাই। তাঁহার এই

* পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশ।

দীনতা ও সহিষ্ণুতায় লোকের মনে বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। তিনি সেরপুর হইতে বগুড়া গমন করেন।" *

"তাঁহার ময়মনসিংহ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তথাকার বিজ্ঞাপনী পত্রিকার সম্পাদক জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ও ওভারসিয়ার গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপবীত ত্যাগ করেন। এবং প্রাচীনদল হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা করিয়া ব্রাহ্মদের নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে অনেকে প্রায়শ্চিত্ত করেন। উপবীত ত্যাগ ও প্রায়শ্চিত্ত এই সব লইয়া তখন খুবই আন্দোলন হইয়াছিল। এখন আর সে দিন নাই।"*

আমরা শুনিয়াছি ময়মনসিংহ ও সেরপুর বগুড়ার পথে এক জঙ্গলময় স্থানে বন্য মহিষদ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার জীবনসংশয় ঘটিয়াছিল। যে পথে এইরূপ বিপদ ঘটে তথায় তাঁহার সঙ্গে একটীমাত্র পথ-প্রদর্শক ছিল। চলিতে চলিতে তাঁহারা পথ ভুলিয়া বনপথে গিয়া পড়িলে দেখিতে পাইলেন, কিছু দূরে একটী বন্যমহিষ শিং নাড়িতে নাড়িতে অতি বেগে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। বিবেচনা করিবার অবসর তখন ছিল না। ইতিমধ্যে প্রবল বাতাসে কাশার বন সরিয়া যাওয়াতে, কুম্ভকারের খনিত একটী গর্ত্ত দেখিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। এদিকে মহিষ তথায় আসিয়া আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। শিকার হারাইয়া অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিল; এবং শিং, খুড় ও থোতা দিয়া অনেক মাটি খুঁড়িয়া ফেলিল ও পরে চলিয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় বিপন্মুক্ত হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

মহিষ চলিয়া গেলে তাঁহারা বাহির হইয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ

* গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আত্মচরিত হইতে সংগ্রহ।

করিলেন, এবং সন্ধ্যাকালে এক বাথানে * উপস্থিত হইলেন। বাথানের লোকেরা হিংস্র জন্তুর ভয়ে টঙ্গে থাকিত। তাহারা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া জলযোগ করাইয়া নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিল। গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—'এই ঘটনায় আমি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা দর্শন করিয়াছি ; এবং এ জন্য প্রতিদিন ইহা স্মরণ করি।' †

চট্টগ্রাম হইতে গোস্বামী মহাশয় ১৬ই মাঘ কুমিল্লা যাত্রা করেন ; এবং তথায় চৌদ্দ পনরদিন অবস্থান করিয়া মন্দিরে ও ব্রজসুন্দর বাবুর গৃহে উপাসনাদি করেন। এখানে যে কয়েক দিন ছিলেন তাঁহার বিশ্রাম ছিলনা। বক্তৃতা, উপাসনা, কি ধর্ম্ম প্রসঙ্গ একটা কিছু হইত। তাঁহার কথা এমনই ভাবপূর্ণ ছিল যে উহাতে শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করিত। তৎপর ৬ই ফাল্গুন কুমিল্লাহইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাত্রা করেন। তথায় চারি পাঁচ দিনে পরিত্রাণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, উপাসনা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা এবং নানা স্থানে উপাসনা হয়। এস্থানের একটী বৃদ্ধের দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে লিখিয়াছেন ঃ—"একটী বৃদ্ধ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমার বোধহয় প্রত্যেক স্থানের ব্রাহ্মগণ, যদি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের পূজা করেন, এবং আত্মদোষ দর্শনে কৃতযত্ন হন, তবে শীঘ্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়লাভ হইবে। ১৭৮৭ শক ১০ই ফাল্গুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া।"

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে তিনি পুনরায় বরিশাল গিয়া পঁচিশ ছাব্বিশ দিন অবস্থান করেন। সেখানে নানা পরিবারে ও ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা,

---

* পূর্ব্ববাঙ্গালায় গোচারণের নিকটস্থ উচ্চস্থান যেখানে গো মহিষাদি রাখা হয় তাহাকে বাথান বলে।

† এই ঘটনাটির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন।

আলোচনা এবং বক্তৃতা হয়। 'অনেকে কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া উন্নত আদর্শের অনুরূপ জীবন যাপনে ইচ্ছুক হন। এক দিন বক্তৃতান্তে লাখুটিয়ার জমিদার রাখালবাবু, ভাবে বিগলিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে, উপবীত ত্যাগের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন। তদ্দর্শনে তাঁহার ভ্রাতা বিহারী বাবু উপবীত ত্যাগ করেন ; এবং অনেকেই ক্রন্দন করেন। এই ঘটনায় বরিশালস্থ হিন্দুগণের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ঘরে ঘরে জাতিনাশের সম্ভাবনায় লোকের মনে মহা ত্রাস জন্মে।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় বরিশালে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত হয়। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়গণের চেষ্টাতে তথায় কোন পতিতা নারীর এবং কয়েকটী বিধবা মহিলার বিবাহ হয়। রাখাল বাবুর সহধর্ম্মিণী, গোস্বামীমহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছুক হওয়াতে, রাখালবাবু সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে আরও চার পাঁচটী পরিবার প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এই উপলক্ষে তিনি লিখিয়াছেন,—"এবার পূর্ব্ববাঙ্গালায় ব্রাহ্মদিগের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এ সংগ্রামে তাঁহাদের নিরস্ত্র থাকা উচিত নয়। প্রেম, ক্ষমা, সত্যপ্রিয়তা এই তিনটী অব্যর্থ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শত্রুকেও ভ্রাতৃভাবে অকৃত্রিম প্রেম করিতে হইবে, অন্যে প্রহার করিলেও হৃদয়ের সহিত ক্ষমা করিতে হইবে, সহস্র সহস্র লোক খড়্গ-হস্ত হইলেও শরীর পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, সত্যপ্রিয়তাকে রক্ষা করতঃ ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে, তবেই সংগ্রামে জয়লাভ হইবে।" অতঃপর তিনি বরিশাল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

এদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে ঢাকাতে শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহ জন্মিয়াছিল। তথাকার যুবকদের সঙ্গত সভার আলোচনায়

ও কীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় যোগ দেওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে নব উৎসাহ ও অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। আলোচনা ও প্রার্থনায় কখন কখন রাত্রি একটা বাজিয়া যাইত, তবু সময়ের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়িত না। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন মহাশয় বলিয়াছেন;—"সঙ্গতের সভ্যগণের প্রার্থনা আলোচনা ও সাপ্তাহিক লিপি পাঠে, সময় সময় ক্রন্দনের রোল পড়িত; চক্ষুর জলে পুস্তকের পাতা ভিজিয়া যাইত; এবং ব্যাকুল যুবকগণের অনুরাগ ও উচ্ছ্বাসে এক স্বর্গীয় ভাব অবতীর্ণ হইত। সে আলোচনার ফল আলোচনা মাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া, সঙ্গতের সভ্যগণকে নব নব সংকল্প গ্রহণে প্রবৃত্ত করিত।" ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত সভার পরিচালক এবং শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উহার উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় প্রবল উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্থিক অভাবের অভাব ছিল না। 'দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করা প্রচারকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য' এই বিশ্বাসে ঘোর অভাবের মধ্যেও তাঁহার উৎসাহ অবিচলিত ছিল। অর্থাভাব এতদূর যে পত্র লিখিবার পয়সাটী তাঁহার ছিল না। স্ত্রীর রোগে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন এরূপ উপায় ছিল না। লিখিতেছেন,—"পয়সার অনাটন বশতঃ আপনাকে (ব্রজসুন্দর বাবুকে) পত্র লিখিতে পারি নাই। এবার বেয়ারিং লিখিতে হইল। আমার স্ত্রীর শরীর অসুস্থ আছে। রীতিমত ঔষধ,পথ্য দিলে শীঘ্র সুস্থ হইতে পারিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য এইরূপে শরীর নাশও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। কেবল আমার নহে, প্রত্যেক প্রচারকের পরিবারেরই এইরূপ দুর্দ্দশা। মরুক সকলে শুষ্ককণ্ঠায় অনাহারে রোগবিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যই প্রাণত্যাগ করুক; তবু যেন কেহ

ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে বিরত না হন, এই আমার আন্তরিক বাসনা।” ১৭৮৮শক ৫ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা। *

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নব্যদল কিছুদিন এই প্রকার দারুণ দুরবস্থায় যাপন করেন। তখন প্রাচীন সংস্কারাপন্ন হিন্দুগণ তাঁহাদের বিরোধী, আবার সুসংস্কৃত প্রাচীন ব্রাহ্মগণও তাঁহাদের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং সংসারের আশ্রয় অভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে পরমেশ্বরের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল। গোস্বামীমহাশয় ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিয়াছিলেন—“অনাথনাথ ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের দাঁড়াবার স্থান নাই। ক্রমে ক্রমে সকল বন্ধু বান্ধবই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কোন দিন শরীরও ত্যাগ করিবে; ঈশ্বরে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস হউক যিনি দুঃখাদিগের বন্ধু।” †

‘তখন তাঁহাদের এরূপ অবস্থা যে, কুলায়-হীন পক্ষী অথবা গৃহ-হীন দরিদ্রের ন্যায় তাঁহাদিগকে কত সময় পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইত। প্রতি রবিবার বন্ধুগণ একত্র হইয়া উপাসনা করিবেন এরূপ স্থানও তাঁহাদের ছিল না। ৩০০ নং চিৎপুর রোডস্থ ভবন তাঁহাদিগের একমাত্র প্রকাশ্য স্থান ছিল। এখানেই তাঁহারা বন্ধুগণসহ উপাসনা করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন প্রচার আশ্রমে বাস করিতেন, তখন একরূপ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার উপজীবিকার অর্থ সংগৃহীত হইত। কিন্তু তবু ধর্ম্মোৎসাহে সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা হইতে বিমুক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব দর্শনে অনেকের উৎসাহানল এমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে ক্রমে আরও কতিপয় ব্যক্তি চাকুরী ছাড়িয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেন। ‘কলিকাতা এই সময় ধর্ম্ম প্রচারের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র ছিল। প্রচারকগণের

* ৺ ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

† আচার্য্য কেশবচন্দ্র এবং নানা স্থান হইতে সংগৃহীত।

মধ্যে দিবানিশি সৎপ্রসঙ্গ সদালাপ ও সৎকার্য্যানুষ্ঠান হইত; এবং ধর্ম্মের অগ্নি দিবানিশি জ্বলিতে থাকিত। বৈরাগ্য, অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব জ্বলন্তরূপে প্রকাশ পাইত। এই সময় সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ দানের উপর নির্ভর করিতেন। ইঁহারা কয়েকজন বন্ধুর সহিত একত্র রাধানাথ মল্লিকের গলির ভিতর একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। এই বাসাটী ব্রাহ্মদিগের মধ্যবিন্দুস্থান ছিল। বিদেশহইতে কোন ব্রাহ্ম আসিলে এই স্থানেই আশ্রয় লইতেন।' *

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন:—"আমি তখন কৃষ্ণনগরে বাস করিতাম। সময় সময় কলিকাতা আসিলে আমার অন্য কোন বন্ধুর গৃহে না গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটই যাইতাম। তাঁহার সঙ্গে এমন প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, এবং তিনি আমাকে এত অধিক ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার গৃহের তেঁতুলগোলা ভাত আমার নিকট অমৃতের ন্যায় বোধ হইত। তাঁহাদের অবস্থা তখন এরূপ যে অনেক সময় তরকারী জুটিত না, তেঁতুল গুলিয়া তদ্দ্বারা তরকারী ও ব্যঞ্জনের অভাব পূর্ণ করিতেন; এবং পরমানন্দে আহার হইত"।

সময় সময় তাঁহাদের আবাস স্থানে এত জনতা হইত যে, উপরের একটী ঘরে স্ত্রীলোকেরা বাস করিতেন এবং অপর ঘরগুলি পুরুষদিগের দ্বারা অধিকৃত হইত। ইঁহারা প্রায় অধিকাংশ সময় কেশবচন্দ্রের গৃহে তাঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে ও ধর্ম্মালাপে যাপন করিতেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধুচক্র; তাঁহারা মৌমাছিদলের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। সময় সময় রাত্রি দুই তিনটা পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইত। প্রায়ই রজনীর শেষভাগে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও নানা স্থান হইতে সংগ্রহ।

প্রতিদিনের আহার্য্য সামগ্রী প্রায়ই কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকিত না। আশ্রমস্থ মহিলারা অনেক সময় অপেক্ষা করিয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন। অনেক সময় অনাহারেই রজনী অতিবাহিত হইত। ভাত জুটিলেও কত সময় কেবল নুন ভাতই অমৃতের স্থান অধিকার করিত।

গোস্বামী মহাশয় বলিতেন, ক্ষুধাই খাদ্যের উপকরণ। ক্ষুধার সময় যাহা খাওয়া যায় তাহাই উপাদেয় বোধ হয়। অঘোর ও বিজয়কৃষ্ণ শুধু তেঁতুল সিদ্ধ ভাতই প্রচুর খাইয়া ফেলিতেন।

কেবল রজনীতে নয়, কত সময় দিবসেও আহারের সংস্থান হইত না। একে অনাহারে ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেন, তদুপরি সময় সময় দারিদ্র্যক্লেশে জর্জ্জরিত পরিবারদিগের অভিসম্পাতে তাঁহাদিগকে আরও ক্লেশ পাইতে হইত। তখন অল্প কয়েককজন চাঁদাদাতা ছিলেন। তন্মধ্যে আনন্দমোহন বসু মহাশয় প্রধান ছিলেন। সময় সময় দুই তিন জন প্রচারক দলবদ্ধ হইয়া প্রাতে দাতার গৃহে গমন করিয়া, বিশেষ অভাবের কথা বলিয়া তাঁহার দেয় চারি আনা কি আট আনা অগ্রিম ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। অনেক সময় কাঁটানটে শাক যাহা প্রাঙ্গনে বহুল পরিমাণে ছিল তাহার ব্যঞ্জন হইত। অনেক সময় অন্নের কোন উপকরণ সংগৃহীত না হওয়ায় হলুদ মিশাইয়া খেচরান্ন করা হইত, এবং প্রাঙ্গনস্থ দোপাটি ফল ভাজিয়া লওয়া হইত। *

গোস্বামী মহাশয়ের অর্থাভাব ও ক্লেশ সম্বন্ধে ৺মাতঙ্গিনী মজুমদার বলিয়াছেন ;—তাঁহাদের যে কত দিন অনাহারে গিয়াছে তাহার কোন হিসাব নাই। কত সময় এমন হইয়াছে যে, দিবস রজনী কাটিয়া গিয়াছে তবু আহার হয় নাই। শীতকালে শীতবস্ত্রাভাবে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন ; কিন্তু তবু কাহারও নিকট প্রার্থী হন নাই। তাঁহার শাশুড়ী

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

কত সময় পাতকূয়ার জল পান করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেন। এক দিন খাবার কিছুই নাই, গোস্বামী মহাশয় একখানা উর্ণি গায়ে গৃহহইতে বাহির হইয়া সমস্ত দিন গোলদীঘীর ধারে প্রার্থনা করিয়া কাটাইলেন; এবং সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিয়া নিঃশব্দে শুইয়া রহিলেন। অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার শাশুড়ী, স্ত্রীও গিয়া শুইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —'আজ কি ব্যবস্থা হইয়াছে ?' গোস্বামী মহাশয় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—'প্রতিদিনই ঈশ্বর চালাইয়া থাকেন কিন্তু অদ্য আমরা চালাইতে চাহিয়াছিলাম, তাই——। বন্ধুবর যদুবাবু ব্যাপার বুঝিয়া পকেটে হাত দিলেন, কিন্তু তাঁহার পকেটে দেড়পয়সা মাত্র ছিল। উহা দিয়া মুড়ি আনা হইল এবং তদ্দ্বারা তিন জনের আহার হইল।

যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য এই সকল ক্লেশ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারেন, ধর্ম্ম তাঁহাদের উপর অবশ্যই প্রসন্ন হন। গোস্বামী মহাশয় এই সমস্ত ক্লেশকে বৈরাগ্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষারই সহায় মনে করিতেন। শিষ্যগণের সহায়তায় জীবন ধারণ অপেক্ষা, চিকিৎসাদ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ অপেক্ষা, বৈরাগ্যের জীবন, ধর্ম্মানুশীলনের জীবন তাঁহার নিকট শ্রেয় বিবেচিত হওয়াতেই তিনি এইরূপ নিষ্পেষণের জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দিকে এইরূপ ক্লেশরাশি অপর দিকে দায়িত্বপূর্ণ কাজেরও অন্ত ছিল না;—ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবন্ধ লেখা, ব্রাহ্মিকাদিগের শিক্ষাদান, বক্তৃতা, ধর্ম্মসাধন সর্ব্বদা চলিতেছিল। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁহার মুখে উৎসাহের উদ্দীপনা ও জীবন্ত ভাব বিরাজ করিত।

প্রাচীন ও নবীন দলের মতভেদ ঘনীভূত হইলে ১৭৮৮ শকের ২৬শে কার্ত্তিক নবীনব্রাহ্মদলের উদ্যোগে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। তখন সর্ব্বজনমান্য কেশবচন্দ্র উক্ত দলের অগ্রণী, আর বিজয়কৃষ্ণ

তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইলেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইলে গোস্বামীমহাশয়ের উপর পূর্ব্ববঙ্গে—ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভার পড়িল। তাঁহার ঢাকার কার্য্যের আভাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এখন তথায় পুনরায় তাঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা, উপদেশ ও দৃষ্টান্তে অনেক ব্যক্তি উপবীত ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সংস্কারের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঢাকার অবস্থা সম্বন্ধে তৎকালে এইরূপ লিখিত হইয়াছিলঃ—"প্রচারক আগমনের পূর্ব্বে এই স্থানের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। প্রচারক আগমনের অল্পদিনমধ্যে যথেষ্ট উন্নতি হইল। অনেক কৃতবিদ্য যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অনেকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন, অনেকের ধোপা নাপিত বন্ধ হওয়ায় বিষম কষ্টে নিপতিত হইলেন। কেবল যে ঢাকাতেই এইরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ও উপাসনায় পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেক স্থানেই এইরূপ সংস্কার ও ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল।"

ঢাকা অবস্থানকালে তিনি ময়মনসিংহে যে ভাবে প্রচার করেন তাহা উদ্ধৃত কা

"১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে অগ্নি প্রধূমিত রাখিয়া যান, ১৮৬৭ সালের প্রথম ভাগে মহাতেজস্বী প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ এখানে আসিয়া সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় যেন অগ্নি-বৃষ্টি হইত, উহাতে মৃত দেহে নব-চেতনার সঞ্চার হইত। স্থানীয় বিজ্ঞাপনী নামক সংবাদপত্রিকায় তাঁহার প্রচার কার্য্যের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি নগরের নানাস্থানে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতার শ্রুতিসুখ উৎপাদন করিয়া বিরত হইত না, হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিত। সত্য সত্যই বিজয়কৃষ্ণের বিজয়-ভেরীতে নগর

কম্পিত হইতে লাগিল। বাবু ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, জমিদার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞাপনী সম্পাদক জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়, গোবিন্দচন্দ্র গুহ, গোপীকৃষ্ণ সেন, গিরিশচন্দ্র সেন এবং দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত প্রভৃতি উৎসাহী ব্যক্তিগণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আহারাদি করিয়া প্রকাশ্যে মিলিত হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানে হিন্দুসমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। যাঁহারা প্রকাশ্যে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, উপবীত পরিত্যাগ করিয়া জাতিভেদের প্রতি কঠোর আঘাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপরে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। বিজয় বাবু যাইতে না যাইতে দুর্গাবাড়ীতে হিন্দুসভা বসিল, ব্রাহ্মদিগকে শাসন করিবার বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইল। জেলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিত পার্ব্বতীচন্দ্র তর্করত্ন এই আন্দোলনের নেতা হইলেন। বিজয় বাবু ১১ই ফাল্গুন পবিত্রতা বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন; তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক মহা বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে মনে করিয়া ১৩ই ফাল্গুন দুর্গাবাড়ীতে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। উদীয়মান ব্রাহ্মদিগকে শাসন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেরূপ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য আর কত দিন থাকিবে? পরে ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সময়ে এই সভার নাম হিন্দুধর্ম্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা হয়। পরবর্ত্তী সময়ে এই সভা দ্বারা হিন্দুসমাজের অনেক কল্যাণ হইয়াছে।

দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মগণ অনেকেই সে পরীক্ষার অগ্নিতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কয়েক দিন পরেই রামচন্দ্র বাবু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন; অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করা অস্বীকার করিলেন। ঢাকাপ্রকাশে তাঁহাদের নাম বাহির হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনীতে অগ্নিহোত্রী

মহাশয় লিখিলেন,—"গোলযোগের মধ্যে আমরাও জিহ্বা পরম্পরায় আরূঢ় হইয়াছি, আমাদিগকে কেহ নিরুপবীত দেখেন নাই।"

রামচন্দ্র শর্ম্মা, কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ, জগদানন্দ সেন, কমলাপ্রসন্ন বল, অন্নদাপ্রসাদ দাস ও গোবিন্দচন্দ্র বসু স্বাক্ষরিত আর একখানি পত্র বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশিত হইল। উহাতে স্বাক্ষরকারীগণ বিজয় বাবুর সহিত আহারাদি করেন নাই বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশিষ্ট ব্রাহ্মগণ সমাজ-ভয়ে ভীত হইলেন। সমাজের প্রাণস্বরূপ ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস পাবনা জেলাস্কুলে বদলী হইয়া গেলেন। গোপাল বাবুও স্থানান্তরিত হইলেন। পারিবারিক নিপীড়ন ও সামাজিক শাসনের ভয়ে বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়, গোবিন্দচন্দ্র গুহ এবং গোপীকৃষ্ণ সেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

ময়মনসিংহের এই দুর্দ্দিনে, ব্রাহ্মসমাজের প্রিয় সেবক গোস্বামী মহাশয় স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় এখানে আগমন করিলেন। কালেক্টরীর সেরেস্তাদার রামকৃষ্ণ মুন্সি হিন্দুসমাজের প্রধান রক্ষক ও অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। গোপীবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় যখন ময়মনসিংহ স্কুলে পাঠ করেন, তখন তিনি রামকৃষ্ণ মুন্সি মহাশয়ের বাসায় থাকিতেন। তদবধি গোপীবাবুর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ প্রীতি ছিল। তাঁহার প্রভাবেই গোপীবাবুর জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটে। যখন বিজয় বাবু দ্বিতীয় বার আগমন করিলেন, তখন রামকৃষ্ণ মুন্সি পেনশন লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। গোপীবাবু কালেক্টরীর খাদাঞ্চি হইয়া পৈত্রিক বাসায় অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দুসমাজের প্রধান ব্যক্তি রামকৃষ্ণ মুন্সির বাসা বাড়ীর সুবিস্তৃত আঙ্গিনায় চন্দ্রাতপতলে শান্তিপুরের গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ "শান্তি" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই বক্তৃতার সুখ্যাতি প্রাচীনদের মুখে আজও শুনিতে পাওয়া যায়। এই বক্তৃতার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি ব্রাহ্মদের জীবনে নবশক্তি প্রদান করিল।

অনেকে ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন সমস্ত বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া চিরদিনের তরে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।" *

প্রচারক ৺গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্মময়ী চরিতে লিখিয়াছেন— "মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমার ন্যায় পতিত সন্তানকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন। তখন আমি তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া জীবন্ত ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া নিজের পাপ ও অভাব অনেক বুঝিতে পারিলাম ও তাহা মোচন করিয়া আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিতে যত্নবান হইলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি উপাসনাতে প্রায় কিছুই মনোযোগ করিতাম না। এইক্ষণ উপাসনা ব্যতীত পাপী বাঁচিতে পারে না বুঝিতে পারিলাম।

বিজয়কৃষ্ণের হৃদয় আর্দ্রকারিণী ও ওজস্বিনী বক্তৃতা অনেক ভ্রাতার চিত্তকে ধর্ম্মের জন্য পিপাসিত ও সত্যের জন্য লালায়িত করিয়াছিল। কপট ভাবে, শুষ্কভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করা যায় না বলিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর অন্তঃকরণে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন অনেক ব্রাহ্মবন্ধু ধর্ম্মকে জীবনের প্রিয় সামগ্রী করিবার জন্য অনেক প্রকার ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী প্রাচীন হিন্দুসমাজ ক্রুদ্ধ ও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া মহা আড়ম্বরে এক সভা স্থাপন পূর্ব্বক কতিপয় ব্রাহ্মকে হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পর প্রচারকগণ পরিবার কল্য কি

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের রচিত "ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশবৎসর" হইতে সংগৃহ।

খাইবে ঠিক নাই, অথচ সকলে প্রবল উৎসাহে চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ঈশা বলিয়াছেন—‘কল্যকার জন্য ভাবিও না।’ আর এই প্রচারকগণ অদ্যকার জন্যও ভাবিলেন না। দরিদ্রতার একশেষ। প্রচারকদিগের কষ্ট-সহিষ্ণুতার কথা স্মরণ করিলে হৃদয় আপনা হইতে তাঁহাদিগকে শত ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহারা দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিয়াও যেরূপ প্রফুল্লচিত্তে প্রচার-ব্রত পালনে রত ছিলেন তাহা স্মরণ করিলে কে না তাঁহাদের প্রকৃত মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন? কি আশ্চর্য্য তাঁহাদের প্রচারোৎসাহ।” *

একবার গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহযোগী ভ্রাতা সাধু অঘোরনাথ এবং বন্ধু যদুবাবুকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে বরিশাল গমন করেন। বরিশালস্থ দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সহায়তায় তথায় তাঁহাদের কার্য্য প্রবল উৎসাহে আরম্ভ হয়। দুর্গামোহন বাবু সস্ত্রীক এই প্রচারক পরিবারবর্গকে যেরূপ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের কার্য্যের সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেরূপ অতি অল্প লোকেই করিতে পারে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—“দুর্গামোহন বাবুর ভৃত্যগণ কখনও এই প্রচারক পরিবারের কার্য্যে অমনোযোগ প্রকাশ করিলে দুর্গামোহন বাবু স্বয়ং তাঁহাদের এমন সকল কার্য্য স্বহস্তে করিয়া দিতেন যাহাতে ভৃত্যেরা লজ্জিত হইত; এবং তাঁহাদিগকে বাবুর গুরুঠাকুর মনে করিয়া অবশেষে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া তাঁহাদের কার্য্যাদি করিত।”

বরিশালে তাঁহাদের চেষ্টায় রাখাল বাবুর গৃহের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। শুনিয়াছি বরিশালে অবস্থান কালে তথাকার লোকের ধর্ম্মহীনতায় ব্যথিত হইয়া গোঁসাই একবার নদীতে

* তত্ত্বকৌমুদী ১৮১০ শক, ১লা আষাঢ়।

ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় এমনই কারুণ্য-পূর্ণ ছিল। একদিন দুর্গামোহন বাবু তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় পথের একটী দুঃখী লোককে শীতে কাতর দেখিয়া উহা দান করেন। দাস মহাশয় আর একখানি কিনিয়া দিলেন। দ্বিতীয় বস্ত্রখানিও ঐরূপে বিতরিত হইল। তখন দাস মহাশয় একখানি মোটা কাপড় কিনিয়া দিলেন। *

কোন সময় তাঁহারা বন্ধু বান্ধব মিলিত হইয়া আমদিয়া, পাঁচদোনা, কালিকচ্ছ প্রভৃতি গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। কালিকচ্ছের বিখ্যাত আনন্দচন্দ্র নন্দী ও কৈলাশচন্দ্র নন্দী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের আহ্বানে গোঁসাই সপরিবারে তথায় গমন করেন। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবনমোহন সেন প্রভৃতি অনেকে সঙ্গে ছিলেন। নন্দী-পরিবার বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত। আনন্দ নন্দী মহাশয়ের মাতা বড় বিরোধী ছিলেন। প্রত্যুষে পুত্রগণের উদ্যোগে চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্মগণের উপাসনা আরম্ভ হইলে মাতা কৌশলে কৈলাশ নন্দীকে অন্দরে ডাকিয়া আনিয়া গৃহে আবদ্ধ করেন ও উপাসনায় নিরত ব্রাহ্মগণের প্রতি অত্যাচারের আদেশ দেন। গ্রামের লোক কেহ ঢিল ছুড়িল, কেহ বা উপাসকগণের কর্ণ মর্দ্দনের আয়োজন করিল। গৃহে আবদ্ধ কৈলাশ নন্দী মহাশয় ব্যাপার বুঝিয়া চীৎকার করিয়া আত্মহত্যার ভয় দেখাইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তখন কৈলাশ বাবু ব্রাহ্মগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন ও পুনরায় প্রবল উৎসাহ জন্মিল। গোঁসাইর প্রাণস্পর্শী উপাসনায় বিরোধীদেরও হৃদয় দ্রব হইল। তদবধি নন্দীপরিবার দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। গোস্বামী মহাশয়ের উচ্ছ্বাসময়ী

* নব্যভারত ১৩০৬।

বক্তৃতা, হৃদয়স্পর্শিনী উপাসনা ও উপদেশে সে সময় এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই সময়ের উপদেশের প্রধান ভাব ছিল ঃ—"পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব ত্যাগ কর, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা কর, জাতিভেদ পরিহার পূর্ব্বক মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন কর, নিয়ত প্রার্থনা কর, সৎকার্য্য কর, সকল প্রকার পাপ, হীনতা পরিহার কর।"

তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অঘোরনাথের জীবনীতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—"প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, মধ্যাহ্ন-রবিতাপে মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ হইয়াছে, গাত্রে ঘর্ম্ম ছুটিতেছে, অথচ দুস্তর প্রান্তর, অলঙ্ঘ্য গিরি, পর্ব্বত, নদী, কানন অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে অবিশ্রান্তবেগে চলিতেছেন। উদরে অন্ন নাই, মস্তকে আতপত্র নাই, চরণে ছিন্ন পাদুকা, অঙ্গে মলিন বসন হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, আর ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছেন। কিন্তু কোথায় যাইতেছেন? এ হেন যৌবন-কালে, সংসারের সুখবিলাস লজ্জাসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া এত কষ্ট করিয়া কেন পথ হাঁটিতেছেন? দুর্নিবার অন্নচিন্তায় অধীর হইয়া কি দেশে দেশে এইরূপে ঘুরিতেছেন? না, তাহা নহে। অথচ বেতনভুক্ বিষয়ীর বিষয় কর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার এ কার্য্যে অধিক অনুরাগ। কাহারও অধীন নহেন, এক কপর্দ্দক কাহারও নিকট প্রত্যাশাও করেন না, অথচ দাস্য-কার্য্যে একান্ত নিরলস। তবে কিসের জন্য এত আগ্রহ, ব্যাকুলতা? এইজন্য যে ভারতের সীমা হইতে সীমান্তরবাসী নরনারীকে স্বর্গের শুভ সমাচার শুনাইয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন, জগতে সত্যের জয় ঘোষণা করিবেন। সংসারের চতুর্দ্দিকের অবস্থার সঙ্গে যখন ইহা মিলাইয়া দেখা যায় তখন সংসারে স্বর্গের আভাস অনুভব হয়!"

অঘোরনাথ এবং তাঁহার বন্ধু বিজয়কৃষ্ণএই সংকল্পই গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে একত্র ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এবং কার্য্যতঃও তাহাই করিয়াছেন।

একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বক্তৃতা কালে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রচার ক্ষেত্রে গোস্বামী মহাশয়ের ক্লেশ স্বীকারের কথা অর্থাৎ কাঁটানটে সিদ্ধ এবং দোপাটী ফুলের সড়সড়ি খাইয়া জীবনধারণ ও কর্দ্দমাক্ত সলিল পান করিয়া ক্ষুধা নিবারণের কথা বলিতেছিলেন। শুনিয়া শ্রোতৃগণের এরূপ বিস্ময় জন্মিয়াছিল যে বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিয়া শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয় ইহা কি সত্য ?" বক্তা উত্তর করিলেন,—"হাঁ নিশ্চয় সত্য।" * ঐরূপ ক্লেশ স্বীকারের বিবরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর বটে। কিন্তু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মের জন্য ক্লেশকর কিছুই ছিল না।

গোস্বামী মহাশয় প্রচারক্ষেত্রে একবার একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় পদ্মা পার হইতে গিয়া জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ স্রোতোবেগে দূরে নীত হইতেছিল। কিন্তু ইহাতে অল্পক্ষণ মধ্যেই শরীর অবসন্ন এবং শ্বাসরুদ্ধ হইয়া চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল; জীবনের কোন আশা রহিল না। ভাবিলেন একবার শেষ চেষ্টা করি, যদি জলের উপর মাথা তুলিতে পারি তবে রক্ষা হইবে, নতুবা আর উপায় নাই। এই ভাবিয়া মাথা তুলিতেই পায়ে মাটি পাইলেন। কারণ সেখানে চড়া ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় নদীতে ডুবিয়াও বাঁচিয়া গেলেন।

এক বার প্রচারার্থে শিবসাগর গিয়াছিলেন। ষ্টীমারে পাঁচ ছয় দিন কাটাইয়া তাঁহার হস্ত কপর্দ্দকশূন্য হইল। ক্ষুধার যন্ত্রণায়

* তত্ত্বকৌমুদী ১৮১০শক ১লা আষাঢ়

অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তবু কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইলেন না। সম্মুখস্থ লোকেরা আহার ও আমোদ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল, কেহ তাঁহার মুখের দিকেও চাহিল না। অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে একটী ষ্টেসনে নামিয়া নদীর পলিময় জল দুইহাতে তুলিয়া পান করিলেন।

এই প্রকার কাহিনীতে তাঁহার জীবন পূর্ণ। এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, অটল নির্ভর, এবং অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ধন্য ব্রাহ্মসমাজ যে এইরূপ অকপট সাধুর সেবা পাইয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবীন ব্রাহ্মদলের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজে বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, শ্রাদ্ধাদি পারিবারিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হওয়াতে প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। দুই দলের মধ্যে নানা মতভেদ ঘটিয়া কোন কোন স্থলে এতদূর মনোমালিন্য জন্মিয়াছে যে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগসমূহ উত্থাপন করিতেছেন; অথবা অপ্রণয় বশতঃ অভিযোগের কারণ অনুসন্ধানে তাঁহাদের তেমন দৃষ্টি নাই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রাচীন দলের সংস্কার বিরোধী ভাবের ঘোর প্রতিবাদকারী হইয়াও অপ্রণয় হইতে নিজকে দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বাদ প্রতিবাদের ফল—অসহিষ্ণুতা,

অপ্রেম, ক্রমে আরও বিস্তৃত হইলে, এবং সরসভাবের পরিবর্ত্তে শুষ্কতার গাঢ় কৃষ্ণচ্ছায়া সকলের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে কোন মানুষেরই উঁহার প্রভাবের মধ্যে বাস করিয়াও উহা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত থাকা সম্ভব নয়।

গোস্বামী মহাশয় ধর্ম্মজীবনের প্রতিকূল ঐ সমস্ত ভাব হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, 'অসহিষ্ণুতা, জিগীষা, মনকে উত্তেজনাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।' এজন্য ছটফট করিয়া কলিকাতা ছাড়িলেন, শান্তিপুর গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অভিপ্রায় এই—'শান্তিপুরের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া পুনরায় চিত্ত শান্ত হইবে, সদ্ভাবসমূহ মনকে অধিকার করিবে।' তিনি বসন্তকালের জ্যোৎস্না রজনীতে শান্তিপুরের ঘাটে বসিয়া বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেন, আর মনে করিতেন—'হায় দয়াময় ঈশ্বর যে হস্তে এই সমস্ত শোভার আধার প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নরাধমকেও সেই হস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টিকাল অবধি প্রকৃতির শোভা একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের শোভা কে হরণ করিল?' এইরূপ চিন্তা হইতে তাঁহার মনে অত্যন্ত ব্যাকুলতা জন্মিল। কিছুই আর ভাল লাগে না। অবশেষে একদিন শান্তিপুর নিবাসী ৺হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের নিকট গিয়া মনের অবস্থা জানাইলেন। তিনি একজন ভক্ত বৈষ্ণব, তিনি তাঁহাকে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার মধুর ও কোমল বাক্য যেন গোস্বামী মহাশয়ের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিল; এবং উক্ত গ্রন্থে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের বিনয়, ভক্তি ও ব্যাকুলতার জীবন্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রখর আত্মদৃষ্টি জন্মিল। 'জীবে দয়া নামে ভক্তির তত্ত্ব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বাহিরের ধর্ম্মানুষ্ঠান যে পরলোকের সম্বল নয়, কেবল দয়াময়ের অভয় চরণই সম্বল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল'; এবং

তৎসঙ্গে 'অসহনীয় অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হওয়াতে' ধর্ম্মসাধনে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা জন্মিল। আর সেই নিষ্ঠার ফলে হৃদয়মধ্যে দিন দিন নিত্য নূতন অমৃতের খনি দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় এক দিন তিনি তাঁহার বন্ধু নীলকমল দেবের সঙ্গে নবদ্বীপে চৈতন্যদাস বাবাজির নিকট গমন করেন, এবং তাঁহাকে ভক্তি লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ভক্তি বিষয়ক প্রশ্ন শুনিয়া বাবাজি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—ভক্তি! ভক্তি!! ভক্তি যে তোমার ঘরের জিনিষ। আজ তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ ভক্তি কি করিয়া হয়? তখন 'বাবাজীর এতদূর প্রেমোচ্ছ্বাস হইয়াছিল যে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া মস্তকের টিকি খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"যদি প্রেম ভক্তি লাভ করিতে চাও, তবে দীনহীন অকিঞ্চন হও; অন্তরে এক বিন্দু অহঙ্কার থাকিলেও ভক্তিলাভ হইবে না। জলস্রোত যেমন ঊর্দ্ধগামী হয় না, ভক্তিও তদ্রূপ অহঙ্কৃত মনে উদিত হয় না।" *

তিনি শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ গমনপথে একরাত্রি কৃষ্ণনগরে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে বাস করেন। গোঁসাই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"আমি চৈতন্যদাস বাবাজির ভক্তি উপদেশে কৃতার্থ হইয়াছি। বাবাজি আমাকে কিছু আহার করিতে দিয়াছিলেন। আমি আহার করিলে পাতে যাহা অবশিষ্ট ছিল বাবাজিকে তাহা ভক্তির সহিত আহার করিতে দেখিয়া আমি নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলাম—"আপনি আমার পাতের দ্রব্য খাবেন না, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছি।" তিনি উত্তর করিলেন "তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হও, আর যেই হও অদ্বৈত বংশে ত জন্মেছ, তোমার প্রসাদ আমি খাব না? নিশ্চয়ই খাব।" এই বলিয়া আমার

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়

পাতের দ্রব্যই খাইলেন। আমি তাঁহার মুখে ভক্তি উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" *

চৈতন্যদাস বাবাজির উপদেশ শ্রবণে ও প্রেমোচ্ছ্বাস দর্শনে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত দ্রব হইল। তৎপর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ভক্তি লাভের অমৃত কথা † পড়িয়া তাঁহার মনে দীনতা ও ভক্তিলাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।

এই সময় এক দিন পূর্ণিমার রজনীতে নির্জ্জন গঙ্গাতীরে বসিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিরক্ষণ করিতে করিতে সহসা ভাবসাগরে ডুবিয়া গেলেন। তখন রাত্রি অধিক, প্রকৃতিদেবী বৃক্ষ লতাদিগকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া নিজে নিস্তব্ধ ভাবে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছিলেন। বিমল জ্যোৎস্না তাঁহাকে আলোক প্রদান করিতেছিল, এবং নদীবক্ষে ক্রীড়াবিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিল। মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোল তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছিল। কোন কোন বিহঙ্গম মধ্যে মধ্যে মধুর ধ্বনিতে প্রতিহারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিল। প্রকৃতিদেবীর সেই নিস্তব্ধ বিশ্রাম-মন্দিরে উপবেশন করিয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ নিমীলিত নেত্রে পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টভাবে বহুক্ষণ বসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অনুভব করিলেন যে "ভক্তি ও প্রেম বিনা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই; কিন্তু মানুষ তুচ্ছভাব লইয়া মানুষকে ঘৃণা করিতেছে।" যখন এই প্রেম-ভক্তির ভাবসাগরে তিনি মগ্ন হইয়াছিলেন, তখন রাত্রি প্রায় অবসান হইয়াছে। শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জগজ্জননীর নিকট হইতে তিনি প্রেমভক্তির এই উচ্চভাব প্রাপ্ত হইলেন। এবং পরে তাঁহার হৃদয়ের বন্ধুদিগকে এই প্রাণের কথা বলিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

† ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে,
মম,জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহেতুকী ত্বয়ি।"

এ দিকে কলিকাতার ব্রাহ্মগণ শুষ্কতার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া কি উপায়ে ঐ শুষ্কতা দূর হইতে পারে তদুপায় নির্দ্ধারণে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান অন্তর্দ্দর্শী, তিনি মানবের মনে দীনতা দেখিলে এবং কাতরভাবে মানুষকে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে দেখিলে স্থির থাকিতে পারেন না। কলিকাতাস্থ নবীন ব্রাহ্মদলের ম্লানভাব এবং তাহাদের ব্যাকুলতায় অচিরে তাঁহার প্রকাশ হইল।

নবীন ব্রাহ্মদল ১২৭৪ সনের ভাদ্রমাস হইতে নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, এবং উপাসনার সূক্ষ্মভাব অবগত হইবার জন্য শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রতি বুধবার অপরাহ্ণে মিলিত হইয়া তাঁহার জীবনের পরীক্ষিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপায়ে তাঁহাদের মধ্যে সরসভাবের উদয় হইল। তাঁহারা প্রথম দিন মহর্ষিকে ব্রহ্মদর্শনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবাক হইয়া বলিয়াছিলেন—"কি! তোমরা ব্রহ্মদর্শন কর নাই? ব্রহ্মদর্শন না করিয়া ব্রাহ্ম হইলে কিরূপে?"

গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া কলিকাতার ব্রাহ্মগণকে বিশেষ সাধন ভজনে প্রবৃত্ত দেখিলেন। তখন প্রতিদিন এমন জীবন্ত উপাসনা হইত যে তাহা ত্যাগ করিয়া কেহ শীঘ্র বাসায় আসিতে পারিতেন না। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' ইত্যাদি স্বরূপগুলি উচ্চারণ করিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হইতেন না, ধ্যান ও চিন্তাযোগে স্বরূপগুলি উপলব্ধি করিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুকূল উপদেশে এই পিপাসা-কাতর সাধকবৃন্দের পিপাসার আরও বৃদ্ধি হইল। একদিন মহর্ষি বলিলেন—"তোমাদিগকে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে ঈশ্বর দর্শন না হইলে পান ভোজন করিব না।" এইরূপ উপদেশে অনেকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া

ধ্যান, আরাধনা ও প্রার্থনায় যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এতদূর বৈরাগ্য জন্মিল যে তাহা দেখিয়া কেহ কেহ ত্রাসযুক্ত হইলেন।

এই সময় একদিন গোস্বামী মহাশয়ের অগ্রজ ব্রজগোপাল গোস্বামী কনিষ্ঠের কলিকাতাস্থ বাসায় আসিয়া "কানুপরশমণি" * কীর্ত্তন করিলেন। ঐ সংকীর্ত্তন শুনিয়া ভক্তিপিপাসু গোস্বামী মহাশয়ের ভক্তি উথলিয়া উঠিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন হয়, এই অভিপ্রায়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র পূর্ব্বেই একটা খোল আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাবে প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি দিলেন। শুভমুহূর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন প্রচলিত হইল। কেশবচন্দ্রের অনুমতি লইয়া গোস্বামী মহাশয় দুইটী হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীত রচনা করিলেন। ১২৭৪ সনের ২৩শে আশ্বিন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইল। ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির উৎস খুলিয়া গিয়া, দলে দলে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা কীর্ত্তনের মহাভাবে মত্তহইয়া উঠিলেন। কিন্তু অপরদিকে কীর্ত্তনের বিরোধীগণ তাঁহাদিগকে নেড়ারদল বলিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। গোস্বামীমহাশয়ের প্রথম রচিত কীর্ত্তন দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১

"পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই, পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিত পাবন পিতা ভকত বৎসল, উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার পাথারে, পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব করনা আর ভুলিয়ে মায়ায়, ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে।"

* বৈষ্ণব সংকীর্ত্তন।

২

"পতিতপাবন ভকত-জীবন অখিলতারণ বলরে সবাই।
বল্‌রে বল্‌রে বল্‌রে সবাই। যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে।
যাঁরে ডাক্‌লে পাপী তরে যাবে। ওরে এমন নাম আর পাবি নারে।"

উক্ত সংকীর্ত্তন শ্রবণে উপাসকগণের প্রাণে কি প্রকার ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহাদের সম্মুখে যেন এক নূতন রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। ভালরূপে খোল বাজাইতে এবং কীর্ত্তন করিতে সমর্থ তখন এরূপ লোকের নিতান্ত অভাব ছিল। কিন্তু ভাবের উদয়ে ক্রমে সকল অভাব পূর্ণ হইল; এবং সংকীর্ত্তনের ভিতর দিয়া ভক্তিধারা অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় শুষ্কতা দূর করিয়া দিল।

১২৭৪ সনের ৯ই অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসমাজে প্রথম ব্রহ্মোৎসব হয়। ঐ দিন প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহোৎসব চলিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উৎসবে নব্যব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় এই উৎসব এক মহাতীর্থ হইয়াছিল। উপাসকগণের নিকট 'পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হইয়াছিল।' গোস্বামীমহাশয় বলিয়াছেন—"সে দিন অনেকসময় মনে হইয়াছিল যেন স্বর্গে দেবতাদের সহিত সমস্বরে পরব্রহ্মের চরণ পূজা করিতেছি।" ধরাতলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভাব তাঁহার রচিত সংগীতেও দেখিতে পাওয়া যায় :—

"এতদিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব-বেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জর জর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে।

উর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি।”

এই বৎসর মাঘোৎসবে প্রথম নগর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় ‘তোরা আয়রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হ’ল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম’ এই সুপরিচিত সঙ্গীত রচনা করেন। উক্ত সংকীর্ত্তনে সে দিন কলিকাতা সহর মাতিয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—“আমি এতদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে নেড়ার দল মনে করিয়া উহা হইতে দূরে থাকিতাম। এই বারের উৎসবে ও কীর্ত্তনে আমার পরিবর্ত্তন হইল। আমার ন্যায় আরও অনেক ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইলেন। উৎসবের সময় একদিন কলুটোলায় কেশব বাবুর বাড়ীতে যাই, বিজয় বাবু আমাকে দেখিয়া আমার গলা ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তারপর উপাসনা হইল, তাঁহার আলিঙ্গনে আমি তথাকার উপাসনায় রহিলাম এবং তদবধি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইলাম। বিজয় বাবু তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে আমাকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত করিয়া লইলেন।”

উৎসবের কিছু দিন পরে কেশবচন্দ্র সপরিবারে মুঙ্গেরে গমন করেন। ঐ সময় তথাকার উপাসকমণ্ডলীতে কয়েকজন বৈষ্ণবভাবাপন্ন ভক্তলোক ছিলেন। কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী উপাসনায় যোগ দিয়া তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত অনুরাগের উদয় হইল। তাঁহারা কেশবচন্দ্রের প্রতি একান্ত ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেবল মুঙ্গেরে নয়, এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ প্রবেশ করিয়াছিল। ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্তের প্রতিও সকলের কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। ভক্তের

প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন গোঁসাইজীর রচিত—"প্রভু দয়াল সাধু মুখে আমি শুনেছি" গানেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"প্রভু দয়াল, সাধু মুখে আমি শুনেছি,
অকূল পাথারে পড়ে' ডাক্‌তেছি।
আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,
তা ত অধমজনা হ'তে জেনেছি।
করিতে পাপী উদ্ধার, হয়ে'ছ প্রকাশ এবার
মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর ?
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়ে'ছি।"

মুঙ্গের হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমে যাত্রা করেন। তাঁহারা এলাহাবাদ উপস্থিত হইলে কেশবচন্দ্রের ভক্তিময়ী উপাসনা ও বক্তৃতায় তথাকার উপাসকগণের মধ্যে ভাবের এমন উচ্ছ্বাস হইল যে, কেহ কেহ ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া আচার্য্যের পদতলে পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তি প্রকাশের এইরূপ বাহ্য প্রণালী ও কথার আতিশয্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ভাল বোধ হইল না। তাঁহারা সাধারণভাবে উহার প্রতিবাদ করিলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের নিম্নলিখিতরূপ কথা হইয়াছিল ;—

"শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু গত রজনীতে উৎসবের পর বলিয়াছেন যে, "আপনার চরণ আশ্রয় না করিলে মনুষ্যের পরিত্রাণ নাই।" ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা। প্রতাপবাবু প্রকারান্তরে মনুষ্যপূজা প্রচার করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে শিক্ষা করিয়াছি অনন্ত করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ মনুষ্যের পরিত্রাতা নাই। ঈশ্বর করুণা করিতে অক্ষম হইয়া মনুষ্যের প্রতি পরিত্রাণের ভার দেন নাই। মনুষ্যকে পরিত্রাতা বলা যদি এখনকার মত হয়, তবে আমি বাধ্য হইয়া আপনাদিগের সমাজে যোগদিতে অক্ষম হইব।

১৭৯০ শক, ১৭শে আশ্বিন,
সোমবার, প্রয়াগ। } বিজয়

কেশববাবুর উত্তর।

একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত মনুষ্যের পরিত্রাতা নাই, যিনি ইহা বিশ্বাস করেন তিনিই ব্রাহ্ম। মনুষ্যকে পরিত্রাতা বলিলে কুসংস্কার হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য হয়। আমি যদি কখন আমাকে পরিত্রাতা বলিয়া থাকি তবে আমাকে উৎপীড়ন কর, পরের কথার জন্য আমি দায়ী নহি। ভক্তির অপব্যবহারে পৌত্তলিকতা হয়, সত্যের অপ-ব্যবহারে নাস্তিকতা হয়। অতএব সত্যময়ী ভক্তি মধ্যপথ; ইহার বাঁয়ে পৌত্তলিকতা, দক্ষিণে নাস্তিকতা। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কতকগুলি পৌত্তলিক হইতেছেন, কতকগুলি নাস্তিক হইতেছেন। মধ্যের পথ বোধ হয় কেহই অবলম্বন করেন নাই। মধ্যপথে না আসিলে প্রকৃত শান্তি নাই।"*

---

* গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত এই পত্র ও কেশবচন্দ্রের উত্তর শ্রীযুক্ত আনন্দ প্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের সংরক্ষিত তাঁহার আত্মীয় মৈত্রেয় মহাশয়ের একখানি খাতায় পাইয়া আনন্দবাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ইহারপর তাঁহারা পুনরায় মুঙ্গেরে আসিলে তথায় কেশবচন্দ্রের প্রতি কতিপয় ব্যক্তির ভক্তি প্রকাশের বাহুলক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়াবাড়ি, অর্থাৎ কেশবচন্দ্রকে মধ্যবর্ত্তী মনে করেন এরূপ দেখিতে পাইলেন। "কেহ কেহ ভাবে উত্তেজিত হইয়া কত সময় তাঁহাদের আচার্য্যের পদ ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন এবং এরূপ বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন যে, সে সকল বাক্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকে সম্বোধন করার প্রথা জনসমাজে প্রচলিত নাই।" এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় এবং তদীয় বন্ধু যদুবাবু তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তৎপর তাঁহারা কলিকাতা আসিয়া 'ডেইলি নিউসে' ও 'সোমপ্রকাশে' নরপূজা নাম দিয়া প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশ করিলেন।

"প্রচারক দুইজন (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী) যে কেবল বাহিরের গুরুভক্তির আড়ম্বর মাত্র দেখিয়া তদ্বিরুদ্ধে প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কেননা, ঐ দুই জন অতি পবিত্রচরিত্র ব্রাহ্ম। একজন ব্রাহ্ম তর্ক করিতে করিতে উক্ত প্রচারকের একজনকে এ প্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে কেশব বাবুকে মধ্যস্থের ন্যায় তিনি যেন বিশ্বাস করেন এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল।" *

'কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকের ঝড়ের ন্যায় অতি শীঘ্র ঐ পত্র চারিদিকে তুমুল তুফান তুলিল।' এই সময় ভক্তির আধিক্য এবং তদনুযায়ী ভাষা যে কেবল কেশবচন্দ্রের প্রতিই ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা নয়, তখন পা লইয়া কাড়াকাড়ির খেলা মুঙ্গেরে একটা নিত্যক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হইলে অল্পদিন মধ্যে আন্দোলন-স্রোতে পড়িয়া

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র

উভয় দলের বহু লোকের মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সন্দেহ, অবিশ্বাস, কুৎসা প্রবৃত্তি, অপকারেচ্ছা সকলই উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। গোস্বামী মহাশয়ের সরল ও সত্যানুরাগের প্রতি সন্দেহযুক্ত হওয়াতে কেহ কেহ তাঁহাকে অবিশ্বাসী নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া গালি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রতিবাদকারী হইলেও তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। আর কেশবচন্দ্রেরও তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাব ছিল। এই প্রতিবাদের মূলে কোনরূপ দুরভিসন্ধি বা অবিশ্বাস নাই তাহা তিনি মনে করিতেন। শুনিয়াছি গোলযোগ অত্যন্ত জমিয়া উঠিলে কেশবচন্দ্র শান্তিপুর গিয়া গোস্বামী মহাশয়কে এই গোলযোগ থামাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের সদ্ভাবের প্রমাণস্বরূপ আরও বলা যাইতে পারে যে, ১৭৯১ শকের ৪ঠা শ্রাবণ কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ অনুষ্ঠানের উপাসনায় গোস্বামী মহাশয়ের উপর আচার্য্যের কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছিল।

বাদ প্রতিবাদে ব্রাহ্মসমাজ তোলপাড় হইয়া উঠিলে এবং কোলাহল ও হলাহলে ব্রাহ্মগণের মন বিষাক্ত হইয়া পড়িলে, গোস্বামী মহাশয় শান্তিতে বাস করিবার আশায় শান্তিপুর গমন করেন। কিন্তু তথায় অধিক দিন বাসকরা তাঁহার ঘটে নাই। সংগ্রামপূর্ণ ধর্ম্মপ্রচার যাহার জীবনের ব্রত, পরমেশ্বরের ইঙ্গিত ও আদেশ শুনিয়া চলা যাহার জীবনের মূলমন্ত্র তাঁহার পক্ষে কি নির্ব্বিঘ্নে আরামে বাস করা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? বিধাতার অভিপ্রায় তাহা নয়। সুতরাং অল্পদিন পরেই তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আসিতে হইল।

তিনি যতদিন শান্তিপুরে ছিলেন, দরিদ্রদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা এবং প্রয়োজন মত রোগীর সেবা করিয়াছেন। একজন সঙ্কটাপন্ন রোগীর

চিকিৎসার ভার লইয়া একদিন নৌকার অভাবে জলঝড় মাথায় বহিয়া গঙ্গানদী সন্তরণ করিয়া পার হইয়াছিলেন। *

শান্তিপুরে তাঁহার চিকিৎসাধীন একটা বালিকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় স্বপ্নে স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট রোগের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া বলিতেছিলেন—"তুমি ভাবিতেছ কেন, আমি প্রিসক্রিপসন্ বলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। তৎপর নিদ্রা হইতে উঠিয়া তিনি উহা কাগজে লিখিলেন; এবং পড়িয়া ভাবিলেন 'ইহা যে বিষ, ইহা কিরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে?' কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, এই ঔষধেই আরোগ্য হইবে। তৎপর ঐ ঔষধেই রোগের উপশম হইল। †

অল্প দিনের মধ্যে মুঙ্গেরের গোলযোগ অত্যন্ত বিস্তৃত হইলে গোস্বামী মহাশয় কেশবচন্দ্রের অনুগামীগণের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীবাদের মত কতদূর প্রসারতা লাভ করিয়াছে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি

---

* শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্রেয় হইতে সংগৃহীত।

† শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত। উক্ত ঘটনার বহু দিন পরে গোস্বামীমহাশয় একবার প্রচারার্থে মজঃফরপুর গিয়াছিলেন। একদিন বক্তৃতার পর একটী ভদ্রলোক বলিলেন—"আপনার বক্তৃতা ত শুনিলাম। কিন্তু আমার গৃহে একদিন আহার করিতে হইবে। আমার স্ত্রী আপনাকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। তিনি আপনাকে দেখিতে ও খাওয়াইতে ইচ্ছা করেন।" তৎপরে ঐ ভদ্রলোকের গৃহে আহার করিতে গেলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে চিনেন না?" উত্তর—"না, আমি আপনাকে চিনিতে পারিলাম না।" মহিলা উত্তর করিলেন "আমার পিত্রালয় শান্তিপুর। আমি একবার রোগে অত্যন্ত কাতর হইলে আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন"। ইহা শুনিয়া উপরোক্ত ঘটনা। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবস্থা বলিয়া দেওয়ার কথা। তাঁহার মনে পড়িল। তিনি নিজে এই ঘটনা নগেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন।

সাত আট মাসের অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন, দুই জন লোক ভিন্ন অপর কাহারও বিশ্বাসে কোন দোষ নাই। তখন আন্দোলন হইতে নিরস্ত হইয়া আত্মকৃত অনিষ্ট নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"তিনি যে দিন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, ঐ দিনই গিয়া কেশব বাবুর সঙ্গে মিলিত হইলেন; এবং ত্রুটী স্বীকার করিলেন। ভ্রম বুঝিবামাত্র ত্রুটী স্বীকার করিতে আমরা তাঁহার ন্যায় আর কাহাকেও দেখি নাই।"

১২৭৬ সনের (১৭৯১ শক) ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে ভ্রম স্বীকার করিয়া গোস্বামী মহাশয় যে পত্র প্রকাশিত করেন, উহাতে মুঙ্গেরের গোলযোগের মূলচ্ছেদ হইল। ধর্ম্মতত্ত্বের ঐ পত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েক জন ব্রাহ্মভ্রাতার ভক্তি প্রকাশে আতিশয্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া, তন্নিবারণের জন্য আমি বিগত আশ্বিন মাসে উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে; এবং অনেক স্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদবিসম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে উৎসাহ পূর্ব্বক পরস্পরের গ্লানি প্রচার করিতেছেন; এবং অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি হইতেছে। এই সমুদয় অনিষ্ট ফল দেখিয়া আমি যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমিই অনেকটা এই আন্দোলনের মূল কারণ। এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে। অতএব ইহার অনিষ্ট ফল নিবারণের জন্য আমার এ সময় চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্বাবধি হৃদগতভাব কি এবং আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর নিকট বিনীত ভাবে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন

যেন এই পত্রদ্বারা সকলের সন্দেহ বিষাদ দূর হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সদ্ভাব বিস্তার হয়।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে উল্লিখিত ভ্রাতারা যে প্রণালীতে ভক্তি প্রকাশ করেন তাহা আমার বিবেচনায় দূষণীয় ও অনিষ্টকর। কিন্তু এরূপে ভক্তি প্রকাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উৎপন্ন হয় কিনা তাহা আমি পূর্ব্বে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাহ্যিক আড়ম্বরের অবশ্যই দূষিত মূল থাকিবে ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভ্রাতাদিগকে মনুষ্য উপাসনা দোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, এবং এ সম্বন্ধে মুঙ্গেরে ও এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কেহই স্পষ্ট উত্তর না দেওয়াতে আমার উক্ত সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। এক্ষণে আমার সে সংস্কার নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া এবং দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে, কেবল বাহ্যিক কার্য্য ও শব্দে আতিশয্য দোষ আছে, তাঁহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনুষ্য উপাসনা করেন না; এবং পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে কোন মনুষ্যের নিকটে প্রার্থনা করেন না। কেশব বাবুর প্রতি তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা যতই অযৌক্তিক হউক না, তথাপি আমি কখনই এরূপ মনে করিতে পারি না যে, তাঁহারা উক্ত মহাশয়কে ভক্ত-পরিবারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং পরম উপকারী বন্ধু ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেখেন। এইরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুষ্যের প্রতি যতই অল্প হয় ততই ভাল। কেননা তদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি ভ্রাতাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে, তাঁহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাঁহারা দুর্ব্বল ভ্রাতাদিগের মঙ্গলের জন্য যেন ভক্তির এমন সকল বাহ্য লক্ষণ রহিত করেন, যদ্দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অপকার হইতে পারে।

ভক্তিভাজন কেশববাবুর প্রতি আমি কখনই দোষারোপ করি নাই। অপর ভ্রাতারা তাঁহাকে সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তজ্জন্য দায়ী নহেন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী নহেন, তজ্জন্য কাহাকেও অনুরোধ করেন নাই। বরং ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐরূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেন নাই, তাঁহার কেবল এইটুকু ক্রটী আমি দেখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহার অনুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি।

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন। তাঁহার আশঙ্কা করিবার আর কোন কারণ নাই। এখন নিরর্থক ভ্রাতাদিগের দোষ ঘোষণা করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না, তখন তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। এতকাল যাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমরা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাঁহাদিগের সরল সত্য বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করা অকৃতজ্ঞের কার্য্য সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভক্তিভাজন কেশববাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকেও যথাপরিমাণে সম্মান করেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদিগের মত সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় না। কারণ সাধুভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। অতএব আসুন পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় একপরিবারে মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন এবং বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরে অমূল্য ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ্য সম্ভোগ করি। পরিশেষে সমুদয় ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের নিকট আমার সানুনয়ে নিবেদন এই যে, তাঁহারা

কেশব বাবুকে অকারণে এবং নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ না করেন; এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যদিগের প্রতি মনুষ্যোপাসনা দোষারোপ না করেন। আমার হৃদগত বিশ্বাস-সূচক এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা সকল সংশয় দূর করুন। বর্ত্তমান গোলযোগে চতুর্দ্দিকে যে ভয়ানক শুষ্কতার মহামারী উপস্থিত হইয়াছে তদ্দ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বলা যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ এবং প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি বিস্তারে যত্নশীল হইয়া আপনাদিগের এবং দেশস্থ ভ্রাতাদিগের মঙ্গল সাধন করুন।

১৭৯১ শক, ১৫ই আষাঢ়। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।"

উক্ত পত্র পাঠ করিয়া নানালোকে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ লেখককে অস্থিরচিত্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এ সম্বন্ধে কলিকাতার ঠাকুরদাস সেন মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"কেহ কেহ এই মাত্র বলিতে পারেন তিনি (গোস্বামী মহাশয়) অধীর ও চঞ্চল হইয়া এমন কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এরূপ বলিবেন তাঁহাদিগের উর্দ্ধে দৃষ্টি নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিম্ন দিকেই ধাবিত হয়। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সরল উচ্চভাব গ্রহণে অসমর্থ। তিনি সত্য-প্রিয়। সত্যের অনুরোধে তিনি নিজের মান মর্য্যাদার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। সাত আট মাস পূর্ব্বে তিনি যাহা সত্য বোধ করিয়াছিলেন তখন সেইমত কার্য্যই করিয়াছিলেন। এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রতীতি হইল, তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রচার করিলেন। লোকে আমাকে কি বলিবে, এই নীচভাব তাঁহার উন্নত মনকে সত্য প্রচারে বাধা দিতে পারিল না। এমন লোক জগতে কয়জন আছেন? মান মর্য্যাদাই লোকের সর্ব্বস্ব, কোট্ বজায় রাখা লোকের স্বভাবসিদ্ধ। এই

উভয়কেই যিনি তুচ্ছ করিতে পারেন, তিনি যে কেমন লোক, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই জানেন"। *

গোস্বামী মহাশয় স্বীয় ত্রুটী স্বীকার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাহাতে পুনরায় সদ্ভাব জন্মে তজ্জন্য ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবন্ধ লিখিয়া বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ যাহাতে আবার পরস্পর পরস্পরের নাম শুনিয়া ও মুখ দেখিয়া পুলকিত হন, এবং একহৃদয় হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন, এজন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার পত্র প্রকাশিত হইলে, ধীরে ধীরে বিবাদের বহ্নি নির্ব্বাণ হইয়া আসিল; এবং পুনর্ব্বার ব্রহ্মোপাসনার প্রতি উপাসকগণের দৃষ্টি পড়িল। এই বৎসর ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ দিন প্রাতে ও সায়ংকালে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত উদ্দীপনাময়ী উপাসনা হইয়াছিল; সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়, প্রভৃতি একুশজন শিক্ষিত এবং উৎসাহী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উৎসবের আনন্দহিল্লোলে ব্রাহ্মসমাজের মনোমালিন্য দূর হয়।

ভাদ্রমাসে গোস্বামী মহাশয় পুনরায় ঢাকায় গিয়া ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে এই কারণে উক্ত ভার গ্রহণে আপত্তি করিয়াছিলেন যে—'যদি ব্রাহ্মসমাজে সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে তবে আমি এখানে আচার্য্যের কার্য্য করিতে সম্মত হইতে পারি না।' অবশেষে তাঁহার আশঙ্কা দূর হইলে উক্ত ভার গ্রহণ করেন। এই সময় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ নবগঠিত পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলিয়া একীভূত হইয়া যায়। ঢাকাতে তখনও প্রাচীন ব্রাহ্মের সংখ্যা অধিক ছিল। নব্যদলের অধিকাংশ ব্রাহ্ম, যুবক বা ছাত্র

* মুঙ্গেরের আন্দোলন বিষয়ক পুস্তক।

ছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মদলের উপর তাঁহাদের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। যদিও প্রাচীনেরা গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনা বক্তৃতাদির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের স্বাভাবিক সংস্কারবিমুখতার জন্য গোস্বামী মহাশয়ের সকল মতের সমর্থন করিতেন না। সুতরাং তাঁহারা দুইদল, মতভেদ লইয়াই একত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি একবার তাঁহার কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া প্রচারার্থে কুমিল্লা গমন করেন। তথায় তাঁহারা জনৈক বন্ধুর গৃহে ঈশ্বরোপাসনা ও নামসংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময় প্রায় একশত লোক যষ্টিসহ আসিয়া, তাঁহাদিগকে মারিয়া সহর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে, অত্যন্ত গোলযোগ আরম্ভ করে। ব্রাহ্মগণ পূর্ব্বেই ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া 'দয়াময় নাম বল রসনা অবিশ্রাম' এই কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আততায়ীরা তাঁহাদের সঙ্গীত শুনিয়া এবং তাঁহাদিগের ভক্তিভাব দেখিয়া কিছুকাল নীরব হইয়া রহিল ও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবের আবেগে অশ্রুপাত পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। অত্যাচার করা আর তাহাদের হইল না। পরিশেষে তাহারা অনুতপ্ত হইয়া গৃহে গমন করিল। *

১২৭৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, সমারোহে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কলিকাতা হইতে কেশবচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ঢাকায় গমন করেন। উৎসবের প্রথম দিন তাঁহারা সদলে কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজসুন্দর বাবুর আরমাণিটোলার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হন। নগর-সংকীর্ত্তন ঢাকাতে এই প্রথম। প্রাচীন ব্রাহ্মদল এই সময় কীর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা

* ধর্ম্মতত্ত্ব (১৭৯১।১৬ই কার্ত্তিক

একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, কীর্ত্তনে সহজে হৃদয় দ্রব হয়। তাঁহারা প্রকাশ্যে কীর্ত্তনের পক্ষসমর্থন না করিয়াও কীর্ত্তনের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। 'তোরা আয়রে ভাই এতদিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম'—সংকীর্ত্তনে সহর মাতাইয়া যখন গায়কদল সমাজপ্রাঙ্গনে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন সেই মহোৎসব দেখিবার জন্য সম্ভ্রান্ত. ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ নানাশ্রেণীর লোকে মন্দির-প্রাঙ্গন ও গৃহ পূর্ণ করিয়াছিল। প্রাচীনগণের মুখে সেই দিনের বিবরণ— 'ধরাতলে স্বর্গধাম অবতীর্ণ'—শুনিলে বিস্ময় জন্মে। তখন ব্রাহ্মসমাজের শক্তি শিক্ষিত লোকের মধ্যে এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, এই উৎসবে কেশবচন্দ্রের নিকট প্রায় ৪০ জন অনুরাগী ও শিক্ষিত যুবক প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অম্বিকাচরণ সেন, রজনীকান্ত ঘোষ, বরদানাথ হালদার, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালীনারায়ণ রায়, আনন্দচন্দ্র নন্দী এবং জালালউদ্দিন মিঞা প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের পরিচিত ব্যক্তিগণ ছিলেন। ইঁহাদের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের মূলে গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের প্রভাব বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

যদিও আচার্য্য কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে দুইবার ঢাকা আসিয়া উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা কৃতবিদ্য যুবকদলের মনে উচ্চাদর্শ জাগাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ভাবের রক্ষণ ও পোষণের ভার গোস্বামী মহাশয়ের উপর ছিল। তাঁহার হৃদয়স্পর্শিনী উপাসনা ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগের দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াছিল। "অসত্য পরিত্যাগ কর; কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সত্যের শরণাপন্ন হও, তবেই সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হইবে; মুখে যাহা বল এবং মনে যাহা বিশ্বাস কর কার্য্যে তাহা প্রদর্শন কর, তবেই প্রকৃত জীবন লাভ হইবে," এই সমস্ত

কথা তিনি এমন জোরে বলিতেন যে, তাহাতে বিশেষ ফল হইত। কেবল যে উপদেশেই সুফল লাভ হইয়াছে এমন বলা যায় না। উপদেশের পশ্চাতে তাঁহার উৎসাহপূর্ণ পবিত্র জীবনও সকলের দৃষ্টান্তস্থলে ছিল। এই দৃষ্টান্ত শিক্ষিত যুবকগণকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে হুলুস্থূল পড়িয়াছিল।

তাঁহার এই সময়ের ভক্তি বিষয়ক একটী উপদেশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ, ভক্তি ধর্ম্মের জীবন, জীবের শান্তি, ভক্তি পাপীর গতি। ভক্তিশূন্য ধর্ম্ম জীবনে স্থান পায় না। সাধনা ভিন্ন মুখের কথায় ভক্তি লাভ হয় না। হৃদয় শুষ্ক হইল বলিয়া চীৎকার করিবে, অথচ যত্নপূর্ব্বক সাধনা করিবে না, তাহা হইলে তোমার কপট চীৎকার লোকের বিরক্তিকর হইবে। যে প্রকার সাধনা দ্বারা প্রাচীন ভক্তগণ চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণ তাহাই আলোচিত হইতেছে।

প্রথম বিনয়; হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অভিমান থাকিতে ভক্তির মুখ দেখিতে পাইবে না। দ্বিতীয় সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা। জীবনে সুখ হইলেও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে, দুঃখ হইলেও তাঁহারই প্রশংসা করিবে। কারণ তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য সুখ দুঃখের বিধান করেন। মনুষ্যের সহস্র অপরাধ দেখিয়াও ক্ষমাশীল হইবে, পরের অপকার না করিয়া উপকার করিবে।

বিনয়, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা সাধন দ্বারা মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবে। যে ব্যক্তি মনুষ্যকে প্রীতি করে না, সে ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে সক্ষম হয় না। যে ধর্ম্মে কেবল মতামত লইয়া দলাদলি, সেই ধর্ম্মে ভক্তি মাত্র নাই।

মনুষ্যকে প্রীতি করাই প্রথম প্রকার সাধনের উদ্দেশ্য। সাধনা দ্বারা এমন বিনীত হইতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন ব্রহ্মসাধন করিতে হইবে।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং

অর্চ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্ম নিবেদনম্।

এই নবাঙ্গ সাধন ভক্তি লাভের প্রধান উপায়। ঈশ্বরের নাম যেখানে আলোচিত হইবে, কীর্ত্তিত হইবে, সেখানে গমন করিয়া শ্রবণ করিতে হইবে। ভাল লাগিতেছে না, ভাষার পারিপাট্য নাই, বলিবার শৃঙ্খলা নাই, সঙ্গীতের সুর ভাল নহে ইহা বলিয়া নাম শ্রবণ পরিত্যাগ করিওনা। হৃদয়-বন্ধুর কথা শুনিয়া কি হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে না? যাহাতে পিতার দয়াল নামের মধুরতা হৃদয় উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। বিশ্বাস-পূর্ণ মনে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। তাঁহার নাম গান করিলে, স্মরণ করিলে, হৃদয় পুলকিত হয়, পবিত্র হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্কধর্ম্ম নহে, ভক্তিই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। এই ভক্তির হিল্লোল উত্থিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিবে। 'কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তিনিকেতন।' *

ঢাকা অবস্থান কালে তাঁহার ময়মনসিংহের তৃতীয় বারের কার্য্য;—

"১৮৬৯ সালের শীত ঋতুতে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে আগমন করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের মুখে সংকীর্ত্তন শুনিয়া আমাদের অনেকের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। আমরা তাঁহার নিকট সংকীর্ত্তন শিক্ষা করিলাম। তখন অতি অল্পসংখ্যক সংকীর্ত্তন রচিত হইয়াছিল, তাহাই পুনঃ পুনঃ গান করা হইত। "শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে" এই গানের

* ধর্ম্মতত্ত্ব (১৭৯২।১৬ই জ্যৈষ্ঠ)।

সুরে অখিলতারণ বলে একবার ডাক তাঁরে।'* এই সংকীর্ত্তন রচনা করিয়া গোস্বামী মহাশয় গাইলেন ; আমরা আমাদের চিরপরিচিত সুরে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিয়া বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিলাম। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বৈষ্ণবদের ন্যায় খোল করতাল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এ সংবাদে সহরে খুব আন্দোলন উপস্থিত হইল। লোকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ প্রশংসাও করিল। সমাজঘরে আর লোক ধরিতনা। বস্তুতঃ তখন বিজয়কৃষ্ণের অগ্নিময় বক্তৃতা, সুমধুর উপাসনা, ও ভক্তিরসপূর্ণ সংকীর্ত্তনে এই নগর যেন টলমল করিতেছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রসঙ্গ ভিন্ন লোকের মুখে অন্য কথা ছিল না। এই সময় গোস্বামী মহাশয় একটী ব্যাকুলভাবের নূতন সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন ; আমরা বহু বৎসর এই কীর্ত্তনটী গাহিয়াছিলাম। এই কীর্ত্তনটী সঙ্গীত পুস্তকে উঠে নাই বলিয়া অন্যত্র প্রচারিত হয় নাই। উহা তৎকালের বিশেষ ভাব প্রকাশক বলিয়া এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম ;—

কীর্ত্তন।

সকল শূন্যময় হেরি, না হেরিয়ে বিভু নয়নে।
আমার হৃদয় শুকায়ে গেল হে (এ)।
শুনেছি সাধু সদনে, চায় যে তাঁরে,
তাঁহারে দেখিতে পায় নিজ অন্তরে।

* অখিলতারণ ব'লে এক বার ডাক তাঁরে।
একবার ডাক তাঁরে ভক্তসঙ্গে, ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে ;
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব'লে। (একবার হৃদয় খুলে)।
যদি ভব-সিন্ধু পারে যাবে ডাক তাঁরে ত্বরা ক'রে
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব'লে। (একবার মনের সাধে)।

আমি ডাকিতে পারিনা মোহে, পাইব কেমনে।
পড়েছি অগাধ কূপে, না দেখি উপায়,
বিনা সেই করুণাসিন্ধু প্রভু দয়াময় ;
তাঁর নামের গুণে পাপা তরে, শুনেছি শ্রবণে।

এইবার গোস্বামীমহাশয় এখানকার ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন।" *

টাঙ্গাইলের কোন গ্রামের প্রচারবিবরণ এইরূপ ;—টাঙ্গাইলের অন্তর্গত গাজিয়া বাড়ীর থালের নিকট শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরীর প্রদত্ত জমিতে তাঁহার অর্থে সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত এবং তথায় উপাসনার আয়োজন হয়। কলিকাতা হইতে গোস্বামী মহাশয় এবং ময়মনসিংহ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু আসেন। গৃহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন উদ্যোগকর্ত্তারা গৃহ সুন্দর সজ্জিত করেন। কিন্তু পর দিন গৃহ শূন্য ; বেঞ্চ, বেদী, গৃহসজ্জা বিরোধীরা সমস্ত চুরি করিয়াছে। গোস্বামীমহাশয় শূন্যগৃহে দাঁড়াইয়া হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। তৎপর সদলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সাকরাইল, কাগমারি, প্রভৃতি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিরোধীরা মলমূত্র দ্বারা গৃহ-প্রবেশের পথ দুর্গম করিয়া রাখিয়াছিল। তখন তাড়াতাড়ি গৃহ পরিষ্কার করা হইল। গোস্বামী মহাশয় উপাসনা করিলেন। অনেক লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া উপাসনা শুনিয়াছিল।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের পর গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা গমন করেন ; এবং মাঘোৎসব পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে প্রচারার্থে যাত্রা করেন। মুঙ্গেরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা' এবং বৃন্দাবনে 'চৈতন্য ও পবিত্রতা' সম্বন্ধে তাঁহার

---

* ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর হইতে সংগ্রহ।

বক্তৃতা হয়। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ, মথুরা, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার বক্তৃতা, উপাসনা ও আলোচনায় লোকের মধ্যে ধর্ম্মোৎসাহ জন্মিয়াছিল। আগ্রাতে তাজমহল দেখিয়া যে বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"তাজ দর্শনান্তে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করি। বোধ হইল আমি তাজের প্রাঙ্গনস্থ উদ্যানে গিয়াছি। উদ্যানের পুষ্পবৃক্ষগুলি পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল। সেই অপূর্ব্বরূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহাদিগকে দেবকন্যা মনে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কিজন্য এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছ ?' এবং আমি দেখিলাম তাঁহারা একবার বৃক্ষ, আবার স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। আমি তাঁহাদের এইরূপ বেশ পরিবর্ত্তনে বিমুগ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিলাম এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি আপনাদের নিকট একটী উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তাহা কিরূপে বুঝিব ?' তাঁহারা বলিলেন—'তুমি আজও ঈশ্বর বিষয়ে অনভিজ্ঞ ?' যাঁহার রাজ্যে বাস কর, যাঁহার দয়া ভিন্ন এক দণ্ড বাঁচ না, তাঁহার বিষয়ে কোন্ প্রাণে সংশয় করিতেছ ?' 'আমি একজন ঘোর মূর্খ, কিছুই জানি না ; আপনারা উপদেশ দিয়া আমাকে সুখী করুন।' তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—'আমাদের মত সুন্দরী কোথায়ও দেখিয়াছ ?' উত্তর—'না, স্বপ্নেও দেখি নাই।'—'একমাত্র ঈশ্বরই আমাদিগকে এত সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের আভা আমাদের শরীরদিয়া বহির্গত হইতেছে বলিয়া আমাদের এমন শোভাসৌন্দর্য্য হইয়াছে। তাঁহার অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই সুন্দর হইতে পারে না। ইহার গূঢ় অর্থ যদি বুঝিয়া

থাক তবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরকে পরম সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইবে।' ইহা বলিয়া স্ত্রীলোকগুলি বৃক্ষরূপ ধারণ করিল। অপরদিকে চাহিয়া দেখি শুভ্রশ্মশ্রুধারী কতিপয় বৃদ্ধ কহিতেছেন- 'যে ঈশ্বরকে সুন্দর বলিয়া জানিলে তাহাকে প্রাণ বলিয়া জান। কেবল তিনি আমাদের প্রাণরূপে আছেন বলিয়া আমরা এতদূর সারবান হইয়াছি।' ইহা বলিতে বলিতে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষরূপ ধারণ করিলেন। এই সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি এই স্বপ্নটী দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। পূর্ব্বে যাহা শূন্যমাত্র জ্ঞান হইত এখন তাহা দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাবে পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।"

লাহোরের একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ;—

প্রচারার্থে লাহোর গিয়া কয়েক দিন বন্ধুদের সঙ্গে একত্র ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনায় যাপন করেন। একদিন রজনীতে মানসিক বিকার উপস্থিত হওয়ায় অত্যন্ত অনুতাপ জন্মে ; পুনঃ পুনঃ এই চিন্তা উপস্থিত হয়—'আমি প্রচারক উপদেষ্টা, আর আমার মন পাপ-চিন্তার অধীন! হায়, আমার তবে কিছুই হয় নাই!' অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হওয়ায় কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে 'মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়' এই গান উঠিল। তিনি কাঁদিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ গান করিলেন, কিন্তু তবুও মন শান্ত হইল না। অবশেষে 'পাপ জীবন রক্ষা করা বৃথা' মনে করিয়া আত্মহত্যায় কৃতসংকল্প হইলেন। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন, গভীর নিদ্রায় প্রাণিগণ অচেতন। তিনি সেই সময়ে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, নিকটস্থ রাবী নদীতীরে আসিয়া দেহ বিসর্জ্জন মানসে একখণ্ড গুরু-ভার প্রস্তর, পরিধান বস্ত্রদ্বারা গলবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একজন সাধু জঙ্গল হইতে

আসিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, "বৎস, শরীরনাশে পাপের নাশ হয় না। যখন পাপ নষ্ট হইবে তখন তুমি তাহা জানিতেও পারিবে না। কিন্তু তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ঈশ্বর সমস্ত কাজেরই সময় নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। বাতাসে যে ধূলিরাশি উড্ডীন হয় তাহাও তাঁহার ইচ্ছাতে। অতএব চিন্তিত হইও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। বিশ্বেশ্বরের লীলা দর্শন কর। তোমার অবশ্যই ভাল হইবে।"

গোঁসাই নিজের জীবনের মলিনতার উল্লেখ করিলে সাধু বলিলেন, "তোমার জীবন মলিন বটে, কিন্তু তুমি কিজন্য এইরূপ মলিন জীবন লইয়া পরলোকে যাইবে? জীবনকে পবিত্র করিয়া যাও। প্রতিদিন ভগবানের নাম কর, তিনিই তোমাকে পবিত্র করিবেন। তুমি কত সুন্দর তাহা এখন দেখিতেছ না; কিন্তু যখন তোমার নিকট সাধন-পথের একটি আয়না খুলিয়া যাইবে তখন তাহাতে তোমার স্বরূপ দেখিলে বুঝিতে পারিবে তুমি কত সুন্দর। তুমি প্রতিদিন শয়নের সময় মা নাম জপ করিবে। জপ করিতে করিতে যখন মন তন্ময় হইবে তখন শয়ন করিবে। এরূপ করিলে কোন প্রকার মলিন চিন্তায় মনকে চঞ্চল করিতে পারিবেনা।" এইরূপ নানা উপদেশ দিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন; তিনিও গৃহে আসিলেন। তখন অনুতাপে তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাঁহার রচিত সঙ্গীতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। উহা উদ্ধৃত করিতেছি;—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণ-সম, কেমনে পূজিব তোমায়।

শুনি তব নামের গুণে তরে মহা পাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে' কেশে ধরে', দাও চরণে আশ্রয়।"

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুদিন সপরিবারে মুঙ্গেরে বাস করেন। তথায় তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা সন্তোষিণীর জ্বরবিকারে মৃত্যু হয়। তিনি 'শোকোপহার' নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক রচনা করেন।

মুঙ্গের হইতে কুষ্টিয়া ও কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন; এবং তথাহইতে পুনরায় তাঁহার প্রচারের কেন্দ্রস্থান ঢাকাতে সপরিবারে উপস্থিত হন। এই সময় কতিপয় যুবক তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেন। এখন যাঁহারা প্রাচীন তখন তাঁহারা যুবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন * মহাশয় বলিয়াছেন—"গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে কত ভাল বাসিতেন তাহা বলিতে পারি না; প্রেমের বলে তিনি আমাদের ন্যায় যুবকদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।"

তিনি যদিও যুবকদলেরই নেতা ছিলেন, প্রাচীনদলেরও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, ঈশ্বরানুরাগ যুবক বৃদ্ধ সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন দল অপেক্ষাকৃত সংস্কার-বিরোধী হওয়াতে তাঁহার সকল মতের অনুমোদন করিতেন না। সুতরাং কলিকাতার ন্যায় ঢাকাতেও দুই দলের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ ছিল।

ইতিমধ্যে কি প্রকার লোক পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য

* ফরিদপুর জেলাস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক।

মনোনীত হইবেন এবং সমাজগৃহে খোলকরতালসহ কীর্ত্তন হইতে পারিবে কি না এই সকল বিষয় লইয়া যুবক ও প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ হয়। (১২৭৭ সন ভাদ্র মাস)। যাঁহারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন কিংবা তাহাতে যোগ দেন তাঁহাদিগকে আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিতে যুবক ব্রাহ্মগণের ও গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ আপত্তি ছিল; কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মগণের কোন আপত্তি ছিল না। তাঁহাদের আপত্তি ছিল সমাজগৃহে খোলকরতাল ব্যবহারে। আর যুবকব্রাহ্মগণ খোলকরতাল ব্যবহারে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। উক্ত দুইটী বিষয়ের মীমাংসার জন্য প্রকাশ্য সভায় বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে প্রাচীন দলের মতই প্রবল হইল। তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন—'পৌত্তলিকতার সঙ্গে সাধারণভাবে সংসৃষ্ট ব্যক্তি আচার্য্যের পদে থাকিতে পারিবেন।' এই নির্দ্ধারণ গোস্বামী মহাশয়ের আচার্য্যের পদে স্থির থাকার অন্তরায় হইল; কারণ তিনি যাহা অন্যায় মনে করিতেন, তাহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া চলিতে অক্ষম ছিলেন। সুতরাং সঙ্গতের যুবক ব্রাহ্মদলসহ তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইলেন; এবং ঢাকাপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিয়া স্বতন্ত্রস্থানে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। কলিকাতার ন্যায় ঢাকাতেও তাঁহারই উদ্যোগে স্বতন্ত্র উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল।*

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সভাপতি ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় গোস্বামী মহাশয়কে সমাজের আচার্য্যপদে স্থির রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সম্মত করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকৃতি কুসুমের ন্যায় কোমল হইলেও বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিল। নরনারীর পাপদুঃখে ব্যথিত হইলেও কর্ত্তব্যের তুলাদণ্ডে ও বিশ্বাসের অগ্নি-পরীক্ষায়

* কিছুদিন পরে এই দুই দলের পুনর্মিলন হয়।

বজ্রের কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিত। কোন বিরোধীমত তাঁহার জীবনে জয়যুক্ত হইতে পারিত না। সুতরাং ব্রজসুন্দর বাবুর চেষ্টা ব্যর্থ হইল। নাচিপান্দরিপা নামক গলির দেওয়ান সাহেবের হাবেলিতে নিয়মিতরূপে তাঁহাদের উপাসনা হইত। পরে তাঁহাদের বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে হয়। উৎসবের সময় ৫।৬ জন শিক্ষিত যুবক গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গোস্বামী মহাশয় স্বতন্ত্র হওয়ায় কলিকাতা হইতে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ঢাকায় গমন করেন।

ইতিপূর্ব্বে ঢাকার উৎসাহী যুবকব্রাহ্ম বরদানাথ হালদার, সারদানাথ হালদার ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে তাঁহাদের কোন আত্মীয়া কুলীনকন্যা ব্রাহ্মসমাজে আনীতা হন। কন্যার আত্মীয়গণ কোন বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির করিলে দেশহিতৈষণার মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহার উক্ত যুবক আত্মীয়গণ মর্ম্মাহত হইয়া প্রতিকূল হন; এবং বহু চেষ্টায় কন্যার উদ্ধার করেন। তাহাতে কন্যার অপরাপর আত্মীয়গণের প্রেরিত গুণ্ডার লগুড়াঘাতে একজন যুবক মাথা ফাটিয়া গিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের উৎসাহের লাঘব হয় নাই। পরে ধরা পড়িবার ভয়ে তাঁহারা কন্যাটীকে বরিশালের পথে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। বরিশালে দুর্গামোহন দাস মহাশয় তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া পরে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ঢাকার হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার হিন্দু-হিতৈষিণী পত্রিকা এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ ও এই কার্য্যকে বালিকা অপহরণ নাম দিয়া ব্রাহ্মদের প্রতি অজস্র নিন্দা ও তিরস্কার করিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় উহার প্রতিবাদস্বরূপ—"পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি উক্ত বক্তৃতায় ভারতের

প্রাচীন গৌরব এবং বর্ত্তমান কুসংস্কার, দুর্নীতি ও দেশাচারের মহানিষ্ট-কারিতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওজস্বিনী ভাষায় প্রদর্শন করেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র [illegible] সনের কার্ত্তিক মাসে ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ভারতসংস্কার সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বিবিধ হিতকর কার্য্যের সূচনা করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য। যাঁহারা আরব্ধ কার্য্যসম্পাদনে কেশবচন্দ্রের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু তাঁহার কার্য্যে ব্যয়িত হইতে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। কেশবচন্দ্রের আহ্বানে তিনি ঢাকা হইতে সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া ভারতসংস্কার সভায় যোগদান করেন এবং প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া উহার সেবায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় তাঁহার পুত্র যোগজীবনবাবু নিতান্ত শিশু।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার আরব্ধ কার্য্য (১) শ্রমজীবীদের শিক্ষা (২) স্ত্রীজাতির উন্নতি (৩) সুলভ সাহিত্য প্রচার (৪) সুরাপান নিবারণ (৫) দাতব্য—এই পাঁচটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন কার্য্যের ভার ন্যস্ত করেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপর প্রধানতঃ দাতব্য ও স্ত্রীশিক্ষার ভার অর্পিত হয়। অঘোরনাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়গণের সহিত স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তিনি উহার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। উক্ত বিদ্যালয়ে বয়স্থা মহিলাগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যদ্বারা নারীগণের মহদুপকার লাভ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 'নারীজাতির উন্নতি বিধায়িনী' সভা স্থাপন করিয়া নারীজাতির উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইলে গোস্বামী মহাশয় সভার কোন অধিবেশনে 'স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কি?' এই বিষয়ে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে কিরূপ সুপ্রণালী মতে দক্ষতার সহিত শিক্ষাদান হইত, তাহা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠে অবগত হওয়া যায় ;—

"আমার সময় না থাকাতে আমি আমার একজন উপযুক্ত ছাত্রকে (মহিলা বিদ্যালয়ের) সাহিত্যের প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে দেই। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে যে সকল প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেগুলি দেখিয়া আমার এত কঠিন মনে হইয়াছিল যে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম ছাত্রীগণ এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেনা ; কিন্তু আমি যখন নিজে তাঁহাদিগের প্রদত্ত উত্তরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম তখন দেখিলাম প্রশ্নগুলির সুন্দর উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্য্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা কেমন করিয়া এমন ভাল রকম ব্যাকরণ শিখিল। বস্তুতঃ উত্তর দেখিয়া মনে হইল যেন ছাত্রীগণ সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছে। ইহাদের লিখিবার রীতিও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ। আমার ধারণা এই যে ইহারা অল্প দিনের মধ্যে অতি উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইবে।" *

স্ত্রীবিদ্যালয়ের কার্য্যের সঙ্গেসঙ্গে তাঁহাকে দাতব্য বিভাগে কাজ করিতে হইত।

"এই সময় কলিকাতার ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী বেহালা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ভারতসংস্কার সভার পক্ষ হইতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কান্তিচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ সপ্তাহে দুদিন বেহালায় গমন করিতেন। তিন দিনের উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া তাঁহারা যাইতেন ; এবং দুই দিন তাঁহাদিগকে প্রায় সমুদয় দিন উপবাসী থাকিয়া রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিতে

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

হইত। তাঁহারা প্রাতে সাতটার সময় গিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।" *

প্রভাতে উঠিয়া স্নান ও ঈশ্বরোপাসনা সারিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্যাদি লইয়া গোস্বামী মহাশয় বেহালাতে যাইতেন। প্রায় সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর দুই তিনটার সময় আসিয়া কিছু আহার করিয়াই পরিশ্রান্ত শরীরে পুনরায় স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতেন। রাত্রিতেও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না; অনেকক্ষণ জাগিয়া কঠিন পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নে ও পুস্তকাদি লিখিতে প্রবৃত্ত থাকিতেন। ইহার উপর ধর্ম্মালোচনা, উপাসনা, চিন্তা, ধ্যান। শরীর কত সহিবে? অপরিমিত পরিশ্রমে অচিরে হৃদয়ে সাংঘাতিক বেদনা এবং তজ্জন্য মাঝে মাঝে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। 'মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন' কার্য্যসাধনে ইহাই তাঁহার ব্রত ছিল। স্বাস্থ্যের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ইহাতে তাঁহার আজীবনসঙ্গী হৃদ্‌রোগ জন্মিল। পরে মুঙ্গেরে গিয়া এক দিন বেদনার এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, বেদনাজনিত মূর্চ্ছার জন্য তথাকার একজন সুচিকিৎসক মরফিয়া ইন্‌জেক্ট করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে ঘনঘন বেদনা উপস্থিত হওয়ায় কেশবচন্দ্র তাঁহার জন্য একজন স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করিলেন।

পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার চিভার্স সাহেব, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত চিকিৎসক চিকিৎসা করিলেন। কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহাদের পরামর্শে যন্ত্রণার আশু উপশমের জন্য নিয়মিতরূপে মরফিয়া সেবনে বাধ্য হইলেন। †

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

† গোস্বামী মহাশয়ের কোন কোন শিষ্য বলিয়াছেন বেদনায় নিতান্ত কাতর

জনহিতকর সকল কার্য্যেই তাঁহার উৎসাহ ছিল। আমরা শুনিয়াছি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত সুলভ সমাচারের পরিচালনে তিনি কিছু দিন সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি মদ্যপান করিতেন। নবীন দলের উদ্যোগে মদ্যপান নিবারণোদ্দেশ্যে যে সভা হইয়াছিল, অনেকে তাহার সভ্য হইয়াও গোপনে মদ্যপান করিতেন। গোস্বামী মহাশয় সুলভ সমাচারে তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হয়। তাঁহারা কেশবচন্দ্রের নিকট অভিযোগ করেন। তাহাতে গোস্বামী মহাশয় সুলভ সমাচারের সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

ভারতসংস্কার সভার আর একটী কার্য্য ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠা। ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গোস্বামী মহাশয় কেশবচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ধর্ম্ম-পরিবার সংস্থাপন এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্মপরিবার সকল একত্র একভাবে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করিবেন; সেবা, স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একত্র উদ্যাপিত হইবে; স্নান, আহার এবং অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম একত্র একভাবে সম্পন্ন হওয়ায় চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের সমতা এবং এক ধর্ম্মপরিবার সংগঠন সহজে হইবে; এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার অদূরে জয়গোপাল সেন মহাশয়ের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে ভারত-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় (১২৭৭ সন ফাল্গুন মাস)। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামী মহাশয় উহাতে সপরিবারে প্রবেশ করেন।

"উক্ত আশ্রমে প্রাতে অন্তঃপুর-সংলগ্ন পুষ্করিণীতে মহিলাগণ এবং

অবস্থায় একদিন স্বপ্নে গঙ্গার জগন্নাথ ঘাটে এক সাধুর দর্শন পান। যেন ঐ সাধু তাঁহাকে ঔষধ দিলেন। তিনি পরে উক্ত ঘাটে সত্যই ঐ সাধুর দেখা পাইয়া ঔষধ চাহিয়াছিলেন; এবং সন্ন্যাসীর প্রদত্ত ঔষধে কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করিয়াছিলেন।

বহিঃস্থিত পুষ্করিণীতে পুরুষগণ একত্র মিলিত হইয়া স্নান করিতেন। তৎপর কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণ পূর্ব্বক উপাসনা গৃহে সকলে সমবেত হইতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হইয়া যখন ভগবানের চরণতলে গমন করিতেন, তখন সমুদয় গৃহ স্বর্গের শোভায় পূর্ণ হইত। উপাসনান্তে নারীগণের নির্দ্দিষ্টস্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুরুষগণ একত্র ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে যাঁহার যাহা দিবসের কার্য্য তাহাতে নিযুক্ত হইতেন। অপরাহ্নে সকলে সমবেত হইয়া সৎপ্রসঙ্গে সুখে সময় ক্ষেপ করিতেন। সে সময়ে নরনারীর মুখে যে কি এক উৎসাহ উদ্যমপূর্ণ স্বর্গীয় নবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।" *

ভারত-আশ্রম এক সময়ে কাঁকুড়গাছির উদ্যানে উঠিয়া যায়। ঐ সময় তাঁহাদিগকে ঘোর অভাবের মধ্যে বাস করিতে হইত। আশ্রমে যে সমস্ত পরিবার বাস করিতেন তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। আহার্য্য দ্রব্য একস্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে প্রেরিত হইত। গোস্বামী মহাশয় শাশুড়ী, স্ত্রী এবং শিশুসন্তান লইয়া আশ্রমবাটীতে বাস করিতেন। কোন সময় এমনও হইয়াছে যে তিন দিন তাঁহাদের আহারের সংস্থান হয় নাই। শিশুদের পথ্যের সংস্থান কোনরূপে হইলেও তাঁহারা অনাহারে কাটাইয়াছেন। পরে আহারের সংস্থান হইলেও উপস্থিত অতিথির সহিত তিনজনের খাদ্য ছয়জনে ভাগ করিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছেন। †

ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে পুনরায় প্রচারকগণ ধর্ম্মপ্রচারে

---

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

† শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু কথিত।

মনোযোগী হইলেন। গোস্বামীমহাশয় ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, কাছাড়, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি স্থানের প্রচারভার গ্রহণ করেন।

এই সময় ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় কোন লেখক প্রচারকদিগকে মূর্খ অনভিজ্ঞ, স্বাধীন-চিন্তা-বিহীন, অনুদার, উৎসাহহীন প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া একখানি পত্র প্রকাশ করেন। মিরার সম্পাদক উক্ত পত্রের সমর্থন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করায় ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক উহার প্রতিবাদ করেন। গোস্বামী মহাশয় ধর্ম্মতত্ত্বের ঐ মন্তব্য লক্ষ্য করিয়া প্রচারক জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে লেখেন ;—

"সাধরণ লোকে প্রচারকদিগকে মূর্খ প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতেছে, তাহার প্রতিবাদ করাতে প্রচারকের ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে। প্রচারকদিগকে গালি দিউক কিম্বা প্রহার করুক তাঁহারা অম্লানবদনে সহ্য করিবেন। যাঁহারা নিন্দা করেন তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য দয়াময় পিতার নিকট সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রচারকগণ কখনই আপনার ইচ্ছাতে কি আপনার বলে ধর্ম্মপ্রচার করেন না। দয়াময় পিতা দৃঢ়রূপে আদেশ করিলে এবং উপযুক্ত বল বিধান করিলে তাঁহারা বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন। কোন মানুষকে পাপ করিতে দেখিলে অশ্রুপাত করিয়া প্রার্থনা করেন। বাস্তবিক মহামারী-পীড়িত ও দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে দেখিলে যেরূপ দয়া হয় ধর্ম্মহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে দয়া হয়। সেই স্বর্গীয় দয়া হৃদয়ে প্রকাশ হইলে মূর্খ কৃষক, জ্ঞানহীন বালক কিংবা অবলা নারী ব্যাকুল হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রচার না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। প্রচারকগণ এইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে অস্থির হইয়া দয়াময় নাম ঘোষণা করেন। তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। দয়াময় নামের গুণে, সত্যের অসীম পরাক্রমে জগতে ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। মনুষ্যের সাধ্য কি তাহা জগতে প্রচার করিতে পারে ?

কতিপয় ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রচারকগণ যাঁহাদের জন্য দিবানিশি অশ্রুপাত করিয়াছেন এখন তাঁহারা উপযুক্ত হইয়া যদি প্রচারকদিগকে নির্য্যাতন করেন তথাপি প্রচারকগণ প্রাণান্তেও তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন না। কারণ ভ্রাতাদের ক্রোধে ও উদ্ধতভাবে যদি স্বর্গীয় সম্বন্ধ তিরোহিত হয়, তাহা অপেক্ষা অবিশ্বাসের কার্য্য আর কিছুই নাই।

সাধন ভজন না থাকিলেই মনুষ্য ঘোর সংসারী হইয়া পড়ে। সাধন দ্বারা মন বিনীত হয়, সর্ব্বদা দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বরচরণ পূজা করিতে অভিলাষ হয়। ভ্রাতা ভগিনীদের পদানত থাকিতে ইচ্ছা করে। সাধনহীন মন অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া সকলকেই আঘাত করে, অকৃতজ্ঞ হইয়া উপকারী ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করে।

ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ দেবতা নহেন, তাঁহারা মনুষ্য; মনুষ্য দোষগুণ মিশ্রিত। এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা প্রচারকদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়া থাকেন। অতএব প্রচারকদিগের দোষ থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। প্রচারকদিগের যদি দোষ দেখেন তবে দয়াপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। যাঁহাদিগের দোষ দেখিবেন সদ্‌ভাবে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের দোষ প্রকাশ করিয়া সংশোধন করুন।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক ভ্রাতৃগণ, আপনাদের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, একবার দেখুন ব্রাহ্মসমাজে সাধন না থাকাতে ব্রাহ্মগণ শুষ্ক হইয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অনেকের শুষ্কতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উপাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে উপাসনা লইয়া উপহাস করিতেছেন। ঈশ্বরের আদেশ, বিশ্বাস, করুণা এই সকল মুক্তিপ্রদ সত্যে অবিশ্বাস করিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন।

ঈশ্বরদর্শনকে কল্পনা মনে করিয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা অনন্তকালের একমাত্র অবলম্বন, সেই উপাসনা, আদেশ, করুণা-দর্শন প্রভৃতির প্রতি যাঁহারা অবিশ্বাস করিলেন, তাঁহাদের অসহায় শোচনীয় জীবন স্মরণ করিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়। ব্রাহ্মদিগের পরিণাম যদি এইরূপ অবিশ্বাসে পরিণত হয়, তবে জগতের লোক কোন্ সাহসে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? এখন যাহাতে ব্রাহ্মগণ সাধনভজন করিয়া বিনীত হন, পরিত্রাণার্থী হন তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন। লোকে গালি দিউক কি প্রহার করুক, অম্লানবদনে তাহা সহ্য করুন। যদি আপনারা বিরক্ত হন, অভিমানী হন, তবে নিশ্চয়ই আপনাদেরও পতন হইবে। দয়াময়ের চরণে আপনারা জীবন বিক্রয় করিয়াছেন, সে জীবনে পিতার সন্তানদিগের সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং ভ্রাতা ভগিনীগণ যাহা বলিবেন তাহা সত্য হইলে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। প্রতিবাদের ভাব আমাদের মনে যেন স্থান না পায়।

আপনারা প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত না থাকিলে দয়াময় পিতা স্বর্গের অমূল্য সম্পত্তি আপনাদিগকে প্রদান করিবেন না, বরং যাহা দিয়াছেন তাহাও কাড়িয়া লইবেন। সেই স্বর্গীয় রত্ন অন্তরে না থাকিলে মন শুষ্ক হয়, ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাস থাকে না, নির্জ্জনে ভ্রাতার নিন্দা করিলে সুখ হয়, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না, উপাসনা পর্য্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়ে। উপাসনা সাধন না থাকিলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক হইবে, কেহ পৌত্তলিক হইবে। কারণ উপাসনায় শান্তি না পাইলে কি লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অবস্থিতি করিবে। পরিশ্রম না করিলে পিতার নিকট কেহ এক কপর্দ্দকও পাইবেন না। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, আসুন আমরা ব্রহ্মসাধনে প্রাণমন উৎসর্গ করি। সকল প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হইয়া শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে।" *

* ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৯৪।১লা আষাঢ়)

১২৭৯ সনের শ্রাবণ মাসে গোস্বামী মহাশয় উত্তর বঙ্গের রংপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচারে গমন করেন। রঙ্গপুরের প্রচারবিবরণ সংক্ষেপে মুদ্রিত হইয়াছিল। উহা হইতে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি;—

২১ শ্রাবণ প্রাতে রংপুর ব্রাহ্মসমাজে সমবেত উপাসক-মণ্ডলীর নিকট 'উপাসনা ও উপাসনার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা (উপদেশ) হয়। "এই বক্তৃতা দ্বারা অনেক দুষ্কর্ম্মা ও পতনশাল ভ্রাতার হৃদয় প্রবলরূপে আহত হইয়াছিল, অনেক নির্জীবহৃদয়ে শান্তি পবিত্রতা আসিবার কারণ হইয়াছিল, উপাসনা যে অন্নপানের ন্যায় অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা অনেক ভ্রাতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা (গোস্বামী মহাশয়) এই দুর্দ্দিন বর্ষাকালে নানাপ্রকার ক্লেশরাশি সহ্য করিয়া সুদুর্গম নদনদী সকল অতিক্রম পূর্ব্বক এই দূরদেশে কেবল আমাদিগের দুঃখ দেখিয়া আগমন করিয়াছেন। হে ভ্রাতৃগণ ইহা তোমরা বিস্মৃত হইও না।"

ঐ দিন সায়ংকালে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন সহকারে উপাসনা এবং পরকালে বিশ্বাস সম্বন্ধে একটী "সুদীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা" হয়। "ইহা শুনিয়া অবধি সকলের পাপের প্রবৃত্তি কমিয়াছে, পরকালের জন্য জীবন পবিত্র করিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে।"

পরদিন প্রাতে মন্দিরে উপাসনা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। "অদ্যকার উপাসনায় আরাধনা, ধ্যান, কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসনার অঙ্গগুলি এমন গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হয় যে সমাগত সভ্যগণ অনেকেই অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন।" সন্ধ্যার পর পুনরায় সামাজিক উপাসনা হয়। "অদ্যকার ভ্রাতৃভাব, ঈশ্বরপ্রীতি, উৎসাহ, অতি পবিত্র ও গম্ভীর। ভ্রাতৃগণ কতকাল যেন অনাহারে ছিলেন, অদ্য প্রেমান্ন ও পিতার কৃপাবারি প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।"

২৪ শে শ্রাবণ কাকিনার জমিদার শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায়ের বাড়ীতে 'জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতার সামঞ্জস্য' বিষয়ক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা হয়। উক্ত বক্তৃতায় সুরাপান, ব্যভিচার, উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার অনুকূলে অনেক সুযুক্তির অবতারণা করা হয়। বক্তৃতান্তে তথাকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু দ্বিতীয় দিন পুনর্ব্বার সভা হয় এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ২৭ শে শ্রাবণ দ্বিতীয় সভার দিন নির্দ্ধারিত হয়। মুন্সেফ বাবুর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কেহ কেহ বক্তাকে এই অভিপ্রায়ে সাবধান করিলেন যে, তিনি যেন উক্ত সভায় উপস্থিত না হন। কিন্তু "তিনি ঈশ্বরের কার্য্য করিতে আসিয়া অপমান সহ্য করিতে অশক্ত নহেন" এই জন্য সভায় যাইতে নিরস্ত হইলেন না। যথাসময়ে সকলে সভাস্থ হইলেন। "ইতিমধ্যে ব্রাহ্মেরা পরাস্ত হইবেন মনে করিয়া হিন্দু ভ্রাতাদের মধ্যে মহা আনন্দের পরিচয় পাওয়া গেল, এবং মুসলমান ভ্রাতারাও যেন কৌতুক দর্শনার্থ মহা সন্তোষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"যে সকল ব্যক্তি বিজয়বাবুর বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই তাঁহারা যেন বিরুদ্ধমত প্রকাশ না করেন, কেননা তাহা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। ইহাতে মুন্সেফবাবু "আমার আহুতসভা" এইরূপ অহঙ্কার-সূচক বাক্যে পূর্ব্বোক্ত বক্তাকে বাধা দিয়া বিজয়বাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—(১) জ্ঞান, ধর্ম্ম, সভ্যতার সামঞ্জস্য করা যায় না, তাহার প্রয়োজনও নাই (২) ধর্ম্মশিক্ষাদ্বারা জনসমাজকে ধার্ম্মিক করিবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্ম কখনও লোকদিগকে সুখী করিতে পারে নাই; উহা কেবল অশান্তি ও অসদ্ভাব আনয়ন করে। (৩) ব্যভিচার সুরাপান ইত্যাদি যখন সভ্য-সমাজে দৃষ্ট

হইতেছে তখন উহা উঠাইবার যত্ন করা নিষ্প্রয়োজন। (৪) পাপপুণ্য বলিয়া কিছু নাই, যাহাতে সুখ-সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয় তাহাই পুণ্য, তদ্বিপরীত পাপ।"

বক্তা এইরূপ অসার বাক্‌চাতুর্য্যে সময় কর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া, শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং জমিদার শ্রীযুক্ত জগদীশনারায়ণ চৌধুরী মুন্সেফ বাবুকে নিরস্ত হইতে ও গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহার বক্তব্য বলিতে অনুরোধ করিলেও মুন্সেফ বাবু নিরস্ত হইলেন না; বরং কর্কশ ভাষায় গোস্বামী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইহার পর তথাকার সিভিল-সার্জ্জন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষ (ডাঃ কে, ডি, ঘোষ) গোস্বামী মহাশয়কে তিরস্কার করিয়া বক্তৃতা করিলেন। এই সব কারণে উপস্থিত সভ্যাগণের সঙ্গে মুন্সেফ বাবুর প্রায় হাতাহাতির সম্ভাবনা হওয়ায় সভা ভঙ্গ হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জগদীশ নারায়ণ চৌধুরী গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার মাধুর্য্যে ও ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজগৃহে আহ্বান করিলেন; এবং ৩১ শে শ্রাবণ তাঁহার গৃহে "ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধ নিরূপণ" সূচক উপাসনা ও বক্তৃতা হইল। এইদিন উপাসনার সময় বিরুদ্ধাচারীরা হাসি, বিদ্রূপ, মুখভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল, কিন্তু "যে মহাত্মা উপাসনা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি কোন প্রকার বিঘ্নদ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইবার লোক নহেন। এইজন্য উপাসনার অঙ্গগুলি যথানিয়মে নির্ব্বাহ হইতে পারিল।"

তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—"মনুষ্যের প্রকৃতিই ধর্ম্ম। ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতিতে গভীররূপে ধর্ম্মভাব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। যতদিন মনুষ্য ও মনুষ্যহৃদয় বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাহার ধর্ম্মও

থাকিবে। পরকাল, ভক্তি, জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, দয়া, আশা, প্রভৃতি মনুষ্যের প্রকৃতি ; এবং এই গুলিই তাহার ধর্ম্ম। কোন মনুষ্য এই প্রকৃতি বা ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে পারে না। কখনও মনুষ্য প্রকৃত নাস্তিক হইতে পারে না ; তাহার প্রকৃতিই তাহাকে বলপূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। যাহারা অনবরত পাপ করে, তাহারা ঈশ্বরের কথা মনে করিতেও ভয় পায় ; এই নিমিত্ত মনে করে ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করাই ভাল। কিন্তু যাঁহার চক্ষু সর্ব্বতঃ প্রসারিত, অন্ধকার রজনীতে লুক্কায়িত হইয়া পাপ করিলেও যিনি দেখিতে পান তাঁহাকে প্রতারণা করা যায় না। মনুষ্য যখন বিপদে পতিত হয়, যখন পিতামাতা বন্ধু বান্ধব পৃথিবীর কোন লোকের দ্বারা উপকার পাইবার তাহার আশা থাকে না, যখন চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখে তখন "কোথায় দয়াময়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। অতএব মানবের ধর্ম্মভাব বিনষ্ট হইবার নহে।

মনুষ্যের ধর্ম্ম নিত্য ও সত্য, সহজ ও স্বাভাবিক। ধর্ম্মালোচনা না করিলে কিম্বা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিলে ধর্ম্মভাব মলিন হইতে পারে ; কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এই স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি, কার্য্য এই সকল অঙ্গ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মই পূর্ণ ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মে পূর্ণতা নাই। অন্য ধর্ম্মে যে সত্য আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই অংশ। এজন্য ব্রাহ্ম সর্ব্বত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিবেন। যিনি যে পরিমাণে সত্য পালন করেন সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন, তেমনি ভক্তি ও কার্য্যেরও প্রয়োজন। জ্ঞানদ্বারা সত্য, সুন্দর, মঙ্গল বিষয় নির্ব্বাহিত হয় ; ভক্তিদ্বারা ধ্যান, প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা

ও ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়; কার্য্যদ্বারা জগতের ও নিজের মঙ্গল হয়। জ্ঞানের আদর্শ প্রাচীন ঋষিতে, ভক্তির আদর্শ চৈতন্যে, বিশ্বাস ও নির্ভরের আদর্শ প্রহ্লাদে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

গোস্বামী মহাশয় যখন তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন বিরুদ্ধবাদীরা নানা প্রকার গালি দিয়া ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া বক্তৃতার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে বিনীতভাবে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেও তাহারা নিরস্ত হয় নাই। অদ্যকার সভাতেও পূর্ব্বোক্ত মুন্সেফ গোপালবাবু প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কি তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাতও করে নাই।

গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে রংপুর উপস্থিত হইলে প্রথমে তথাকার যে সমস্ত লোক তাঁহার কথা শুনিবে দূরে থাকুক তাঁহাকে স্থান দিতেও সম্মত হয় নাই, কার্য্যের আরম্ভ হইলে তাঁহাকে গালি দিয়াছে ও তিরস্কার করিয়াছে; অবশেষে তাহারাই তাঁহার মুখে "শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ" গান শুনিয়া কাঁদিয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইয়াছিল; এবং রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া দলে দলে লোক তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিয়া কত আনন্দ:অনুভব করিয়াছিল।* তিনি কেবল বক্তৃতার গুণে লোক দিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এমন নয়। "শিশির-স্নিগ্ধ কুসুমসৌরভ বক্তৃতাদ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না বস্তুতঃ তিনি তাঁহার ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তিখানি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেখাইয়া এবং আবেগময়ী ভাষাতে তাঁহার প্রাণের ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া শ্রোতৃবৃন্দের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিলেন।" তাঁহার ভক্তি, ব্যাকুলতা এবং ধর্ম্মোচ্ছ্বাসে রংপুরের লোক মুগ্ধ হইয়াছিল।

রংপুর হইতে তিনি কুচবেহার গমন করেন। তথায় তাঁহার বক্তৃতায়

* ৺হরনাথ দাস কথিত।

প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক একত্র এবং কুচবেহারে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এখানে তিনি হৃদ্‌রোগে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; এজন্য তাড়াতাড়ি শান্তিপুর হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পরিচয় হয়। পরমহংসের জীবন্ত বৈরাগ্য দর্শনে কেশবচন্দ্র বৈরাগ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে কলিকাতা আহ্বান করেন। তিনি কলিকাতা আসিয়া দেখিলেন কেশবচন্দ্র স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেছেন। যাহাতে ব্রাহ্মসমাজে বৈরাগ্য প্রবেশ করে তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। তখন কেহ বৈরাগ্যের প্রতিবাদী, কেহ সমর্থনকারী ছিলেন। ক্রমে অনেকের দৃষ্টি গভীর ধর্ম্মসাধনের প্রতি পড়িল; সাধু অঘোরনাথ যোগ ও গোস্বামী মহাশয় ভক্তি সাধন ব্রত গ্রহণ করিলেন।

পর বৎসরে গোস্বামী মহাশয় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার যাত্রা করেন; এবং বহুক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌ দেরাদুন, বেরিলি, সাজিহানপুর, লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, কাণপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রচারক্ষেত্রে কঠিন পীড়ায় তাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু ভগবৎ কৃপাতে চিকিৎসা ও সেবায় জীবন রক্ষা হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীরের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে মাঝে মাঝে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইতেন, জীবনের আশা প্রায় থাকিত না। এইরূপ অবস্থায়ও কয়েকবার কাটাইয়া উঠিলেন; এবং উঠিয়াই আবার ধর্ম্মপ্রচারার্থে দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিলেন। সেবা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে তিনি তাঁহার দেহমনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এজন্য রোগেও তাঁহার কার্য্যের বিরাম ছিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১২৮২ সনে মাঘোৎসবের পর ৫ই ফাল্গুন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সাধনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। উহাতে এই ভাব ব্যক্ত হয় যে ;—"যাঁহার মনের গতি যে দিকে বেশী প্রবল তিনি যদি সেই দিকে যাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এবং জীবন গঠিত হইবে। যাঁহার ভক্তি প্রেমের দিকে গতি তিনি ভক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ রস সাগরে মগ্ন থাকিতে যত্ন করুন। যিনি ধ্যান যোগ, বৈরাগ্য, দর্শন, শান্তি ভালবাসেন তিনি কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হউন। যিনি কেবল সৎকার্য্য দ্বারা জনসমাজের উপকার করিতে অভিলাষী তিনি সেবকের পদ গ্রহণ করুন। আপনার অন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি যে বিভাগে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন তিনি তাহা দ্বারাই মুক্তিলাভ করিবেন।"

উক্ত বক্তৃতার পর ৭ই ফাল্গুন মুক্তকেশী দেবী (ইনি গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী) সেবাব্রত এবং ১৩ই ফাল্গুন অঘোরনাথ যোগ ও বিজয়কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষার্থ সংযম-ব্রত গ্রহণ করেন। যোগ-ভক্তির সংযম-ব্রত গ্রহণ সময়ে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় ভক্ত্যর্থীর জন্য নিম্নলিখিত সপ্তদশ সংযম-বিধি পাঠ করেন ;—

প্রাতঃস্মরণ, প্রাতঃস্নান, নামশ্রবণ, নামগান, উপাসনা, বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ, রন্ধন, দরিদ্রকে অন্নদান, সেবা, পশুপক্ষী সেবা, বৃক্ষলতাদি সেবা, আহার, প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদি

---

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র হইতে সংগ্রহ।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

পরহিতার্থে পুনরাবৃত্তি, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জ্জনে স্তব ও কীর্ত্তন, সজন প্রার্থনা ও কীর্ত্তন, ভক্তদিগের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।

উক্ত বিধি পঠিত হইলে ব্রতার্থীদ্বয় সংযম-ব্রত স্বীকার করিয়া তৎপালনে পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় উপদেষ্টা আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—"ভক্তি-শিক্ষার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভ-সংকল্প সিদ্ধ করুন।" উপস্থিত প্রচারক মণ্ডলী বলিলেন;—"আমরা সকলে ভক্তি-শিক্ষার্থী ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" এইরূপে যোগ-শিক্ষার্থী সম্বন্ধেও অনুষ্ঠান হইল। উপদেষ্টা আচার্য্য কেশবচন্দ্র নিম্নলিখিত উপদেশ সহকারে ব্রত দান করিলেন;—

"তোমরা দুইজন একসময় সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। 'থাক্ পড়িয়া থাক্ সংসার' একথা বলিয়া তোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। সেবার বাহ্যিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অন্তরের সংসার, অন্তরের পাপ-বিকার পড়িয়া থাক্ এই কথা বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনে নিযুক্ত হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রসন্ন পরমেশ্বরকে দেখ নাই যাঁহাকে দেখিলে আনন্দ-সাগরে পরমযোগী, পরম ভক্তি ভাসেন। যাঁহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই ভক্তদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গম্ভীর বিধানের পরমদেবতা স্বহস্তে কার্য্য করিতেছেন, বুঝিতে পারা যায়। এই বিধানের আদিবর্ণ হইতে শেষবর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত পরমেশ্বরের হস্তের। ইহাতে কিছুমাত্র মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায়? সেই ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে তাকাইয়া দেখ বহুদূরে এই পথ অতিক্রম

করিয়া যখন তোমরা সেই স্থানে যাইবে তোমাদের প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে।

বিজয় ও অঘোর তোমরা সেখানে গিয়া দেখিবে, তোমাদের ইচ্ছা হইবে আরও উচ্চতর কোন ধামে গিয়া উপস্থিত হই। উপাসনা কেবল তীর্থ ভ্রমণ। কতক দূরে গিয়া দেখি আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ কতবার যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কতবার শেষ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিব না, বড় লোক বলিয়া সম্মান করিব না, তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীদের পদতলে ফেলিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে রাজ-বেশ দিব না, ধার্ম্মিকদের মধ্যেও গণ্য করিব না।

ব্রতদান তোমাদিগকে বড় করিবার জন্য নহে। তোমাদের স্থান ভ্রাতাদের মস্তকের উপরে নহে, কিন্তু সকলের পদতলে। যতবার তাঁহাদিগকে দেখিবে, তাঁহাদের চরণ প্রথমে দেখিবে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে। সেবার জন্য তোমরা ভৃত্য হইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইন্দ্রিয় সংযম অতি কঠিন কার্য্য ; কিন্তু যে ইন্দ্রিয় সংযম না করে সে মরে। যদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সকলই বৃথা। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দূর হও কামরিপু, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অসূয় দ্বেষ, দূর হও সংসারচক্র, দূর হও মনঃকষ্ট, দূর হও স্বার্থপরতা। ব্রহ্মবলে বলী হইয়া এই কয়েকটীকে প্রতিদিন দূর হও বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে ; তপস্যা ভূমির নিকটে আসিতে দিবে না। ব্রহ্ম শিখাইবেন কিসে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। এইরূপে ইহাদিগকে যদি দমন করিতে না পার তোমাদের পুরাতন বন্ধু পাপ তোমাদিগকে সংসারের দিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন এরূপ না হয়। প্রবল রিপু জয় করা উপহাসের কথা নহে।

মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, স্বার্থপর ইহাদিগের যোগে অধিকার নাই। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন। এই দুই জন সমুদয় রিপু বিনাশ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল। পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার শরীর মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তোমরা জান না আমিও জানি না, ঈশ্বরই জানেন, কিসে দমন হয়। পৃথিবীমধ্যে সার কর্ম্ম মন দমন করা। স্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি আসিয়া হৃদয়ের মলা পরিষ্কার করিয়া দেয়। একান্ত মনে নির্ভর করিয়া থাক, রিপুকুল বশীভূত হইবে। হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এক জন যোগ, একজন ভক্তি অনুসরণ করিবে। প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন, তোমরা জান না, আমি জানি না। তিনি প্রসন্ন হইয়া উহা প্রকাশ করেন। আমি জানাইব তোমাদিগকে, যখন তিনি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মন্ত্র আমার কথাদ্বারা তোমাদের কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে। যেখানে কণ্টক সেখানে নিশ্চিত অপবিত্রতা; স্ত্রী হউন, সন্তান হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্ম ভ্রাতা হউন, আপনার ব্রাহ্মিকা ভগিনী হউন, বিষবৎ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যে কার্য্য করিলে, যাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে, ভক্তি-প্রসঙ্গ ভঙ্গ হয়, সেই কার্য্য ও তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি দশ দিন কি এক মাস কালও একাকী থাকা আবশ্যক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে। প্রলোভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে। অন্যে যদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রত পালন করিতেই হইবে। মন যদি তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে। চিত্তের অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশা মহাপাপ। দ্বিতীয় মহাপাপ পুরাতন পাপ পোষণের ইচ্ছা। সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস।

পরস্পরের কাছে এমন ভাবে থাকিবে যে অন্যে বাধা দিলে 'আমরা ব্রত পালন করি না' এরূপ নির্ব্বন্ধ কদাপি করিবে না। এই নিগূঢ় বিধি সর্ব্বদা অপরাজিত চিত্তে পালন করিবে। যদি আদেশ পাইয়া তাহা লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহাপরাধ হইবে। অন্য প্রকার যদি অসদাচরণ হয় তথাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্য পাঁচ প্রকার দোষ আছে বলিয়া বিধি—যাহা বাচিবার উপায় এবং ঔষধ—তাহার প্রতি কখন যেন কোন প্রকার অযত্ন ও অবহেলা না হয়।

ভক্তির অনেক প্রণালী ও অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচজন ভক্ত একত্র হইয়াছেন ইহা দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে। নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি এ সমুদায় ভক্তের লক্ষণ। প্রমত্ত হওয়া বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা মনে করিবে। সামান্য নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তোমার হৃদয়ে প্রেম উথলিত হইবে। দিবসে রাত্রিতে ভক্তি তোমার স্বর্গ হইবে। ভক্তিতে আহ্লাদিত হইবে। চির-প্রসন্নতা ভক্তের লক্ষণ।

তোমরা দুই জনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তোমাদের সঙ্গে, তাঁহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর দিয়া যাহা কিছু জ্যোতির বার্ত্তা আসিবে, তাঁহারা তাহাতেই শিক্ষা লাভ করিবেন।

আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম না, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব। এই প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া এই ধর্ম্মব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাঁহারা তোমাদের নিকটে আছেন তাঁহারা তোমাদের নিকটে শিক্ষা করিবেন। কে বলিতে পারে কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন ?"

ব্রতার্থীদ্বয় (অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ) পঞ্চদশ দিবস সংযম-ব্রত পালন করিয়া ২৭শে ফাল্গুন ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে ব্রত গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় জ্ঞান-ব্রতের জন্য মনোনীত হইলেন ; এবং তিন জনের প্রতি নিম্নলিখিত নিত্য-কৃত্য ও মাসিক-কৃত্য নির্দ্দিষ্ট হইল ;—

মাসিক কৃত্য ;—পিতৃমাতৃ-সেবা, পত্নী-সেবা, বিরোধী ও ভ্রাতৃ-সেবা, সন্তান-সেবা, দাসদাসী ও দীন-সেবা, পশুপক্ষী-সেবা।

নিত্যকৃত্য ;—প্রাতঃস্মরণ, নামসাধন, উপাসনা, পাঠ, কার্য্য, সৎপ্রসঙ্গ, নিদিধ্যাসন ও চিত্তসংযম।

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপর ২৮শে ফাল্গুন হইতে ২৭শে চৈত্র পর্য্যন্ত এই বিশেষ বিধি পালনের ভার অর্পিত হইল যে তাঁহারা ;—"বৃদ্ধা, বালিকা ও নিকট সম্পর্কীয়া নারী ব্যতীত অন্য নারীর চরণ, শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে দর্শন করিবেন।"

১০ই বৈশাখ আচার্য্য কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে বরণপূর্ব্বক বলিলেন ;—"আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার স্বরূপ এই বস্ত্রাদি আপনি গ্রহণ করুন।"

বিজয়। গ্রহণ করিলাম।

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিজয়। প্রসন্ন হইলাম।

কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়। আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি।

ইহার পর কেশবচন্দ্র স্বীয় বাসগৃহ তৃতীয়তলের সম্মুখস্থ দ্বিতলে কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া স্বহস্তে রন্ধন ও ভোজন করিয়া বাস করিতে এবং কুটীরে যোগ ও ভক্তি শিক্ষার্থীদ্বয়কে প্রতিদিন অপরাহ্নে ৩ঘটিকার সময় উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত উপদেশ পরে ব্রহ্মগীতোপনিষদ্ নামে প্রচারিত হইয়াছে।

তৎপর গোস্বামী মহাশয় ও অন্যান্য সাধকগণকে সাধনের অনুকূল নিম্নলিখিত আরও কতিপয় নিয়ম গ্রহণ করিতে হইল;—

নিষেধ;—বিশেষ প্রয়োজন ও অনুমতি বিনা কানন ত্যাগ, আলস্য, উপবাস, পরনিন্দা, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, কুতর্ক, অনুমতি বিনা ফুলপাড়া।

বিধি;—অতিথি সমাগমে দণ্ডায়মান ও তাঁহার যথোচিত সেবা। বিশেষ ভার;—গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি ঘাট ও উপাসনা স্থানের পরিষ্কার করার ভার অর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায়ও আবদ্ধ হইতে হইল। 'আমি কোন বিষয়ে মনে অহঙ্কার আসিতে দিব না, আমি নারীসম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে আসিতে দিব না। আমি পরদুঃখে কাতর হইব না, আমার জিহ্বা আমোদ প্রমোদে বা অসাবধানতা বশতঃ মিথ্যা বলিবে না, আমি কাহারও হৃদয়ে শক্ত কথাদ্বারা পীড়া দিব না, চিন্তায় বাক্যেতে ও কার্য্যে আমি অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব, আমি ভ্রাতাদিগের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইব, আমি নিজের মঙ্গল, সাধুসেবা ও জগতের হিতসাধন জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে ধান্য লইব না।

২৭শে বৈশাখ (১৭৯৮ শক) যোগ ও ভক্তি শিক্ষার্থীদ্বয়ের জন্য আরও একটী অনুষ্ঠান হইল। উহা এইরূপ;—

"অন্ত হইতে আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের আশা সাধনে সিদ্ধ হইয়া আমরা গম্যস্থানে উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় একত্র মিলিত হইব।" এই কথা বলিয়া উভয়ে উভয়কে প্রণাম পূর্ব্বক কয়েকপদ একত্র গমন করিয়া পুনরায় একত্র কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিজয়কৃষ্ণ নাম গ্রহণার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেন এবং অঘোরনাথ কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। পরিশেষে আচার্য্য কেশবচন্দ্র 'হরিসুন্দর' এই নাম স্বয়ং প্রথমে তিনবার পরে দশবার অনুচ্চস্বরে বিজয়কৃষ্ণদ্বারা উচ্চারণ করাইয়া স্বয়ং শ্রবণ করিলেন। অনন্তর আচার্য্য ঐ নাম বিজয়কৃষ্ণকে কিয়ৎকাল জপ করিতে বলিলেন। জপ সাধনান্তে এই উপদেশ দিলেন;—"এই নাম চক্ষে কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম জপ করিবে, দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, রসনায় রসাস্বাদ করিবে, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে রাখিবে, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতর রাখিবে। এই নামে আপনি বাঁচিবে, এই নামে পাপীকে বাঁচাইবে। নাম সর্ব্বস্ব, ইহকাল পরকালে নাম বিনা আর কিছুই নাই। নাম সৎ, অতএব নামকে সার কর।

হে গতিনাথ, তোমার নাম কি জানিলাম না; তোমার নাম আস্বাদন করিতে দাও। নামই স্বর্গ, নামই বৈকুণ্ঠ, নাম পরাইয়া দাও। এস হে দয়াল পরমেশ্বর, নাম হার করিয়া দাও। তোমার শ্রীচরণতলে আমরা প্রণাম করি।"

গোস্বামী মহাশয় ১২৮২ সনের ১৩ই ফাল্গুন প্রথম ভক্তিসাধনব্রত গ্রহণ করেন, ১৪ই ফাল্গুন উপদেশ আরম্ভ হয়; আর পরবর্ত্তী সনের ১৪ই শ্রাবণ উপদেশ শেষ হয়। ২৬শে ফাল্গুন উপদেষ্টা কেশবচন্দ্র ভক্তি শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম

এইরূপ ;—"ভক্তিপরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখনও অনেক বাকী আছে, অপার জলে ডুবিয়া বিহ্বল হইতে হইবে। ঈশ্বরের মুখ দর্শনে এমন প্রমত্ত হইবে যে অন্যদিকে আর মুখ ফিরিবে না।"

আচার্য্যের মধুময় উপদেশাবলী এই ভক্তের জীবনে কিরূপ সার্থক হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন। ভক্তিসাধন-ব্রত গ্রহণ করিয়া ধ্যানের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। মহাত্মা কেশবচন্দ্র আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত, নিষ্ঠাবান ও যোগ-ভক্তিমার্গে অগ্রগামী উল্লিখিত সাধকগণের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যে গভীর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। উক্ত উপদেশাবলীর সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে উহা উদ্ধৃত হইল না।

ভারত আশ্রমে অবস্থান কালে যখন তাঁহারা কতিপয় ব্যক্তি নির্জ্জন-সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন অনেক সময় এমন হইত যে, অন্যেরা উঠিয়া গেলেও গোস্বামী মহাশয় বহুক্ষণ ছাদের উপর একাকী ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। ধর্ম্মসাধনে এইরূপ নিষ্ঠা তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল। ভক্তির উচ্ছ্বাসে তিনি অনেক সময় বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। আচার্য্যের উপদেশেও তাঁহার এই অবস্থার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আর সাধু সন্ন্যাসী ও উদাসীনের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বাবধি শ্রদ্ধা ছিল। এ বিষয়ে বংশের প্রভাব তাঁহাতে সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার প্রকৃতিতে ভক্তির প্রভাব যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, উহাতে পথের একজন সামান্য বৈষ্ণবও তাঁহার নিকট অনাদৃত হয় নাই। এজন্য কোন স্থানে উদাসীন সাধুর দর্শন পাইলে সম্প্রদায় বা জাতির বিচার না করিয়া তাঁহার সঙ্গেই ধর্ম্মালাপ করিতেন। অনেক সময় কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীকে ভস্মলেপিত দেহে বসিয়া থাকিতে

দেখিতেন তাঁহাদের সঙ্গেও ধর্ম্মালাপ করিতেন। সময় সময় এমন হইত যে, তাঁহাদের ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত তিলক পরিয়াই আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইতেন। তিলকাদি সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংস্কার ছিল না; একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে তিলক দিয়া সুখী হইলেন তাহাই লইলেন। যে অনুষ্ঠানে তাঁহার বিবেক বাধা প্রাপ্ত না হইত অথচ অপরে করিয়া সুখী হইত, তাহা করিতে তিনি বাধা দিতেন না। কিন্তু আশ্রমের কোন কোন বন্ধুর ইহা পছন্দ হইত না।

ইতিমধ্যে ভারত-আশ্রমে পুনঃ পুনঃ কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বাগআঁচড়া গমন করেন। বাগআঁচড়ার নির্জ্জন উদ্যান তাঁহার ধর্ম্মসাধনের নিতান্ত অনুকূল হইয়াছিল। তথাকার ব্রাহ্মগণের সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় কলিকাতার কোলাহল ও কর্ম্মবহুলতা ছিল না। এজন্য তথায় গভীরভাবে ধর্ম্মসাধনের কোন অন্তরায় তাঁহার ঘটে নাই।

"একদিন বাগআঁচড়ার কতিপয় ব্রাহ্মের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া তথা হইতে যাদবপুর গ্রামে গমন করেন। পরে সকলে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলে সন্ধ্যাকালে উপাসনায়—"পিতা গো আমাকে দেখা দাও, আমাকে দেখা দিয়া প্রাণে বাঁচাও, আমি আর যাবনা তোমায় ছেড়ে, আমায় ক্ষম এবার দয়া করে" এই গান করেন। গান করিবার সময় তাঁহার দুই গণ্ড চক্ষুর জলে ভাসিয়া গিয়াছিল, দেখিয়া কেহই চক্ষের জল রাখিতে পারে নাই।

বাগআঁচড়ায় তিনি এক বৎসরের জন্য এই ব্রত লইয়াছিলেন যে কাহারও হাতের অন্ন গ্রহণ করিবেন না, নিজে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। প্রতিদিন প্রাতে এক জোড়া করতাল লইয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া গাইতেন—'সদাই হরিবল হরিবল হরিনামের নাই তুলনা, সদাই

হরিবল।' গান শেষ হইলে বলিতেন ভিক্ষা। তখন গৃহকর্ত্তা একজনের উপযুক্ত চাউলাদি দিতেন। তিনি উহাই রন্ধন করিয়া আহার করিতেন।" *

বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের নির্জ্জন উদ্যানে দিনের পর দিন গভীর ধ্যান ও চিন্তাতে যাপন করিতে করিতে তাঁহার প্রখর আত্ম-দৃষ্টি জন্মিল। তিনি বলিয়াছেন;—"আমি যখন বাগআঁচড়া গ্রামে ছিলাম তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয়; এবং তাহাতে দেখি যে জীবনে প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা অতি হীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে; অর্থাৎ তখনও পাপাসক্তির মূল জীবিত ছিল। অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্ম্মচিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান, ধারণাদি এবং নানা দেশবিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া হায় আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়! তবে ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার আর কোন উপায়ই নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহা ব্যাধির অন্য ঔষধ নাই।" †

"এই সময় বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে একদিন নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি, হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটী জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল; এবং কে যেন বলিল 'তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস্ না, গণ্ডীর মধ্যে

* নব্যভারত ১৩২২, আশ্বিন হইতে সংগ্রহ।

† যোগসাধন।

থাকিলে ধর্ম্ম হয় না।' ভাদ্রমাসে বাগআঁচড়ায় ব্রহ্মোৎসব হইল, তাহাতে স্বর্গ হইতে প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইল। এমন অবস্থা জীবনে কখনও লাভ করি নাই।" *

তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র কলিকাতায় ভক্তদলসহ নবভক্তি তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বাগআঁচড়ায় একাকী না জানি কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন মনে করিয়া বন্ধুগণ তাঁহাকে কলিকাতা আসিয়া আচার্য্যের নিকট ভক্তি শিক্ষা করিতে লিখিলেন। এই সময় তিনি পুনরায় শুনিলেন;—"যদি ধর্ম্মজীবন চাও আর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিও না।" এই গণ্ডীর কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন:—"আমি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড়িতে গিয়া পাখায় বল পাই না, তখন বুঝিলাম ইহা গণ্ডীর পরিণাম!" *

তিনি পুনঃ পুনঃ গণ্ডীর দোষ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি হইতে বোধ হইয়াছে কতকগুলি শুষ্কমত, ক্রিয়াকলাপ, দেশাচার ও সামাজিক বন্ধনকেই তিনি গণ্ডীনামে অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য জীবন গঠনের প্রথম অবস্থায় এ গুলি নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ এই গুলিই তখনকার পথ। আর পথ না হইলে চলে না। কিন্তু পথ যে চিরদিনই সংকীর্ণ। যতক্ষণ গ্রামে, বাসভবনে প্রবেশ না করা যায়, ততক্ষণ পথের প্রয়োজন। অমরাত্মা যখন অনন্ত পরমাত্ম-সাগরে তরণীর ন্যায় আনন্দ হিল্লোলে ভাসিতে শিখিয়াছে তখন আর কি সে ডাঙ্গায় থাকিতে পারে? জলের তরী জলেই বাঁচিবে জলেই মরিবে। জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহার তরিত্ব চলিয়া যায়। প্রবল ঝটিকার উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে যদি তাহার ক্ষুদ্র বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া সে সুবিমল প্রেম-বারি পান করিতে করিতে অনন্ত মহাসিন্ধুর

* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।

অনন্ত বিশাল বক্ষে চিরদিনের মত লুক্কায়িত হইয়া যায়। কি সুখ কি আনন্দ, কি আরাম।" *

প্রকৃত কথা কিরূপে দিনযামিনী ব্রহ্মসংসর্গ-স্বর্গে বাস করিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ও পরমাত্মা-সাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ প্রেম-সুধা পান করিবেন ইহাই ভক্ত গোস্বামী মহাশয়ের লক্ষ্য।

তিনি বলিয়াছেন ;—"যখন আমি বাগআঁচড়ায় ছিলাম তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, আমি একটা ভীষণ অরণ্যের মধ্যে বাস করিতেছি। অরণ্য ঘোরতর অন্ধকার ও হিংস্র জন্তুগণের বিকট চীৎকারে পরিপূর্ণ। আমার সাথের সাথী কিছুই নাই। সে অরণ্য হইতে বাহির হইবার কোনও পথ পাইতেছিনা। যতই চলিতে যাই, পথ হারাইয়া কেবল ঘুরিয়া মরি এ কণ্টকাঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়। শ্বাপদগণ যেন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি নিরাশ্রয় হইয়া দিশাহারা হইয়াছি এমন সময় উপরে একটা আলো দেখিলাম। রাস্তায় বা দোকানের সাইনবোর্ডে যেমন একখানা হাত আঁকা থাকে সেই আলোর মধ্যে সেইরূপ একখানা হাত আঁকা দেখিলাম। হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলী আমাকে এক দিক দেখাইয়া দিতেছে। আমি সেই সঙ্কেত অনুসারে আঙ্গুল যে দিকে দেখাইতেছিল সেই দিকে চলিলাম। হাতখানি আমার মাথার কিছু উপরে উপরে আমার আগে আগে চলিল। এই ভাবে আমি অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে অরণ্য উত্তীর্ণ হইলাম। তখন সম্মুখে এক প্রকাণ্ড তরঙ্গাকুল নদী পড়িল। আমি সভয়ে নদীর তীরে দাঁড়াইলাম। কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক সেই হাতখানি নদীর উপর দিয়া চলিল দেখিয়া আমি সাহসের সহিত নদীতে অবগাহন করিলাম। প্রকাণ্ড নদী, অগাধ জল, প্রবল স্রোত, প্রলয় তরঙ্গ ; কিন্তু কিছুতেই আমার কিছু করিতে

* তত্ত্বকৌমুদী ১৩০৬ সন।

পারিল না। আমি আমার রক্ষাকর্ত্তা হাতের পশ্চাতে পশ্চাতে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলাম। সেই দিন হইতে আমি বুঝিয়াছি যে অপার্থিব হস্তের ইঙ্গিতেই আমাকে চলিতে হইবে। মনুষ্যের মতে চলিতে হইবে না।" *

কিন্তু মানুষের মতামতের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মসাধন করা সামাজিক জীবের পক্ষে কঠিন। যাঁহারা লোকের মতামতের উর্দ্ধে অবস্থান করেন তাঁহারা সাধারণ মানুষ নহেন। গোস্বামী মহাশয় মানুষের মতামতের প্রতি নিরপেক্ষ এবং অদৃশ্য দৈব হস্তের অনুসরণ করিয়া মনুষ্য-দুর্ল্লভ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাগআঁচড়ার নির্জ্জন উদ্যানে সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মের নিরাপদ ভূমি লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাতে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন "যদিও সামাজিক ধর্ম্ম মানুষকে সুখী করে, আনন্দ দেয়, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নিরাপদ অবস্থা লাভের সম্ভাবনা নাই। জীবনে এই ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও নিমগ্ন হইতে হইবে, আরও প্রগাঢ়রূপে তাঁহার সাধন ভজনে নিয়োজিত হইয়া দিবসযামিনী তৎসহবাসে বাস করিতে হইবে।"

গোস্বামী মহাশয় বাগআঁচড়ায় অবস্থান করিতেছেন, এ দিকে কলিকাতায় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ লইয়া মহা হুলস্থূল আরম্ভ হইয়াছে। স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই দল পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সব দিক শুনিয়া পরে তিনিও ঐ আন্দোলনে যোগ দিলেন। বাগআঁচড়ার কোন প্রাচীন ব্যক্তি বলিয়াছেন ;—"তাঁহাকে এই বিবাহের প্রতিবাদী হইতে দেখিয়া তাঁহার একজন ব্রাহ্মভ্রাতা কলিকাতা

* নব্যভারত ১৩০৬।

হইতে বাগআঁচড়ায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবীকে লিখিয়াছিলেন :—
"আপনি গোস্বামী মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিবেন তিনি যেন কেশববাবুর বিরুদ্ধে কিছু না লেখেন অথবা তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষাবলম্বন না করেন। এরূপ করিলে আপনারা নিরুপায় হইয়া পড়িবেন।" গোস্বামী মহাশয় উক্ত পত্র পাঠ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন :—"ইঁহারা কি পাগল হইয়াছেন? কেশববাবু কি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা না পালনকর্ত্তা? আমি কি তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি? সত্যের অবমাননা আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহে যাঁহারা প্রধান আন্দোলনকারী ছিলেন গোস্বামী মহাশয় তন্মধ্যে অন্যতম। যদিও তাঁহার প্রতিবাদ অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল তবুও এ কথা সত্য যে স্বার্থ, জয়াশা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ভাব দ্বারা তিনি কখনও চালিত হন নাই; যাহা সত্য বুঝিয়াছেন সরলভাবে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পত্রের কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিলে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

"সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। চিরকাল তাঁহারই চরণ ধরিয়া থাকিব। কোন মনুষ্যের মতে অনুমোদন করিব না। এজন্য যদি অনাহারে সপরিবারে শুকাইয়া মরি তাহাও সুখের বিষয়।"

"এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি মনে করিয়াছি, এখন হইতে একাকীই মহান ঈশ্বরের সত্যনাম প্রচার করিব। কোন দলে আর প্রবেশ করিব না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য সত্যকে রক্ষা করিবেন, প্রাণপণে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব।"

"বিদ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা, কপটতা এই সকল পাপ হইতে দূরে থাকিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র সত্য প্রচার করিব।"

"সত্যের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে; কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ, নিন্দা প্রভৃতি পাপে যেন ব্রাহ্মদিগের হৃদয় কলঙ্কিত না হয়।"

গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে বিবাহের আন্দোলন ক্রমে অত্যন্ত বিস্তৃত হইল। পূর্ব্ববাঙ্গালার ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে উহার অত্যন্ত প্রসার হইল। এ সম্বন্ধে "ঢাকা প্রকাশে" তাঁহার যে সমস্ত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল উহা হইতেও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"কেশব বাবুর সঙ্গে আমার শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই। কেবল ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বলিতে হইতেছে। আমাকে লোকে অস্থির, চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়ীভাবে তাহার অনুসরণকে কপটতা মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি।"

প্রতিবাদ ক্ষেত্রে তাঁহার দৃঢ়তার প্রমাণ স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি;—"যাঁহারা আমাকর্ত্তৃক পত্রিকায় প্রকাশিত কথা কেশব বাবুর মুখে স্বকর্ণে শ্রবণ করেন নাই তাঁহাদিগের প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই। চন্দ্রসূর্য্যের প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু আমার কথায় বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। আমি স্বকর্ণে স্বয়ং কেশববাবুর মুখে শ্রবণ করিয়াছি।"

আন্দোলন সম্বন্ধীয় তাঁহার কতকগুলি পত্র উদ্ধৃত করিয়া তৎকালে একজন বন্ধু লিখিয়াছিলেন;—"বিজয় বাবুর সরল ব্যবহার ও সৎসাহসের প্রশংসা করিতে হয়। ঐ সকল পত্রের মধ্যে এমন অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে যিনি বিজয়বাবুর চরিত্র অবগত নহেন তাঁহার বিজয়বাবুর বুদ্ধি ও সদ্ব্যবহারের প্রতি সন্দেহ হইতে পারে। এরূপ

আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি সত্যের অনুরোধে এবং ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল কামনায় নির্ভীক হৃদয়ে ঐ সকল পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।"

আন্দোলন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছিলেন ;—"বিজয় যদিও এই সংঘর্ষে কেশববাবুকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি ভবিষ্য ঘটনাবলীদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে তিনি নিজের প্রবল বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন। কোন স্বার্থ সাধন তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে তিনি নিষ্কাম যোগী ছিলেন। সাংসারিকতা বা আত্মোন্নতি তাঁহার কার্য্যকলাপের নিয়ন্ত্রী ছিল না।" *

যাহা হউক নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল ; দুইদল পরস্পর পরস্পরের কার্য্যে বহু দোষারোপ করিলেন ; এবং আন্দোলন হইতে প্রচুর বিষও উৎপন্ন হইল। অবশেষে দুইদল পৃথক হওয়ায় শান্তি সংস্থাপিত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল।

গোস্বামীমহাশয় বাগআঁচড়া হইতে কলিকাতা আসিলেন। তথায় আসিয়া তিনি কুচবেহার বিবাহের প্রতিবাদকারী দলসহ পৃথক হইয়া পড়িলেন ; এবং তাঁহাদের উদ্যোগে ১২৮৫ সনের (১৮০০ শক) ২রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। উক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার্থ যে সভা হয় গোঁসাইজী উহার প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন। এবং তদীয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগীগণ ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়মাদি নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সাম্য-মন্ত্রে দীক্ষিত মহাত্মা

* বীরপূজা, নব্যভারত

বিজয়কৃষ্ণ নিয়মতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া অতঃপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে দেহমন ঢালিয়া দিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বিন্দু বিন্দু করিয়া দেহের শোণিত, মনের বল ক্ষয় করিতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। যাহারা উক্ত সমাজ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ব্যক্তি; উক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইলে তিনিই গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম দেশীয়া বিদুষী মহিলা মিস কলেট্‌ও এই ভক্ত প্রচারককেই অগ্রণী করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক নিযুক্ত হইয়া উহার প্রভূত উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। "তাঁহার তৃষিত ব্যাকুল আত্মা, তাঁহার ভক্তিবিনয়মিশ্রিত মধুর-চরিত্র, তাঁহার দেবদুর্ল্লভ উন্নত জীবন সকলের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ও সহায় হইয়া উঠিল। তাঁহার বাসভবন শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, সৎসঙ্গ, সাধু সমাগম ও কীর্ত্তনানন্দে প্রকৃত আশ্রম-পদে পরিণত হইল।"*

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করিয়া একদিন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বেশী দিন টিকিবে না। বিজয়, শিবনাথ গেলেই উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে।" গোস্বামী মহাশয় বৃদ্ধ কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন;—"প্রতাপবাবুর ন্যায় লোক এরূপ কথা বলিতে পারেন? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি মানুষের গঠিত? উহা যে বিধাতার স্বহস্ত রচিত?" †

গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম সহাধ্যায়ী বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন;—"সাধু বিজয় ও সাধু অঘোর উভয়েই এই মহারণের পর (কুচবেহার

* তত্ত্বকৌমুদী ১৩০৬।

† স্বর্গীয় কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের কথিত।

আন্দোলনের পর) প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলেন, উভয়েরই মনে প্রগাঢ় বৈরাগ্য ভাব উদিত হইল। দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দুই দিকে ছুটিয়া বাহির হইলেন। একটী প্রাচ্যে ও একটী প্রতীচ্যে। দরিদ্রের কুটীরে, রোগীর রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে, পাপী ও তাপীর শূন্য ও হতাশ হৃদয়-মন্দিরে ব্রহ্মজ্যোতিরূপে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া দরিদ্রের দারিদ্র্য-জনিত দুঃখ, রোগীর রোগের যাতনা, পাপীর অনুতাপ-জনিত তাপ এবং শোক-তাপে দগ্ধ ব্যক্তির অন্তর্দ্দাহ বিমোচন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন জগতের দুঃখভার মোচন করিবার জন্য জগজ্জননী দুইটি জ্যোতির্গোলক ধরাপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে জ্যোতির্ম্ময় গোলক মানব হিতের জন্য মানবরূপ ধারণ করিয়া ভারতের—এই দগ্ধ ভারতের—প্রতিগৃহে গিয়া সন্তাপ হরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, আপনাদের তাপহীন বিমল জ্যোতিতে ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-গগন আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিতেছেন।”

“অঘোর ও বিজয় জীবন্মুক্ত হইয়া ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভারতবাসী সকলকেই তাঁহাদের দলে লইবার জন্য তাঁহাদের প্রাণের বলবতী পিপাসা ছিল। দুঃস্থ ভারতবাসীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহারা প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেন। তাই তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাহাদিগকে মুক্তি পথের পথিক করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন।”

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর গোস্বামী মহাশয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে (১৮০০ শক) সপরিবারে ঢাকাতে গমন করেন এবং পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার ঢাকার কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

“বিজয়বাবুর আগমনে সমাজের সভ্যগণ বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার আগমনাবধি ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা কালীন

এত লোক সমাগম হইতেছে যে মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির যেরূপ একটী বৃহৎ এবং সুন্দর গৃহ বিজয়বাবুর ন্যায় লোক আচার্য্য নিযুক্ত হওয়াতে সেই ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর উপযুক্ত কার্য্যই চলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজয়বাবু হিন্দুশাস্ত্র হইতে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করেন তদ্দ্বারা শ্রোতৃগণ বিশেষ সন্তোষলাভ এবং উপকার বোধ করিতেছেন। এমন কি পৌত্তলিকগণেরও বিজয়বাবুর উপদেশ শ্রবণ করিতে আগ্রহ দেখা যাইতেছে। বিজয়বাবুর কার্য্যের প্রতি সভ্যগণের যে কতদূর শ্রদ্ধা তাহা ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রতিমাসে বিজয়বাবুর মাসিক খরচের নিমিত্ত সমাজের নিয়মিত চাঁদার অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিতেছেন। বিজয়বাবু এখানে অবস্থান করাতে কেবল যে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজেরই উপকার হইতেছে তাহা নহে, তদ্দ্বারা পূর্ব্ববাঙ্গালার অন্যান্য স্থানেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইতেছে।”

ঢাকা অবস্থান কালে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একদিন তাঁহার নিজের জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিয়া হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন। এই সময় কুচবেহার আন্দোলনে সমস্ত বঙ্গদেশ তোলপাড়। ময়মনসিংহেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। ময়মনসিংহের কথা এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—

“১৫ই কার্ত্তিক আমি (বিজয় কৃষ্ণ) ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে গোপী বাবু বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার বাসায় বাসস্থান প্রদান করিলেন। আমি গোপীবাবুকে অনেক প্রবোধ বাক্যদ্বারা বুঝাইয়া ব্রহ্মমন্দিরের গোলমাল মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে উভয় পক্ষ হইতে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করা হউক, এবং পৃথক পৃথক দিনে উপাসনা

* বীরপূজা, নব্যভারত

করা হউক। মন্দিরহইতে তাড়িত ব্রাহ্মগণ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু গোপীবাবুদের মত না হওয়াতে কিছুই ফললাভ করিতে পারিলাম না।”

“গোস্বামী মহাশয় কয়েক দিন এখানে অবস্থান করিয়া উপাসনা, কীর্ত্তন, আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে আমাদের শুষ্ক ভগ্ন প্রাণে অনেকটা সরসতার সঞ্চার হইল। উত্তেজিত মন কিয়ৎ পরিমাণে প্রশান্ত হইল; তিনি একদিন নর্ম্মালস্কুল গৃহে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু উত্তেজনার সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন,— ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের সমাজ মানুষ ইহার কি করিবে। উত্তেজনা বশতঃ তাঁহার স্বরভঙ্গ হইল, কিছুই বলিতে পারিলেন না। গোপীবাবু বাসায় চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন ইহার পর আর আপনার গোপীবাবুর বাসায় থাকা উচিত নয়। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “কেন গোপীবাবু পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমনি আমার বন্ধু। আমি অবশ্য তথায় যাইব। গোপীবাবুও ভাবিয়াছিলেন গোঁসাই তাঁর বাসায় আসিবেন না। কিন্তু গোঁসাইকে তাঁর বাসাতে আসিতে দেখিয়া গোপীবাবু তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁর পায়ে পড়িলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।” *

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট তিনি (১) বিষয়ী প্রচারক (২) অবৈতনিক প্রচারক (৩) বেতনভোগী প্রচারকদিগের কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন ;—

“যে সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে সে সকল স্থানে স্থানীয় বিষয়ী প্রচারক দ্বারাই প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ অন্য প্রচারকের উপর নির্ভর করিলে তাঁহাদিগের ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মসাধন ক্রমেই

* ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর হইতে সংগ্রহ।

বিলুপ্ত হইতে থাকিবে। প্রচারকরূপ সম্মার্জ্জনী না পাইলে তাঁহারা হৃদয়ের আবর্জ্জনা দূর করিতে পারিবেন না।

যে সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজ নাই বেতনভুক এবং অবৈতনিক প্রচারকগণ সেই সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবেন। ইহাদ্বারা প্রচারকদিগের জীবন তেজস্বী ও ধর্ম্মপ্রবণ হইবে।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সর্ব্বসাধারণের ঘৃণা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব প্রচারকগণ স্বীয় স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। সহস্র উপদেশ অপেক্ষা সদ্দৃষ্টান্তেই অধিক উপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি স্বীয় স্বীয় জীবনকে দৃষ্টান্তস্থল করিতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের দুর্ণাম দূরীভূত হইবে।

আমরা সত্যের জন্য সংগ্রাম করিব, কিন্তু দলাদলি করিব না। এইটীর প্রতি প্রচারকদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও পবিত্রতা বিশেষরূপে প্রচার করিতে হইবে। আমরা উদার হইতে গিয়া অসত্য ও অপবিত্রতার অনুমোদন করিব না। পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া হৃদয়ের প্রশস্ততাকেও নষ্ট করিব না।

বিনয় ও মহত্ত্ব প্রচারকজীবনের ভূষণ হইবে। আমরা অহঙ্কারী হইব না, কিন্তু কল্পিত বিনয় দেখাইবার জন্য হৃদয়ের মহত্ত্বও নষ্ট করিব না। তেজস্বিতা ধর্ম্মোন্নতির প্রধান সহায়। কল্পিত ভালমানুষ হইবার জন্য আমরা যেন তেজস্বিতাকে বলিদান না করি।

ঈশ্বরপ্রেম প্রচারকের অঙ্গকান্তি হইবে। তিনি লোকের নিকট উপাসক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য উপাসনা প্রদর্শন করিবেন না, অথচ তাঁহার শরীরমনদ্বারা উপাসনার ভাব প্রকাশিত হইবে। উপাসনাই ব্রাহ্মের প্রাণ। এজন্য বিশেষরূপে উপাসনা প্রচার করা কর্ত্তব্য।

জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া সম্পন্ন করিলেও যে ঈশ্বরের উপাসনা হয়, তাহা প্রচার করিতে হইবে। এই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না হওয়াতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজকে শিক্ষিতদিগের আশ্রয় স্থান করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষিতদিগের জন্য যেমন যত্ন থাকিবে, তদ্রূপ অশিক্ষিতদিগকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া আসিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে।

কিছুদিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনেকে বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত এবং সেইরূপে প্রচারিতও হইতেছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উক্ত দূষিত ভাবকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৃহীর ধর্ম্ম ও বিষয়ীর ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ যখন একটী বৃহৎ সমাজরূপে পরিগণিত হইতে চলিল তখন ইহার মধ্যে অনেক নিরাশ্রয় পরিবারও প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তাহাদিগের ভরণপোষণের জন্য "ব্রাহ্ম দরিদ্রপরিবার ফণ্ড" নামে একটী অর্থসংস্থান সভা সংস্থাপন করা হউক। প্রত্যেক ব্রাহ্ম মাসিক আয়ের শতকরা এক টাকা হিসাবে দান করিলে এ প্রকার একটী অর্থ সংস্থান অতি সহজেই হইতে পারে।"

পরবৎসর শ্রাবণমাসে তিনি প্রচারার্থে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গমন করেন; তথায় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে কয়েকদিন উপাসনা ও উপদেশ হয়। তাঁহার "ভক্তিভাব, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও বক্তৃতার মাধুর্য্যে" স্থানীয় লোকের মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহ জন্মে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে কুমিল্লা গিয়া ধ্রুবের জীবনী, নীতি, ধর্ম্ম এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কয়েক দিন উপাসনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ব্যাখ্যা করেন। প্রতিদিন চারি পাঁচ শত লোক উপস্থিত হইত।

পৌষমাসে বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ও ফাল্গুন মাসে মহেশপুর (নবদ্বীপ) ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে গমন করেন। তাঁহার মত এই "যেখানে ব্রাহ্মসমাজ আছে কেবল সেই স্থানে প্রচার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইবে না, সর্ব্বত্র গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে হইবে।"*

পরবর্ত্তী সনে বৈশাখমাসে সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে গমন করিয়া উপাসনা, ধর্ম্মজীবন, ব্রহ্মপূজা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মপূজা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—"পরমেশ্বরকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিলে উপাসনা হইল। এই উপাসনার পর ব্রহ্মপূজা। যদি উপাস্য দেবতাকে না দেখ তবে কাহার পূজা করিবে? ব্রাহ্মবন্ধুগণ এইরূপ সত্যভাবে প্রতিদিন কি ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাক? যদি বাস্তবিক তুমি ঈশ্বরের উপাসনা কর তাহা হইলে ঈশ্বরের ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা, আনন্দ, শান্তি, মঙ্গলভাব তোমাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে দেবতার জীবন দান করিবে। হে ঈশ্বরোপাসক ব্রাহ্ম, তোমার জীবন কি প্রকার? তোমাতে কি ঐশীশক্তি অনুপ্রবেশ করিতেছে? যদি না করে তবে উপাসনা সাধন কর না। হে ব্রাহ্মবন্ধু আবার জাগ, আর নিদ্রিত থাকিও না। শরীরের এক একটী রক্তবিন্দু দিয়া জীবন্ত সত্য সাধন কর। সত্যের জন্য প্রাণ দাও, সর্ব্বস্ব দাও, দেখিবে এখনি ঐশীশক্তি আসিয়া তোমাকে বলবান করিবে। ব্রাহ্মসমাজে ঐশীশক্তি প্রবেশ না করিলে ব্রাহ্মসমাজ জাগিবে না। ব্রাহ্মসমাজে যে কয়েক দিন ঐশীশক্তি ছিল তখন ইহার আকর্ষণ ছিল ; নিতান্ত মূর্খ প্রচারকও কত শত শত পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।" †

"তিনি প্রচারার্থে যে সমস্ত স্থানে গিয়াছেন সেই সমস্ত স্থানে প্রত্যেকের

---

* তাঁহার প্রচার বিবরণ হইতে সংগ্রহ।

† পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশ ; ১৮০১ শক ৯ই চৈত্র।

ভিতর নূতন জীবন ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। শত শত লোক অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু লোকের নিকট অত্যন্ত আদৃত হইয়াছেন। নবেম্বর মাসে তিনি বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে বিশেষভাবে আহূত হইয়া গমন করেন। সেখানকার ব্রাহ্মগণের মধ্যে এক অবসাদ ও মনোমালিন্য ছিল; পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের আগমনে এবং ভগবৎ কৃপায় তাহা দূর হইয়াছে। তাঁহার গভীর প্রেম, উন্নত ধর্ম্মজীবন, প্রত্যেকের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন, সকলের মনকে বদলাইয়া দিয়াছে। ছোট বড় সকলের অনেক দিনের মনোমালিন্য দূর হওয়ায় আবার তথায় উপাসকগণ ভগবানের মন্দিরে মিলিত হইতেছেন।" *

১২৮৫ সনের আষাঢ়মাস হইতে ১২৮৭ সনের মাঘমাস পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই বৎসর তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত সমাজের আচার্য্যের কার্য্য ব্যতীত বঙ্গের নানা সহর ও গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। শত শত লোকের মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তারিত হয়।

শারদীয় উৎসবোপলক্ষে মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে পার্ব্বতী ও শিবের কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া ঢাকায় যে বক্তৃতা করেন উহা 'ব্রহ্মপূজা' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত এবং বিতরিত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যা করা তাঁহার একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। দেশের লোক-দিগকে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে বিমুখ ও তুচ্ছ ক্রিয়াকাণ্ডে রত দেখিয়া তিনি ক্লেশানুভব করিতেন। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলে 'তাহারা প্রকৃত পথের আশ্রয় লইবে, ক্রিয়ানুষ্ঠান ছাড়িয়া ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যানকে জীবনের পরম সাধন বলিয়া গ্রহণ করিবে' এই বিশ্বাসে তিনি

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়বার্ষিক কার্য্যবিবরণ হইতে সংগৃহ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

সর্ব্বদা শাস্ত্র অবলম্বন করিতেন। এইরূপ জাতীয় ভাবের প্রচার দ্বারা তিনি ফলও লাভ করিতেন। তাঁহার লিখিত 'ব্রহ্মপূজা' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"হিমাচল শিখরে মৌনব্রতধারী সদানন্দ সদাশিবকে প্রসন্নচিত্ত দেখিয়া জনগণের হিতের জন্য পার্ব্বতী ব্রহ্মপূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে শিবের উক্তি ;—"বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বাত্মা বিশ্বপতি পরমেশ্বর প্রীত হয়েন। কারণ জগত তাঁহার আশ্রিত। তিনি এক, সৎস্বরূপ, সত্য, অদ্বৈত, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সদাপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, নির্ব্বিকার। সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্যতা আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক পদার্থ পৃথক পৃথক সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। হে দেবি, তাঁহা হইতেই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই একমাত্র পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের কারণ। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এজন্য ত্রিলোকে তিনি স্রষ্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়া থাকেন। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বারি বর্ষণ করে, তরু সকল পুষ্পিত হয়, যিনি কালে কালকে নিয়মিত করেন, যিনি মৃত্যুর মৃত্যু, ভয়ের ভয় এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। তিনি তুষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট, তিনি প্রীত হইলেই জগত প্রীত। তাঁহার আরাধনাতে সকলেরই প্রীতি হয়। তরুর মূলে জলসেচন করিলে যেমন সমস্ত শাখা পল্লব সজীব হয়, তদ্রূপ তাঁহার পূজাতে সকলেই প্রীত হয়। সেই ধ্যেয়, পূজ্য, সুখারাধ্য পরমেশ্বরের পূজা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। যাঁর সাধনে কোন শ্রম নাই, উপবাস নাই, শারীরিক ক্লেশ নাই, আচারাদি নিয়মের প্রয়োজন নাই, এবং দিক, কাল, মুদ্রান্যাসেরও বিধি নাই, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিবে না ?"

"সেই ধন্য, কৃতার্থ, কৃতী, ধার্ম্মিক, যাহার কর্ণে ওঁকার মহামন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পিতামাতা ধন্য, তাহার কুল পবিত্র। তাঁহারা

রোমাঞ্চিত শরীরে এই বলিয়া গান করেন ;—'আমাদিগের কুলে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গয়ায় আমাদিগের পিণ্ড দানের প্রয়োজন কি ? তীর্থ দর্শনের প্রয়োজন কি ? শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান, জপ, হোমেরই বা আবশ্যক কি ? আমাদিগের পুত্রের সাধনে আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।' আমি সত্য বলিতেছি ব্রহ্মোপাসকের অন্য সাধনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ব্রহ্মপূজার অন্য প্রকার আয়োজনও নাই।"

ব্রহ্মপূজা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত ;—

"ব্রহ্মপূজাই জনগণের মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। অনেকে নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করা কঠিন মনে করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহা কঠিন নহে। মন নিরাকার, অথচ আমরা মনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, স্নেহ, মমতা, কামক্রোধ, লোভমোহ প্রভৃতি নিরাকার ভাবগুলিকে স্পষ্ট উপলব্ধি করি। সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপগুলিও হৃদয়ঙ্গম করা যায়।"

"ব্রহ্মপূজার সামান্য নিয়ম ;—(১) পরমেশ্বরের মহিমা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করিতে হইবে। (২) ধ্যান করিতে হইবে। তমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে গভীর অন্ধকারময় পর্ব্বত গহ্বরে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলে উভয়ের সত্তা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না ; ধ্যানের কালে সেইরূপ আর কিছু দেখিবে না, এবং মনেও করিবে না। কেবল ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ সত্তা চিন্তা করিবে। "হে পরমেশ্বর তুমি আছ" কেবল এই কথা স্মরণ করিবে। ক্রমে ব্রহ্মের আবির্ভাব ঊষার আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান করিবে। তখন শরীর মন প্রেমানন্দে পূর্ণ হইতে থাকিবে। (৩) প্রার্থনা করিয়া আত্মার অভাবগুলি দূর করিতে হইবে ; প্রার্থনা সকল অকৃত্রিম হইলে আত্মা দিন দিন উন্নত হইতে থাকে। (৪) পরমেশ্বর উপাসকের

বিবেককর্ণে কর্ত্তব্যের উপদেশ ও আদেশ করিয়া থাকেন। এজন্য প্রকৃত উপাসকের জীবন বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মপূজায় অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাকে ব্রহ্মপূজা বলিয়া গণ্য করা যায় না। (৫) ব্রহ্মোপাসক কর্ম্মহীন নহেন; সমস্ত সাধুকার্য্যকে তিনি ব্রহ্মসেবা বলিয়া প্রাণপণে সৎকার্য্য সংসাধন করিয়া থাকেন। (৬) জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ যোগে ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মপূজার মধুরতার আস্বাদন করিতে হইবে।

এই ব্রহ্মপূজাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম। শিব স্বীয় মুখে পরব্রহ্মের পূজা প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মপূজা যে কষ্টসাধ্য নহে তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। এই শারদীয় উৎসবে গৃহে গৃহে যে পার্ব্বতীর পূজা হইতেছে সেই পার্ব্বতীই ব্রহ্মপূজা জানিবার জন্য শিবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

অতএব ভারতবাসীর গৃহে গৃহে ব্রহ্মপূজাই প্রচলিত হউক। ব্রহ্ম নামের জয়ধ্বনিতে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার কম্পিত হউক। ব্রহ্মপূজার প্রভাবেই আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভ করিয়া মহাগৌরবে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমাপূজা অজ্ঞ জাতিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, আর্য্য সন্তানদিগের জন্য নহে। ব্রহ্মপূজাই ভারতকে আর্য্য সিংহাসন করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই ব্রহ্মপূজাতেই ভারতের দুঃখ দুর্দ্দিন তিরোহিত হইবে। যে দিন এই জাতীয় শারদোৎসবে গৃহে গৃহে ব্রহ্মপূজার মহামন্ত্র ওঁকার ঊর্দ্ধনাদে সমুচ্চারিত হইবে সেই শুভ দিনের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগের শুভ কামনা সুসম্পন্ন করুন।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি গোস্বামী মহাশয় উক্ত সমাজের প্রচারকের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১২৮৬ সনে তাঁহারা চারিজন—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, শিবনারায়ণ

অগ্নিহোত্রী বিধিপূর্ব্বক প্রচারকপদে অভিষিক্ত হইলেন। উক্ত সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রতিনিধিরূপে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১১ই মাঘের উপাসনার পর উক্ত অভিষেক পত্র পাঠ করেন। উপাসনায় গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—

"পশ্চিম প্রদেশ হইতে কয়েকজন ঋষি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত সত্য লাভ করেন শ্রুতি পরম্পরায় সেই সকল ক্রমে প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু লোকে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমে শ্রুতি ও বেদ পাঠই ব্রহ্মোপাসনা জ্ঞান করিয়া কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন ;—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ, শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণ ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" এইরূপে তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার রক্ষকস্বরূপ হইয়া তাহা বিশুদ্ধ ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। পরে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে রাজা রামমোহন এই ১১ই মাঘে ব্রহ্মোপাসনার পুনরুদ্ধার করেন। অদ্য আমরা তাঁহার কৃপায় এই স্থানে সকলে সবান্ধবে মিলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেছি।"

১২৮৭ সনের মধ্যভাগে গোঁসাইজী ঢাকা হইতে অবসর লইয়া বিশেষভাবে কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচারার্থে গমন করেন। সমগ্র দেশের নরনারীর নিকট মুক্তির সমাচার প্রচার করা যাঁহার জীবনের ব্রত কাহার সাধ্য তাঁহাকে স্থান বিশেষে আবদ্ধ করিয়া রাখে? পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভা তাঁহার অবসর গ্রহণে নিম্নলিখিত প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করেন ;—

"তিনি আচার্য্য নিযুক্ত থাকাতে গত দুই বৎসর কাল এখানকার সমাজের কার্য্য এমত উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল যে তাহা সভ্য মাত্রেই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন এমত লোক এখানে দেখা যাইতেছে না।"

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার কতকগুলি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিলে তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস এবং তীব্র ব্যাকুলতার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার উপদেশে লোকের মন এতদূর আকৃষ্ট হইত যে মন্দিরে স্থান সংকুলন হইত না। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান নানা শ্রেণীর লোক তাঁহার উপাসনায় আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইত। কেহ কেহ বলিত ;—"গোঁসাই যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত উপাসনা করেন এমন কাহারও মুখে শুনিতে পাই না।" তাঁহার গৃহেও দলে দলে ধর্ম্মার্থী একত্র হইতেন। মক্ষিকাদল যেমন মধুর লোভে একত্র হয়, তেমনি নরনারীগণ ধর্ম্মের জন্য সংসারের প্রবল বাসনা তুচ্ছ করিয়া তাঁহার নিকট একত্র হইত। যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের মধুরতা কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন মানুষ কি জন্য দলে দলে সাধুদের নিকট একত্র হয়।

ইতিমধ্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নামে ঘোষণা করেন। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ঐ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বোধ না হওয়াতে তিনি উহার প্রতিবাদ করেন। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ও ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে এ বিষয়ে তাঁহার দীর্ঘ ও উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল। "ঈশ্বর আদেশেই সত্য প্রচার করিতে হইবে, কিন্তু লোকের মুখ চাহিয়া নয়" এই ভাব দ্বারা চালিত হইয়া তিনি প্রতিবাদক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়াছিলেন। নতুবা সদ্ভাব রক্ষা করা সম্ভব হইত না।

ঢাকা হইতে অবসর লইয়া তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও আচার্য্যরূপে কলিকাতায় এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। কলিকাতার নিকটস্থ কোন্নগর, হরিনাভি হইতে আরম্ভ করিয়া হাজারিবাগ, গয়া, বাঁকীপুর, মজঃফরপুর, মতিহারী, গাজীপুর, যমুনিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসর তাঁহার চেষ্টায় গয়াতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। গয়ার পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন ;—

"সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের সুকৌশলে ঠিক উপযুক্ত সময়ে গোস্বামী মহাশয় গয়াতে আহূত হইলেন। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুপুরাণ, ভগবদ্গীতা, ভাগবত, উপনিষদ, আত্মপুরাণ, মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক সত্য সকল ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। দুই এক দিন শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া যাঁহারা কখনও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়কে সবান্ধবে আহ্বান করিয়া নিজ বাড়ীতে শাস্ত্রপাঠ ও সংকীর্ত্তনাদি করাইয়া সপরিবারে শুনিতে লাগিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইলেন, কাহারও কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি ও অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। ৬ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার সময় একজন প্রধান বাঙ্গালী উকিল মহাশয়ের বাড়ীতে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের প্রভেদ' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত কথা কিছুই ছিল না। গোস্বামী মহাশয় কেবল কঠোর কর্ত্তব্যানুরোধে এইরূপ বক্তৃতা যেখানে যান দিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার কিছু আমোদ নাই। গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও সরল নিরহঙ্কার স্বভাব এখানে অনেকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সহবাসে ও উপদেশাদিতে কয়েকটী আত্মার প্রকৃত উপকার হইয়াছে। ইনি ছাত্রের ন্যায় প্রায় সমস্ত দিন পাঠে মগ্ন থাকেন। ইংরেজী না পড়িলে প্রকৃত

জ্ঞান হয় না, এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিবেন। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ পরব্রহ্মের শুভ ইচ্ছায় গয়ার উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিষ্ঠার দিন সমস্ত দিবস উৎসব হইয়াছিল। তিনবার উপাসনা, উপদেশ, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, ধ্যান, আলোচনা, সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। বেদীর সমস্ত কার্য্য গোস্বামী মহাশয় সম্পন্ন করিলেন। উৎসবটী অতি মিষ্ট হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াই চলিয়া গেলেন না; আরও প্রায় একমাস থাকিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রাহ্মদিগকে ধর্ম্মানুরাগী, বন্ধুদিগকে যৎপরোনাস্তি উপকৃত করিয়া বাঁকীপুর হইয়া, মতিহারী গমন করিলেন। যাইবার সময় তিনটী বন্ধু তাঁহার সঙ্গে বাঁকীপুর পর্য্যন্ত গমন করিলেন।" *

গয়া এবং মতিহারীর প্রত্যেক স্থানে মাসাধিক কাল বাস করেন। একটি স্থানে অধিক দিন বাস করিলে লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মভাবের বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা হয়; এজন্য অনেক সময় এক একটী স্থানে অধিক দিন বাস করিতেন। মজঃফরপুর হইতে মতিহারী যাইতে শামপানি নামক গরুর গাড়ীর ঝাকুনিতে তাঁহার হৃদ্‌রোগের বৃদ্ধি হয়। মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে 'আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে ধর্ম্মোন্নতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার আবশ্যকতা ও যোগসাধন বিষয়ে উপদেশ এবং আত্মপুরাণ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী মহিলাদিগকে উপদেশ দেন। মতিহারী হইতে গাজীপুর গমন করেন। তথাকার এক সাধুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"বাবাজি বার তের বৎসর গাজিপুরে একটি গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক যোগসাধন করিয়া থাকেন। কখন কখন দুই তিন মাসও দ্বার বন্ধ থাকে। কেহ কেহ বলেন প্রতি একাদশীতে দ্বার খোলা হয়। আমরা

* তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৩ শক ১লা শ্রাবণ।

গিয়া দেখিলাম বাবাজি দ্বার খুলিবেন বলিয়া স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক অপেক্ষা করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর ঘরের মধ্যে ঠন্ ঠন্ শব্দ হইল, সকলে বলিলেন বাবাজি উপরে উঠিয়াছেন। সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, যেন দৃশ্যকাব্যের একটি সুন্দর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল। বাবাজি অতি সুন্দর পুরুষ; একটি চক্ষু নাই তথাপি তাহাতে শোভার হানি হয় নাই। বাবাজি যেন বিনয়ের ছবিখানি। এমন জীবন্ত বিনয় দেখা যায় না। বাবাজি নিজকে দাস বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ প্রশ্ন করিলে বলেন—"দাস কি জানে?" বাবাজিকে প্রশ্ন করিলাম;—"ধর্ম্ম সাধনের প্রতিবন্ধক কি?" বাবাজি অনেক বিনয়ের পর বলিলেন;—"হাম বাবাই" অর্থাৎ অহঙ্কার প্রধান প্রতিবন্ধক। একবার তাঁহাকে সর্পে দংশন করিয়াছিল, বাবাজি তিন দিবস অচেতন ছিলেন। চেতনা পাইয়া বলিলেন;—"নাগা বাবা কৃপা করিয়াছিলেন।" প্রশ্ন;—অনন্তস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মকে কিরূপে লাভ করা যায়? উত্তর;—শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাকে লাভ করিতে হয়, এক দিনে হয় না। প্রথমে নামে রুচি, তাহার পর নামে অনুরাগ, তাহার পর নামে আনন্দ; নামে আনন্দ হইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রভুর কৃপাতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।" *

প্রচারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সাধনেও তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত লেখিকা লিখিয়াছেন;—"যখন প্রচারক নিবাসে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের) শিবনাথ এবং বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে বাস করিতেন তখন প্রসন্নময়ী (শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্নী) রাঁধিতে রাঁধিতে দশবার গিয়া ধ্যানস্থ গোস্বামী মহাশয়ের মুখশ্রী দেখিয়া আসিতেন। আর বলিতেন গোঁসাইজীকে দেখিলে পূজার ফল হয়।" গোস্বামী মহাশয় তখন নিদ্রা হইতে উঠিয়া খঞ্জনী লইয়া উপাসনায় বসিতেন। ১২টা না বাজিলে আসন

* তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৩ শক ১লা কার্ত্তিক।

ত্যাগ করিতেন না। আবার আহার করিয়া পাঠ করিতে বসিতেন। একাসনে অর্দ্ধেক দিন কাটাইতেন।"

কলিকাতায় মাঘোৎসবে ১১ই মাঘের প্রাতের উপাসনায় গোস্বামী মহাশয় অনেক সময় আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। একবার উৎসবে আচার্য্যসহ উপাসকগণ ভাবে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলেন যে এ দিন তিনি নিয়মিত উপাসনা করিতে পারেন নাই; মস্তকের উপর বাহু সঞ্চালন করিয়া "এই যে আমার মা" এইরূপ শব্দ অনেক্ষণ ধরিয়া বার বার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন; আর সেই সঙ্গে মন্দিরের অসংখ্য লোকের মধ্যে এক মহা ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। যাহারা শুষ্ক মন লইয়া আসিয়াছিল সেদিন তাহাদের চক্ষুতেও প্রেমাশ্রুপাত হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন;—"ঐ দিন আরাধনার পরে সমস্বরে প্রার্থনার সময় গোস্বামী মহাশয় বলিলেন;— 'আমি আজ ও প্রার্থনা করিতে পারি না, তিনি যে আমাকে অসত্য হইতে সত্যেতে নিয়াছেন, আমি এই এখানে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং আমি আর ও প্রার্থনা কিরূপে করিতে পারি?" এই কথাগুলি তিনি এমন ভাবে বলিলেন যে মন্দিরের সমস্ত লোক বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন;—"আজ আমার নূতন জন্ম হইল, আজ আমার নাম ব্রহ্মসন্তান হইল।" তাঁহার ভাব দেখিয়া উপাসক উপাসিকাদের প্রাণ গলিয়া গিয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজের অনেক মহিলা তাঁহাকে আহ্লাদ করিয়া জন্মের টাকা দিয়াছিলেন।"

তাঁহার জীবনের এই বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনার জন্য এস্থলে বহু পূর্ব্বের একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি;—

তিনি কৃষ্ণনগরে কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন শান্তিপুরে অভয়কুমার বাগচি নামক একজন ডাক্তার বাস করিতেন।

কোন ব্যক্তি তাঁহার নাম বিকৃত করিয়া এবং তাঁহার নামে কুৎসা রটনা করিয়া একখানা পুস্তক প্রকাশ করে। ইহাতে বাগচি মহাশয় লেখকের নামে মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বহু লোককে সাক্ষীরূপে আদালতে উপস্থিত করেন। বিরুদ্ধপক্ষ গোস্বামী মহাশয়কে সাক্ষী মান্য করেন। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় হলপ করিয়া বলিতে হয় "আমি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি যাহা সত্য তাহাই বলিব।" তাঁহাকে হলপ করিয়া ঐ কথা বলিতে বলা হইলে তিনি বলিলেন ;—"আমি উহা বলিতে পারিব না। যেহেতু আমি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছি না।" ইহাতে বিরুদ্ধ পক্ষের উকীল তাঁহাকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু বিচারক বলিলেন, "নাস্তিক ব্যক্তির সাক্ষ্যও যখন গ্রহণ করা হয় তখন ঈশ্বরের নামের উল্লেখ না করিলেও আইন অনুসারে ইহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।" কিন্তু তিনি নিজেকে নাস্তিক দলভুক্ত করিতেও সম্মত হইলেন না। অবশেষে বলিলেন ;—"আমি ঈশ্বরকে সত্য জানিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি সত্য বই মিথ্যা বলিব না।" বিচারক ইহাতে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। *

প্রকৃত কথা ঈশ্বর জ্ঞান যখন যতটুকু লাভ হইয়াছে তখন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন ; কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া কি কমাইয়া প্রকাশ করেন নাই। এইজন্যই শেষজীবনে বলিয়াছেন ;—"জীবন একখানি নৌকার ন্যায়, একটানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, দুই পার্শ্বে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে, কখনও মরুভূমি কখনও পুষ্পবন। কখনও সমতল ক্ষেত্র কখনও বন্ধুর প্রদেশ। যখন যাহা দেখিতেছি তখন তাহাই বলিতেছি। যাহারা শুনিতেছে তাহারা অনেক কথারই অসামঞ্জস্য দেখিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ত আর সত্য গোপন করা যায় না?" †

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

† নব্যভারত।

বেদীতে উপাসনা কালে অনেক সময় তিনি ভাবে বিহ্বল হইতেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন;—"বিজয়কৃষ্ণ বেদীর উপর বসিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে মা মা ধ্বনি করিতেছেন আর তাঁহার সঙ্গে শত শত উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে মা মা ধ্বনি বিনিসৃত হইয়া উপাসনা মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সে দৃশ্য কখনও ভুলিব না। মর্ত্ত্যে সেই যে কৈবল্যধাম দেখিয়াছি তাহা কখনও ভুলিব না।" একবারের ১১ই মাঘের উৎসবের বিবরণে তত্ত্বকৌমুদী লিখিয়াছেন;—"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বেদীতে আরোহণ করিয়া উদ্বোধন আরম্ভ করিলেন। উদ্বোধন শেষ হইল, আরাধনা শেষ হইল, সমস্বরে প্রার্থনা হইয়া গেল, উপাসকদিগের মনে আর ধৈর্য্য ধরে না। অবশেষে উপদেশের সময় প্রাণ ফাটিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল। পাষাণ গলিয়া গেল, নরনারীর বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া চলিল; সে দৃশ্য, সে স্বর্গীয় দৃশ্য কে বর্ণন করিবে? রমণীয় উদ্যানে একেবারে শত স্ফটিক ফোয়ারা উন্মুক্ত হইলে যে শোভা হয় আজ তাহাও ভক্তির শত প্রস্রবণের নিকট পরাজিত হইল। নরনারীর প্রাণ ভেদ করিয়া ভক্তি-বারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাঠক আর নয়, সে দৃশ্য বর্ণনা করিবার প্রয়াস বৃথা, যদি সহৃদয় হও, কল্পনা চক্ষে সে চিত্র অঙ্কিত করিয়া কথঞ্চিৎ বুঝিলেও বুঝিতে পার।"

দেশে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এজন্য এই কাজে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। স্থির হইয়া কোথাও বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। ১২৯৮ সনে তিনি উত্তরবঙ্গে গমন করেন। তথাকার সৈদপুর হইতে কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন;—"গোস্বামী মহাশয়ের নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মপ্রচার দেখিয়া নিতান্ত পাষাণহৃদয়—যাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার নাই—তাহার হৃদয়েও ধর্ম্মভাবের উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। গোস্বামী মহাশয় এক্ষণ শারীরিক অসুস্থ অবস্থায় যে প্রকার আগ্রহের

সহিত ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে কে না স্বীকার করিবে যে ধর্ম্মের জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। যে কয়েক দিন তিনি এখানে ছিলেন সে কয়েকদিনই তাঁহার কৃত পরব্রহ্মের উপাসনায় আমরা এ জীবনেই স্বর্গ ভোগ করিয়াছি। এক দিন অত্রস্থ 'উন্নতি বিধায়িনী' সভাগৃহে মহানির্ব্বাণতন্ত্র পাঠ ও একটী বক্তৃতা করেন। পরব্রহ্মের পূজাই যে শ্রেষ্ঠ এবং আর্য্যধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা ঐ বক্তৃতাতে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।" *

হৃদ্‌রোগে সময় সময় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তবু ব্রত সাধনে অবহেলা ছিল না। ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কোন বাধাই তিনি মানিতেন না। অসুস্থ দেহেও নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার ও সাধনভজনে যাপন করা যে এক অসাধ্য সাধন তাহা কে না স্বীকার করিবেন। ভগ্নদেহ লইয়াও তিনি মাঘোৎসবের পর হইতে কয়েক মাসে মুরশিদাবাদ, শান্তিপুর, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, আজিমগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, গয়া, গাজিপুর, কাশী, বৃন্দাবন, বোয়ালিয়া প্রভৃতি বহু সহরে উপাসনা, বক্তৃতা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করেন। কোন কোন স্থানে মাসাধিক কাল বাস করিয়াও প্রচার করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিলে মানবের প্রাণে এমন একটী অবস্থার উদয় হয়, যে অবস্থায় ভগবানের জন্য নিতান্ত অধীরতা জন্মে,

* তত্ত্ব কৌমুদী ১৮০৪ শক, ভাদ্র।

তাঁহাকে ভাল করিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি হয় না। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলান্বেষণের ন্যায় এই অবস্থায় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি সর্ব্বত্র তাঁহার অন্বেষণ করেন ; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ, নদী, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, তরু লতা সকলই তখন তাঁহার শিক্ষাস্থল হয় ; সকলের দ্বারেই তিনি ভিক্ষার্থী হইয়া উপনীত হন। গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান অবস্থা এই প্রকারের।

তিনি যদিও অনেক সময় ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়াছেন, প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা বন্দনা করিয়া ভূমানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন, তবুও তাঁহার হা হুতাশ যায় নাই, তবুও তাঁহার আর্ত্তনাদ কাতরতা দূর হয় নাই। কারণ তাঁহাকে দীর্ঘকাল হৃদয়ে রাখিতে পারেন না। মন মাঝে মাঝে যেন কোথায় পলায়ন করে। কিন্তু সুধাসাগরে একবার ডুবিয়া আবার ভাসিয়া কে সুখী হইতে পারে? ভূমানন্দের আস্বাদ একবার পাইয়া কে তাহা ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারে ? লোকে বলে ;---"যে ছেলে যত খায় সে ছেলে তত লালায়।" এই জন্যই ত নিমাই "কৃষ্ণরে বাপরে কোথা গেলিরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন ; ভূমিতে দেহ লুণ্ঠিত করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন। "একবার যাঁহাকে দেখিয়াছি তাঁহাকে ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে চাই। ভক্ত যোগী যাঁহাকে হৃদয়ে পাইয়া চিরদিনের তরে আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকেন তাঁহাকে ভাল করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই।" গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান সময়ের ব্যাকুলতার ইহাই কারণ।

যাঁহার সংসর্গে পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ লাভ হইল, কিরূপে তাঁহার সঙ্গ স্থায়ী হইবে, এখন তাহাই লক্ষ্য হইল। ভাবিলেন ;—'নিরাপদ ভূমি না পাইলে আমার ত কিছুই পাওয়া হইল না ; মহাসিন্ধুর গভীর নীরে নিমজ্জিত না হইলে আমার জ্বালা দূর হইবে না।' এই চিন্তায় সমাজপ্রিয়তা, বন্ধুজনপ্রিয়তা, স্বজনপ্রিয়তা সকলই তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ

বোধ হইল। বলিলেন ;—"আমি হিন্দুসমাজও চাই না, ব্রাহ্মসমাজও চাই না, খৃষ্টানসমাজও চাই না। আমি কোন দলাদলিই চাই না। কেবল সেই প্রাণের দেবতাকে চাই।" এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে লোক-নিন্দা ও লোকপ্রশংসা হইতে মুক্ত করিল। অনন্যমতি হইয়া সেই এক অনন্যগতির অনুসন্ধানে গভীর অভিনিবিষ্ট হইলেন। বলিলেন ;—"তোরা বল্ আমার সে কোথায় ? তোরা যে গালি দিস্, তোরা কি বলিতে পারিস্ আমার অন্তরে কি জ্বালা ? যদি না পারিস্ তবে তোরা যত বলিস্ বল্ আমার প্রাণ কিছুতেই সুস্থ হইবে না।" বলিলেন ;—"সংসারের কেহই আমার নয়। পুরাতন বন্ধুদিগের নিকট যদি আমাকে বিক্রয় করিতাম, তবে আমি এখন কোথায় দাঁড়াইতাম ? তবে আমার কি গতি হইত ? সংসারে যাঁহারা বন্ধু ছিলেন যদি আমি তাঁহাদের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিতাম তবেই বা আমার কি গতি হইত ? না, না, সংসারের কেহই আমার সঙ্গী নয়। সেই পরম সুহৃদই আমার নিত্য সহায়।" এই বলিয়া তিনি সেই একের সন্ধানে সমগ্র হৃদয় মন নিয়োজিত করিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, প্রবল বারিরাশি যেমন সম্মুখের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া নিম্নাভি-মুখে গমন করে, সমুদ্রে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির হয় না, তাঁহার ব্যাকুলতাও সেইরূপ সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে লইয়া মহা সিন্ধুপানে চলিল। গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে সুস্থির হইতে দিল না।

চির দিনই সাধু, সন্ন্যাসী এবং উদাসীনের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যখন যে সাধুর দর্শন পাইতেন তাঁহার সঙ্গে মিশিতেন। এই প্রকারে সহস্র সহস্র সাধুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের কেহ তাঁহাকে দলভুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের নিকট যতটুকু শিক্ষা করিবার তিনি তাহা

করিতেন। তিনি বলিয়াছেন ;—'ঐ সকল সাধুর মধ্যে অতি অল্প লোক প্রকৃত ধর্ম্মার্থী ; অনেকেই ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, অথবা অপরবিধ ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য লালায়িত রহিয়াছেন।' উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি যোগী, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, উদাসীন ইত্যাদি ধর্ম্মসাধকগণের সহিত কতই না ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়াছেন ; এবং বিভিন্ন দলের সাধকগণের পরামর্শে বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছেন ; ও আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগের নানা প্রক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার আশা চরিতার্থ হয় নাই। এই সময়ের অবস্থা এইরূপ বলিয়াছেন ;—

"পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আসি। তথায় করুণাময়ের কৃপায় অনেক সত্য ও প্রভূত উপকার লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার অল্প শক্তিতে যে পরিমাণ সম্ভব তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়াও লইলেন। তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের সেবায় জীবন ধন্য হইল। ক্রমে অনেক বিপদ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্য লাভে সমর্থ হইলাম। উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণাদি করিতে শিখিলাম, এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না ; কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনাসময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম ; প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম সত্য, কিন্তু কেন জানি না এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। অনেক সময়ই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাটাইতে হইত ; এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত। তখন নানাস্থানে ঐ ঔষধির অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্ম বন্ধুর

সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম ও তাঁহাদের নিকট বিস্তর ধর্ম্মকথা ও অনেক উপকার পাইলাম; কিন্তু তাহাও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিল না। আমার অন্তরের বস্তু সেখানেও পাইলাম না। তখন নানা স্থানে ভ্রমণ করিলাম। অঘোরপন্থীদের কাছে গেলাম; তাঁহারা সাধক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। কাপালিকদিগের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমানফকির এবং বৌদ্ধযোগী সকলের নিকটই গেলাম কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না।" *

শুনিয়াছি তিনি কর্ত্তাভজা দলে মিশিয়া তাঁহাদের সাধনের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে তাঁহাদের অনেক সেবা করেন, ও প্রাণায়াম তাঁহাদের সাধনের মুখ্য অঙ্গ জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তৎপর বাউল সম্প্রদায়ের রহস্য জানিবার জন্য বহরমপুরের নিকটস্থ কোন সাধক মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদেরও অনেক সেবা করেন; কিন্তু মলমূত্র সেবন তাঁহাদের সাধনের অঙ্গ জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গও পরিত্যাগ করেন।

শুনিয়াছি ইতিমধ্যে কলিকাতায় একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মালাপ হয়। আলাপে উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট হন। গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া উক্ত সন্ন্যাসী একদিন সাধারণব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আসিয়া তাঁহার উপাসনায় যোগদান করেন। উপাসনান্তে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হয় তাহাতে তিনি প্রথমে গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। তখনও তিনি গুরু করণের সপক্ষ ছিলেন না। অবশেষে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষার্থী হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁহাকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন;—'তোমার

* যোগসাধন।

গুরু অন্য ব্যক্তি।' ইহার পর নাকি তিনি দার্জ্জিলিং গিয়া অপর একজন সন্ন্যাসীর নিকটও দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও ঐরূপ উত্তর দেন।

ইহার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে প্রচারার্থে গয়া অভিমুখে যাত্রা করেন (১৮০৩ শক, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ)। শশীবাবু তাঁহাদের প্রচার বিবরণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম;—"আমরা প্রথমে মধুপুরে যাই; তথায় প্রায় পনর দিন উপাসনা, কীর্ত্তন, আলোচনায় অতিবাহিত হয়। গোঁসাইজীর প্রাণস্পর্শী উপাসনা, আলোচনা এবং মধুর সংকীর্ত্তনে প্রতিদিন সায়ংকালে বহুলোক একত্র হইত; কীর্ত্তনে তিনি প্রায়ই আত্ম-হারা হইতেন। কীর্ত্তন উপাসনাদির সময় ব্যতীত অধিকাংশ সময় তিনি জঙ্গলে ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন; হিংস্র জন্তুর ভয় থাকা সত্ত্বেও দিবাবসানেও গৃহে ফিরিতেন না।

তৎপর আমরা পচম্বাতে গিয়া শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু মহাশয়ের গৃহে কয়েকদিন বাস করি। তথায় প্রতিদিন দশটার সময় সমবেত উপাসনা হইত; গোঁসাইজীর মুখে তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীত শুনিয়া উপাসকগণের মন নিতান্ত আর্দ্র হইত। তিনি পদ্মাতে নিমজ্জিত হইয়া যে সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছিলেন এস্থানে অধিকাংশ সময় সেইটী গান করিতেন। মধুপুরে তাঁহার যে ব্যাকুলতা, ধ্যানমগ্নতা ও নির্জ্জনতাপ্রিয়তা দেখিয়া-ছিলাম, এখানে তাহার আরও বৃদ্ধি হইল। সর্পের নির্ম্মোক যেমন ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া যায়, তেমনি বাহ্য ব্যাপারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

ধ্যানানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানুশীলনেও তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; এ জন্য যখন যেখানে অবস্থান করিতেন শিক্ষার্থীর ন্যায় নিয়মিতরূপে

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। তাঁহার প্রিয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে তুলসীদাসের রামায়ণ, নানকের গ্রন্থসাহেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন অপরাহ্নে তাঁহার মুখে ভক্তি গ্রন্থের প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃগণ এরূপ মুগ্ধ হইত যে উহা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে কাহারও ইচ্ছা হইত না।

ইহার পর আমরা গয়াতে যাত্রা করি; গয়ার ৺ গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি তথায় স্থায়ীরূপে প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা গোবিন্দবাবুর গৃহে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের আয়োজন, সামাজিক উপাসনাদির বন্দোবস্ত প্রভৃতি উপায়ে তথায় ব্রাহ্মসমাজের কাজের কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা যেরূপ কার্য্যের আশা করিয়াছিলেন, অল্প দিন মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্প্রতি সম্ভবপর নহে। গোবিন্দবাবুর গৃহে ছাদের উপর প্রতিদিন সায়ংকালে ধর্ম্মসাধন বিষয়ে আলোচনা হইত; গোঁসাইজী আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন, অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। উপাসনা সময়েও তাঁহার ধ্যানে দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইত; কিন্তু সাধারণ উপাসকগণের পক্ষে এত অধিক সময় ধ্যানে বসিয়া থাকা প্রীতিকর হইত না।

ইতিমধ্যে একদিন কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দবাবু আকাশগঙ্গা পাহাড়ের বাবাজির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিলেন;—'ঐ বাবাজির নিকট গমন করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে। গোস্বামী মহাশয় বাবাজির নাম শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, এবং পরদিবস আমাকে লইয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যাত্রা করিলেন। অশীতিপরবৃদ্ধ ঐ বাবাজি আমাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া 'গাত্রোত্থান

করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সবল দেহ, সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া সহজেই আমাদের মন আকৃষ্ট হইল; গোঁসাইজী তাঁহার দর্শন মাত্র দূরহইতে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন; এবং বলিতে লাগিলেন;—"আমি নিতান্ত অজ্ঞান কিছুই জানিনা, আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিন, আমাকে ভক্তির পথ প্রদর্শন করুন।" বাবাজি তাঁহার কাতরোক্তিতে বিস্মিত হইলেন এবং পিঠ চাপড়াইয়া সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন;—"স্থির হও, স্থির হও; আমি তোমার মত ব্যাকুলাত্মা আর দেখি নাই। তোমার যদি ধর্ম্ম না হয় তবে আর কাহার হইবে? তোমার নিশ্চয়ই ভক্তি লাভ হইবে, তুমি নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভ করিবে।" আমরা বাবাজির জন্য কিছু চা'ল ডা'ল সঙ্গে লইয়াছিলাম, উহা তাঁহাকে দেওয়া হইল; তিনি আমাদিগকে বিশ্রামার্থে উপবেশন করাইয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্রামের পর নিকটবর্ত্তী নির্ঝরের নির্ম্মল বারিতে স্নান করিয়া আমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হইল; এবং চতুর্দ্দিকের পার্ব্বত্যশোভা দর্শনে আমাদের মন পরমেশ্বরের অর্চ্চনার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয় উপাসনা করিলেন। ইতিমধ্যে রন্ধনাদি সম্পন্ন হইলে আমরা আহারার্থে আহুত হইলাম। জননী যেমন অভুক্তা থাকিয়া পরম যত্নে সন্তানের পরিবেশন করে, বাবাজিও তেমনি আমাদিগকে পরিবেশন করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইলেন। পরে অন্যান্য অভুক্তদের আহ্বানার্থে শঙ্খধ্বনি হইল, যাহারা নিয়মিতরূপে সেই আশ্রমে অন্ন পাইত তাহারা আসিয়া উপবেশন করিল। বাবাজি সকলকে আহার করাইয়া পরে স্বয়ং আহার করিলেন। তাঁহার আশ্রমের এই নিয়ম ও ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হইল এই নির্জ্জন অরণ্যে তৃষ্ণার্ত্তদের জন্য সুশীতলবারি এবং ক্ষুধিতদিগের জন্য অন্নসত্র খুলিয়া ঈশ্বরই তাঁহার সদাব্রত রক্ষা করিতেছেন। ধন্য তাঁহার করুণা।

আহার ও বিশ্রামান্তে বাবাজির সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অপরাহ্নে আমরা তাঁহার পরামর্শে ব্রহ্মযোনী পাহাড়ে সাধু দর্শনে গমন করিলাম। এক সাধু তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'আনন্দ রহ'। এই সাধুর সঙ্গেও তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। সন্ধ্যাকালে আমরা নামিয়া আসিলাম; আসিতে আসিতে পথে তিনি একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন;—"এই স্থানে মহাপ্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবোদয় হইয়াছিল, তিনি কৃষ্ণ বিরহে উন্মত্ত হইয়া 'কৃষ্ণরে বাপরে কোথা গেলিরে' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন।" এইরূপে ভক্তের কাহিনী বলিতে বলিতে তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সাধু-চরিত-মালায় পাঠ করিয়াছিলাম ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইতে হয়, আজ তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম; মনে হইল ইনি প্রকৃতই ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন।

একদিন তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িতেছিলেন; পড়িতে পড়িতে বলিলেন, "শশি, আমার এরূপ ইচ্ছা হইতেছে যে গেরুয়া পরিয়া প্রচার করি। ইহাতে সুবিধাও আছে, সঙ্গে বেশী কাপড় রাখিবার প্রয়োজন নাই; অধিক কাপড় না রাখিয়া অধিক বই রাখাই ভাল।" এই বলিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন;—"আমাকে ফকির সাজাইয়া দাও।" সেই দিনই বাক্স খুলিয়া কতক কাপড় বিলাইয়া দিলেন, আর অবশিষ্ট গুলি গেরুয়া রঙে ছোপাইয়া লইলেন। গোবিন্দবাবু কোর্ট হইতে আসিয়া দেখিয়া বলিলেন;—"এ যে সব লালে লাল হইয়া গেল।"

একদিন গেরুয়া পরিয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যাইতে পথে এক জন লোক আট আনার পয়সা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। আশ্রমে উপস্থিত হইলে বাবাজি

বলিলেন,—"তোমার যেরূপ ব্যাকুলতা দেখিতেছি তাহাতে তোমার জন্য সাধন কুটীর বিশেষ আবশ্যক; আমি পাহাড়ের উপরিস্থ আমার ঐ সাধন কুটীর তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, তুমি এখানে অবস্থান করিয়া সাধন ভজন কর।" পাহাড়ে হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল, গোবিন্দবাবু এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে সাবধান করিতেন; কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে বিচরণ করিতেন তাহাতে বিন্দুমাত্র ভয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। ইহার পর আমরা প্রায়ই আকাশগঙ্গায় যাইতাম। একদিন আমাকে বলিলেন;— "শশি, তুমি ফিরিয়া যাও, আমি এখানেই থাকি"। কিন্তু আমি একাকী আসিতে সাহসী না হওয়ায় আমিও রহিলাম। আমাকে লাড্ডু খাইতে দেওয়া হইল, উহাতেই আমার উদর পূর্ণ হইল।

একদিন অপরাহ্ণে আমরা কোন জঙ্গলের পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছি, গোঁসাইজী প্রসঙ্গক্রমে সাধু অঘোরনাথের কথা উত্থাপন করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন;—"অঘোরের সঙ্গে কথা হইয়াছিল যে আমরা দুই ভাই মিলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব। কিন্তু হায় তাহা হইল না, অঘোর আমাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।" তারপর বলিলেন;—"শশি, আমি আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিব, তুমি আমার পার্শ্বে ঘুমাইয়া থাক।" এই বলিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্রদ্বারা আমাকে উপাধান করিয়া দিলেন। শিশু যেমন মাতৃপার্শ্বে নির্ভয়ে নিশাযাপন করে আমি তাঁহার পার্শ্বে তেমনি ভাবে নিশাযাপন করিলাম। আর এই জীবন্মুক্ত সাধুপুরুষ শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের পার্শ্বে সমস্ত রজনী অটলভাবে, ভয়-উদ্বেগ-বিহীন হইয়া ব্রহ্মধ্যানে অতিবাহিত করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল শীতবাত, এবং হিংস্র জন্তুর কোন প্রকার ভয় তাঁহার ছিল না। রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুনরায় আমাকে উঠাইলেন; আমরা নির্ঝর বারিতে স্নান করিয়া নির্জ্জন গুহাপ্রান্তে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা

করিলাম। তাঁহার সেই সময়ের প্রাণস্পর্শী উপাসনার স্মৃতি আমি অদ্যাপি ভুলিতে পারি নাই। এই দিন উপাসনার সময়ে খুব বড় একটী সাপ তাঁহার গলায় উঠিয়াছিল। কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই, আপনা হইতেই নামিয়া গিয়াছিল; আর তাঁহাতেও কোনরূপ ভীতির চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার ভক্তি অনুরাগে হিংস্র জন্তুগুলিও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইত; তাহাদের হিংসাবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হইত।

ইহার পর একদিন আমাকে বলিলেন;—"শশি আমি আর কলিকাতায় যা'ব না, তুমি ফিরে যাও।" এই কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম। গয়ার পথে যুবক নিমাইর পরিবর্ত্তন হইলে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সঙ্গিগণকে বলিয়াছিলেন;—"তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও আমি আর সংসারে যা'ব না। আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় চলিলাম।" ইনিও যেন তেমনি গয়ার নির্জ্জনতার মধ্যে ডুবিয়া সমগ্রমনে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত হওয়ার আশায় তথায় চিরবাসস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আর পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন;—"আমি আর কলিকাতায় যা'ব না।" কলিকাতায় তাঁহার পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সমস্ত রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রতি যেন তাঁহার কোনরূপ মায়া নাই। কলিকাতা পরিত্যাগ অবধি একবারও তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ না করায় মনে হইত তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তাই ছিল না। একদিন আকাশগঙ্গা হইতে আসিবার সময় পথে করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন;—"প্রভু, আমায় স্বতন্ত্র কুটীর দাও, স্বতন্ত্র কুটীর না হইলে আর আমার চলে না।" অবশেষে গোবিন্দবাবু প্রভৃতি তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র কুটীর নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

একদিন আমরা বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলাম। বুদ্ধের সাধনক্ষেত্র, 'নিরঞ্জনা

নদী ইত্যাদি দেখাইয়া তিনি আমার নিকট শাক্যমুনির গুণ কীর্ত্তন করিলেন ; এবং অবশেষে নিরঞ্জনাতীরে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমস্ত দিবস যাপন করিলেন। আমরা মধ্যাহ্নে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম ; কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ না হওয়ায় তিনি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিলেন না।

ইহার পর তিনি একাকী আকাশ গঙ্গায় যাইতেন ; এবং আর কলিকাতায় ফিরিবেন না স্থির করিলে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে একাকী কলিকাতায় চলিয়া আসি। অবশেষে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহাকে কলিকাতা ফিরাইয়া আনেন। এত যে সাধনশীলতা তাহার মধ্যেও তাঁহার অপরিসীম স্নেহ সর্ব্বদা আমাকে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আমি মনে করিতাম যেন মাতৃস্নেহ ভোগ করিতেছি। শাস্ত্রী মহাশয় একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ;—"বিজয়বাবুর আঙ্গুল চুষিলেও ভক্তি হয়" এবং "তিনি ধর্ম্মার্থে দ্বিতলের ছাদ হইতেও লম্ফ দিয়া পড়িতে পারেন।" গয়াতে কিছুদিন একত্র বাস করিয়া দেখিয়াছি ধর্ম্মের জন্য তাঁহার অসাধ্য কিছুই ছিল না। এইরূপ লোকের জন্মধারণে প্রকৃতই বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়।"

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তিনি এক সাধুর নিকট দীক্ষালাভ করেন। এই দীক্ষা সম্বন্ধে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ তাঁহার প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডবেদের ৩য় ভাগের ১৭৮ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ;—"গোস্বামী মহাশয় দারজিলিঙ্গের বনপ্রান্তরে যটচক্রভেদী কোন যোগীর সাধন দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটে উপদিষ্ট হইয়া, নর্ম্মদাতীরস্থ উক্ত যটচক্রভেদী যোগার গুরুদেবকে দর্শন করিতে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাবশতঃ তথায় গমন না করিয়া গয়াধামস্থ ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে উপস্থিত এবং তত্রত্য বৈষ্ণব মহান্তের নিকটে সাধন শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি বিলাসবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিবেশে তত্রত্য আশ্রমের মহান্ত পরমহংসের নিকটে প্রায় নয় মাস যাবৎ জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্মের পদ্ধতি অনুষ্ঠান সহকারে শিক্ষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার সাধনের ধনকে এত করিয়াও হৃদয়মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি এক নির্জ্জন বনপ্রদেশে হতচৈতন্য অবস্থায় কয়েক দিন পড়িয়াছিলেন। অনন্তর স্পর্শানুভবে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, জনৈক পরমহংসের ক্রোড়ে শায়িত আছেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্রোড় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই অপরিচিত পরমহংসের চরণে প্রণত ও লুণ্ঠিত হইলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন, "আপনি আমাকে আপনার আশ্রমে লইয়া চলুন, এবং আমি যাহাতে সাধনের ধনকে হৃদয় মাঝে দেখিতে পাই, সেই উপদেশ করুন্; আমি গৃহাশ্রমে আর গমন করিব না।" পরম-হংসপ্রবর বলিলেন, "বৎস! স্থির হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার স্ত্রী পুত্র, কন্যা এবং শ্বশ্রু তোমার আশ্রিত; তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইবে, এবং কিছুই সাধন করিতে পারিবে না।" গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী পুত্রাদি আছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত বহুদূরস্থ নির্জ্জন পর্ব্বতবাসী তাহা কিরূপে জানিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই নিমিত্ত বিস্মিতনেত্র হইয়া তাঁহার মুখপানে চহিয়া থাকিলেন। পরে আবার আর একটি কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন যে পরমহংস হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন "বৎস! তোমরা অনেকে মিলিয়া একখানি গৃহ উছাইয়া ফেলিয়াছ; গৃহখানি পুনরায় ছাইতে পারেন এমন একটি লোকও তোমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। যেমন উছাইয়াছ তদ্রূপ ছাইবার উপায় কর। নতুবা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে।" গোস্বামী মহাশয় পরমহংসের নিগূঢ় উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাতর স্বরে বলিলেন "ভগবন্! সে সাধ্য আমার কিছুই

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

নাই। সাধ্য লাভ করিতেই এতদিন আশ্রমে বাস করিলাম এবং এক্ষণে আপনার অনুগামী হইতেছি"। পরমহংসদেব কহিলেন "আমি মানস-সরোবর বাসী যোগী, তোমার নির্ব্বেদ জানিতে পারিয়া তিব্বত দেশ পরিত্যাগ করিয়া এই গয়াধামে উপস্থিত হইয়াছি, ভয় নাই। আমি যে উপদেশ দান করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, গৃহখানি যেমন ছিল নূতন ছাউনীতে আবার তদ্রূপই হইবে"। তিনি এই কথা বলিয়া জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি সাধনোপযোগী সহজ প্রাণায়াম শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন "আমি অদ্য হইতে তোমার সাধন সহায় হইলাম। যিনি যে কোন দেশে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাধন করেন, আমি তাঁহাদেরই সহায়তা করিয়া থাকি।" এবম্প্রকার নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারিলেন তিনি সামান্য পরমহংস নহেন। তাঁহার যে শরীর প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহাও জড়ময় দেহ নহে। পরমহংস-প্রবর সূক্ষ্মশরীরে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। অতএব তদীয় শিক্ষা সাধন শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনপ্রার্থী পুত্রাদির সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলেন।" *

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অবস্থান কালে গোস্বামী মহাশয় একদিন তাঁহার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সঙ্গে নিকটস্থ বরাবর পাহাড়ে গমন করেন। এই পাহাড়ের গুহা সকল সাধু সন্ন্যাসীর তপস্যা স্থান। তথায় এক ভৈরবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভৈরব সর্ব্বশরীরে মসি লেপিয়া ও মুখে সিন্দুর মাখিয়া বীভৎসমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র প্রস্তর ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ভীত না হইয়া স্তুতি করিলে নরমাংস

---

* শ্রীযুত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। সম্ভবতঃ ১২৯০ সালের আষাঢ় মাসে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার এই দীক্ষা হইয়াছিল।

প্রসাদ দিলেন; তাঁহারা উহা গ্রহণ করিলেন না; কিঞ্চিৎ ফল গ্রহণ করিলেন। তৎপর সাধু দর্শনের অভিপ্রায় জানাইলে ভৈরব তাঁহাদিগকে লইয়া এক প্রশস্ত গুহায় প্রবেশ করিলেন। তথায় চারিজন সাধু ধ্যানস্থ ছিলেন। দিবাবসানে তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তাঁহারা স্নানাদি করিয়া ভৈরবকে অভ্যাগতদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৈরব বলিলেন;—"ইহারা আপনাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" তৎপর তাঁহারা উক্ত মহাপুরুষদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিলেন। ঐ উপদেশের মর্ম্ম এইরূপ;—

"ধর্ম্ম এক, গম্য পথও এক। লোকের রুচি অনুসারে নানা মত নানা পথ। গম্য স্থানে উপনীত হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। দেখুন, আমারা এই চারিজন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে চলিতাম। এক জন রামাৎ, একজন নানকপন্থী, একজন কাপালী, আর আমি অঘোরী। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে মিল ছিল না; বরং ঘোর বিরোধ ছিল। পথে চলিতে, চলিতে যখন আমরা গম্যস্থানে অর্থাৎ সত্যগৃহে উপস্থিত হইলাম তখন দেখি যে আমরা চারিজন একস্থানে আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত ভিন্নতা চলিয়া গিয়াছে। ভেদজ্ঞানে হৃদয়ে যে ক্লেশ ভোগ করিতাম এখন সে ক্লেশ নাই। যতদিন গম্যস্থানে উপনীত না হওয়া যায় ততদিনই মতভেদ, দলাদলি, সম্প্রদায়।"*

দীক্ষার পর নানা স্থানে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার নানাপ্রকার ধর্ম্মালাপ হয়। পরে গেরুয়া পরিয়া সন্ন্যাসীর বেশে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বন্ধুদের অনেকের মনে হইয়াছিল বুঝি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবেন।†

---

* আশাবতীর উপাখ্যান এবং শিষ্যগণ হইতে সংগ্রহ।

† তাঁহার কোন শিষ্য বলিয়াছেন তিনি কোন পরমহংসের প্রীতিচিহ্নস্বরূপ গেরুয়া পরিধান আরম্ভ করেন।

গোস্বামী মহাশয় গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার প্রচার ও ধর্ম্ম সাধন পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল উদ্যমে চলিতে লাগিল।

কলিকাতায় অনেক সময় তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নিকট গমন করিতেন। উভয়ের মধ্যে ভাবের যোগ, প্রাণের যোগ ছিল। দেখা হইলে উভয়ের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিত, তাঁহারা আত্মহারা হইয়া যাইতেন। একদিন পরমহংস মহাশয়ের একখানা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একজন বন্ধু বলিলেন ;—"আপনি জীবন্মুক্ত, এই যন্ত্রণা ভুলিতে পারিতে-ছেন না?" উত্তর করিলেন ;—"তোদের সঙ্গে কথা বলিয়া ভুলিব, তোদের বিজয়কে আন। তাঁকে দেখিয়া আমি আপনাকে ভু'লে যাই।" একদিন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নিকট গিয়া ভাবে মগ্ন হইয়া হেটমুখে বসিয়া আছেন। পরমহংস তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ; "বিজয় তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ? দেখ দুইজন সাধু ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে একটা সহরে এসে পড়ে'ছিল। একজন হাঁ করে' সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, এমন সময় অপরটার সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটা বল্লে, তুমি যে হাঁ ক'রে সহর দেখ্‌ছ তল্‌পী তল্পা কোথায়? প্রথম সাধুটা বল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে তল্পী তল্পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ? (মাষ্টারের প্রতি) দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল এইবার খুলে গেছে।" * বলা বাহুল্য গোস্বামী মহাশয় পরমহংসের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারআশ্রমে অবস্থান কালে

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

গোঁসাইজী কতিপয় বন্ধুর সহিত আর একবার পশ্চিমে যাত্রা করেন। তাঁহারা বাকীপুর, গয়া, গাজিপুর, কাশী, অযোধ্যা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করেন। কাশীতে মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মালাপ হয়। ঐ মহাত্মা গঙ্গার চড়ায় মধ্যাহ্নকালের অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বালুকার উপর নির্ব্বিকার চিত্তে শয়ান ছিলেন। স্বামীজী মৌনী, তাই গোঁসাইজীর প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন। প্রশ্ন—উপাস্য কে, উত্তর—শিবং; প্রশ্ন—পার্ব্বতী-পতি শিব, উত্তর—মঙ্গলং; প্রশ্ন—কি করিয়া সাধন ভজন করিতে হয়? সাধু আসন, প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া করিয়া দেখাইলেন।

কাণপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর গৃহে তাঁহারা কয়েক দিন বাস করেন। প্রতিদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সঙ্গীতালাপ হইত। সময় কোন দিক্ দিয়া চলিয়া যাইত কাহারও দৃষ্টি থাকিত না। লক্ষ্ণৌতে সস্ত্রীক রামবাবু অত্যন্ত যত্ন করেন,—তাঁহার সেবার জন্য সমস্ত রাত্রি পাখা টানিবার ব্যবস্থা করেন। বৃন্দাবনের গৌরশিরোমণি মহাশয় তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস ও নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

ইহার পর গোস্বামী মহাশয় পুনরায় ঢাকায় গমন করেন। তাঁহার আগমনে তথাকার ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ও সভ্যগণের মধ্যে ধর্ম্মোৎসাহ নবীভূত হয়। তথায় প্রকৃত উপাসনা, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাস, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য ও জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন ও সামাজিক শাসন নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি পুস্তিকা এইবার তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং ছাত্রসমাজের ভার গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা, পাঠ,আলোচনা দ্বারা ছাত্রগণের নীতি ও ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

'ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন' পুস্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"যে ধর্ম্মে কোন মনুষ্যের মত, কল্পনা বা প্রভুত্ব নাই, যে ধর্ম্ম কোন দেশ বা জাতির নামে পরিচিত নহে, যে ধর্ম্ম কোন পুস্তকে বা প্রণালীতে আবদ্ধ নহে, যে ধর্ম্ম কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজাই মনুষ্য জাতির মুক্তির একমাত্র হেতু বলিয়া উপদেশ দেন, যে ধর্ম্ম কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার ভাবে বদ্ধ নহে, যে ধর্ম্ম দ্বারা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা, উদারতা, পবিত্রতা সত্যতা, নিত্যতা এই কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম চির পরিচিত থাকিবে। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। ঈশ্বর হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচ্ছিন্ন হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকেও ঘৃণা করেন না। সূর্য্য, চন্দ্র যেমন সাধারণের মঙ্গলের জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেইরূপ সাধারণের মঙ্গলের জন্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ পবিত্র, কোন পাপ এ ধর্ম্মে স্থান পাইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ সত্য। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। জ্ঞানী হইয়া যদি বিশুদ্ধ, বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক না হও তবে তোমার অপেক্ষা একজন মূর্খ কৃষকও অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। অধার্ম্মিক জ্ঞানীতে এবং ব্যাঘ্র ভল্লুকে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জ্ঞান সাপেক্ষ বিশ্বাস ধর্ম্মরাজ্যে যাইবার প্রধান অবলম্বন। সাধন এবং ব্রহ্মকৃপা সাপেক্ষ বিশ্বাস ধর্ম্মরাজ্যের প্রকৃত দ্বার। সে দ্বারে গমন না করিলে নিউটনের ন্যায় সুপণ্ডিত মনুষ্যও সহস্র বৎসর চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। ভক্তি না থাকিলে তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য করা যায় না। অন্ধ ভক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে প্রকৃত ভক্তি ব্রাহ্মদিগের ভূষণ হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে

হইবে। ব্রাহ্মগণ সর্ব্বদা বিবেকের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন। যাহা সত্য জানিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। দেবদেবীর পূজা, জাতিভেদ যাহা কিছু পৌত্তলিকতা আছে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পৌত্তলিকতার চিহ্ন উপবীত প্রভৃতি ধারণ করা মহাপাপ বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। বাহিরের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে যেমন যত্ন করিবে আন্তরিক পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে তেমনই যত্ন করিবে। রিপুগণ, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা ও বঞ্চনা প্রভৃতি পুত্তলিকার পূজা করিলে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা হয় না। প্রতিদিন ভক্তিভাবে ব্রহ্মপূজা করিয়া জীবন সার্থক করিতে হইবে। কিন্তু সেই পূজা যেন প্রণালীগত না হয়। উপাসনা কালে যতক্ষণ ঈশ্বরের আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম না করিবে ততক্ষণ উপাসনা হইল না বলিয়া বিশ্বাস করিবে।”

“নিয়ম ;—প্রতিদিন অন্যূন তিনবার ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত নিয়মানুসারে অর্থাৎ আরাধনা, ধ্যান, কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা দ্বারা উপাসনা করিতে হইবে ; প্রত্যেক ব্যক্তির সপ্তাহে অন্ততঃ একবার পরিবারের মধ্যে উপাসনা করিতে হইবে ; রোগ বা কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতি সপ্তাহে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করিতে হইবে ; শরীর এবং আত্মাকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে ; প্রত্যেকের স্ব স্ব উপাসনার সময় ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করিয়া তাহাদিগের দোষ ক্ষমা করিতে হইবে ; পরস্পরের বাসায় কিম্বা বাটিতে গমনাগমন করিতে হইবে ; ভ্রাতাদিগের মধ্যে কেহ রোগে বা বিপদে আক্রান্ত হইলে তাহাকে সাধ্যানুসারে উদ্ধার করিতে হইবে ; পরস্পরের পরিবার একত্র করিয়া পবিত্র পারিবারিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে যত্নশীল থাকিতে হইবে ; ভ্রাতাদিগের মধ্যে কাহারও কোন দোষ দেখিলে গোপনে জ্ঞাপন করিতে হইবে ;

এবং দোষী ভ্রাতা জ্ঞাত দোষ সংশোধন করিবেন; ভ্রাতাদিগের মধ্যে কেহই পৌত্তলিকতার সহিত যোগ এবং তাহাতে কোন প্রকারের উৎসাহ দান করিতে পারিবেন না; প্রত্যেক ভ্রাতা স্ব স্ব জীবন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। একমাত্র অদ্বিতীয়, পূর্ণ, মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য; তাঁহার চরণসেবাই প্রকৃত জীবন, তাঁহার আদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য করিবে না; তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সাধনে সমুদায় সংসার, বন্ধুবান্ধব বিপক্ষ, শরীর নিপাত এবং সাংসারিক ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হইলেও বিরত হইবেন না। এই নিয়মাবলী প্রতিদিন পাঠ করিয়া আত্মানুসন্ধান করিতে হইবে।"

১২৯১ সনে ঢাকার অন্যতম জমিদার প্রতাপচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সংলগ্ন রাজচন্দ্র ব্রাহ্ম-প্রচারক নিবাস নির্ম্মাণ করেন। গোস্বামী মহাশয়, সপরিবারে উক্ত গৃহে অবস্থান করিয়া কর্ম্মে ব্রতী হন।

অজস্র ধর্ম্মসাধনের মধ্যেও ঢাকাতে তাঁহার জীবনে একবার ঘোর শুষ্কতার উদয় হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হইবে ধর্ম্ম যেমন সাধন তেমনি কৃপা সাপেক্ষ। প্রকৃতি রাজ্যে যেমন অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি ধর্ম্মজীবনেও সেইরূপ উত্থান পতন। তাহাতেই ভক্তির অতি অনুকূল অবস্থাও তাঁহাকে শুষ্কতা হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারে নাই। গভীর ব্যাকুলতার জন্যই তিনি একজন শক্তিশালী যোগীর নিকট যোগসাধন গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হন। শুনিয়াছি ঢাকা অবস্থান কালে তিনি অনেক সময় গেণ্ডারিয়ার এক বটবৃক্ষতলে নির্জ্জন সাধনে যাপন করিতেন। কিন্তু তবুও শুষ্কতায় জীবনের সমস্তই বিষবৎ বোধ করিয়াছিলেন। এজন্য গুরুর প্রদর্শিত বিধি—শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম সাধন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু ইতিমধ্যে অভাবনীয়রূপে গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার

পরামর্শে নবীন উৎসাহে সাধন আরম্ভ করেন। গুরুকে বলিয়াছিলেন "আমি আর এইরূপ বৃথা নাম করিতে পারি না, কারণ ইহাতে কিছুই উপকার হইতেছেনা।" গুরু হাসিয়া বলিলেন ;—"তুমি আমার অনুরোধে নাম লইতে থাক, বিরক্তি লাগিতেছে, তাহাতে ক্ষতি কি ? ক্রমে পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিবে।"

পরে দ্বারভাঙ্গায় পুনরায় গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সকল অবস্থা জানাইলেন। তিনি বলিলেন ;—"হট্ প্রদীপ এবং * * (বেদান্তের ব্যাখ্যামূলক অন্য আর একখানা পুস্তক) আনাইয়া পাঠ কর।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"উক্ত পুস্তক কোথায় পাওয়া যাইবে" ? তাঁহার গুরু একজন পর্ব্বতবাসী সন্ন্যাসী, অথচ বলিয়া দিলেন "ঐ পুস্তক দ্বারভাঙ্গার অমুক দোকানে পাওয়া যাইবে"। তারপর, গোস্বামী মহাশয় লোকদ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া দ্বারভাঙ্গার কথিত দোকানে উক্ত পুস্তকের মাত্র এক এক খণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত পুস্তক পাঠে তাঁহার অত্যন্ত উপকার হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার যে যে অবস্থা ঘটিতেছে পুস্তকে সে সমস্ত লিপিবদ্ধ আছে। *

১২৯২ সনের আষাঢ়মাসে গোস্বামী মহাশয় স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সমাধিস্থানে ব্রহ্মোপাসনার জন্য তাঁহার পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ মিত্র কর্ত্তৃক আহুত হইয়া নবাবগঞ্জ (ঢাকা) গমন করেন ; এবং কয়েক বন্ধুতে গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তন, আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন ; তাঁহার ধর্ম্মজীবন দেখিয়া গ্রামের লোকের মধ্যে ধর্ম্মোৎসাহ জন্মিয়াছিল।

এই সনে মাঘোৎবে ঢাকায় অবস্থান করেন। তাঁহার আহ্বানে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ (হরিনাথ মজুমদার) কীর্ত্তনের দলসহ ঢাকায় আসিয়া

* নব্যভারত।

গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হন। ফিকিরচাঁদের সুমধুর ভাবসঙ্গীতে এবং গোস্বামী মহাশয়ের জীবন্ত উপাসনায় ঢাকায় ভক্তির প্রবল স্রোত বহিয়াছিল। একজন দর্শক বলেন—"সে বৎসর যে দৃশ্য দেখিয়াছি আজীবন তাহা ভুলিতে পারিব না। ফিকিরচাঁদের কীর্ত্তন শুনিবার জন্য সমাজ মন্দিরে ঢাকার সহর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মন্দিরের ভিতর, বারাণ্ডা, প্রাঙ্গন অসংখ্য লোকের জনতায় পূর্ণ হইয়াছিল। প্রবেশের পথ ছিল না, বসিবার স্থান তিলার্দ্ধও ছিল না; সর্ব্বত্র লোকে পরিপূর্ণ। দর্শক, শ্রোতা, উপাসক--গণের মুখে এক অপূর্ব্ব আগ্রহ; কি দেখিবার জন্য, কি শুনিবার জন্য যেন সকলেই উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে উপাসনার ঘণ্টা পড়িল; অসংখ্য লোকের মধ্যে গোস্বামী মহাশয় বেদী হইতে উপাসনা আরম্ভ করিলেন; মুহূর্ত্তে স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা দানতায় পূর্ণ হইয়া, আশা উৎসাহের কারণ হইয়া সকলের মন মত্ত করিয়া তুলিল। সে কথা যে না শুনিয়াছে সে কিরূপে বুঝিবে? সেরূপ করুণামাখা হৃদয়দ্রবকারী কথা আর কোথায় শুনিব?

তৎপর যখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল তখন প্রবল ভাব-তরঙ্গে মন্দিরের লোকমণ্ডলী কাঁদিয়া অধীর হইল। চক্ষুর জলে আচার্য্য, উপাসক এবং দর্শকদের মুখ ভাসিয়া গেল। বৃদ্ধ কাঁদিতেছে, যুবক কাঁদিতেছে, পুরুষনারী মিলিয়া এই সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া, কাঁদিয়া আত্মহারা হইয়াছে। সেদিন সমাজমন্দিরে স্বর্গের দৃশ্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। কাহার সাধ্য সে দৃশ্য দেখিয়াও মনকে কঠিন করিয়া রাখে? সেদিন পাষাণ প্রাণ গলিয়াছিল, পাপাসক্ত চিত্ত ঈশ্বরের কৃপা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।"

ফিকিরচাঁদের কীর্ত্তন যে কেবল সমাজ বাড়ীতেই হইয়াছিল তাহা নয়; অনেকে তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিয়াও, কীর্ত্তন শুনিয়াছিল।

ঢাকার উৎসবের পর গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা হইয়া দ্বারভাঙ্গা উৎসবে গমন করেন এবং মজঃফরপুর, মতিহারী, মুঙ্গের, জামালপুর, শৈপাড়া, কোন্নগর, শান্তিপুর, বাগেরহাট, বরিশাল, মাদারীপুর, মাণিকদহ, কাকিনা, প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। সকল স্থানেই প্রমত্ত কীর্ত্তন, গভীর ধর্ম্মালোচনা, প্রাণস্পর্শী উপাসনা হয়। লোকের মধ্যে ধর্ম্মতৃষ্ণা জাগ্রত হইয়া উঠে।

মুঙ্গেরে একজন খৃষ্টান ভদ্রলোক তাঁহার ভক্তি ব্যাকুলতা ও নৃত্য দেখিয়া মোহিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোঁসাই তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া বলিয়াছিলেন "পরিচয় পাইয়াছেন ?" উক্ত ভদ্র লোক বলিলেন, "হাঁ পরিচয় পাইয়াছি।" জামালপুরে তাঁহার প্রাচীন বন্ধু অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আলিঙ্গন, আলাপ ও ভাব বিনিময় দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

কোন্নগরে শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সপরিবারে তাঁহার খুব সেবা করেন। ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী এবং জগৎবাবুর গানে সকলে বিমোহিত হন। নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ভাবে মুগ্ধ হইয়া এক এক বার রান্না ঘর হইতে ছুটিয়া গানের নিকট আসিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, "এতগুলি সাধু আমার অতিথি, ঠাকুর আমাকে দিশাহারা হইতে দিও না।"

বরিশালে কতিপয় প্রাচীনা মহিলা ভাল ভাল মিষ্ট আনাইয়া গোঁসাইর সেবা করেন। আহারের সময় এক মহিলা যখন রসগোল্লা দিতেছিলেন তখন গোঁসাই অঞ্জলি পাতিয়া উহা খাইতেছিলেন, আর মুখে দিতে দিতে মাতৃভাবে বিভোর হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতেছিলেন। তাঁহার প্রেমাশ্রুসিক্ত মুখ দেখিয়া মহিলাদের মধ্যে স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সময় স্বর্গীয় মনোরঞ্জনবাবু পরলোকগত আত্মার আগমন লইয়া বরিশালে খুব ব্যস্ত ছিলেন।

কাকিনার জমিদার স্বর্গীয় মহিমারঞ্জন রায়ের আহ্বানে তথাকার মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে গমন করেন; এবং তথায় জমাট উৎসব হয়। উৎসবে আদি, নববিধান, সাধারণ সকল সমাজের ব্রাহ্মগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন। পরে কলিকাতা আসিয়া কয়েক দিন সামাজিক উপাসনা করেন; এবং পুনরায় মাণিকদহ হইয়া ঢাকা ফিরিয়া যান। মাণিকদহে তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তথাকার ব্রাহ্মজমিদার বিপিনবিহী রায় মহাশয় সস্ত্রীক এবং আরও কতিপয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা তাঁহার নিকট যোগসাধন গ্রহণ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন আরম্ভ হয়। অনেকের মনে তাঁহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি প্রশ্নোত্তরে তাঁহার অবলম্বিত যোগসাধন সম্বন্ধীয় মত প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকা উক্ত জমিদার মহোদয়ের অর্থানুকুল্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। যোগসাধন পুস্তিকা হইতে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের মত ও সাধনবিবরণ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইল;—

"জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ অর্থাৎ মিলনই প্রকৃত যোগ; জীবাত্মার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ প্রকৃতি পরমাত্মার পূর্ণ ও অনন্ত প্রকৃতির ঐ তিন অঙ্গের সহিত এক-জাতীয়তা বা সমধর্ম্মিতা লাভ করিবে ইহাই যোগের উদ্দেশ্য।"

"পরমেশ্বরকে লাভ করা অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করা, জ্ঞান-কর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ করা, এইরূপ সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে সম্ভোগ করাই যোগের লক্ষ্য।"

"তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সরলভাবে অজস্র প্রার্থনাই এই যোগসাধনের উপায়।" "ব্যাকুল ভাবে অজস্র প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্ম

লাভের প্রতিকূল অবস্থাগুলি প্রাণ হইতে অন্তর্হিত হইলে পরমেশ্বরের করুণা চিনিয়া লওয়া যায়। সাধন কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা।"

"সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদের সাধনের লক্ষ্য, কেন্দ্র, এবং উপায়। তিনি ইচ্ছা করিলে মানবের যোগশক্তি স্বয়ং বিকশিত করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং মানবের সাহায্য ভিন্ন এই সাধন অসম্ভব নহে।"

"সাধনের ভিতরের তত্ত্ব অর্থাৎ জাগ্রত প্রার্থনা উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু যেমন শরীরে শরীরে মনে মনে স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও সহানুভূতি আছে তদ্রূপ আত্মায় আত্মায়ও সহানুভূতি আছে। যেরূপ আচার্য্যের সত্য প্রার্থনা উপাসকদিগের প্রাণ স্পর্শ করে ও তাঁহাদের প্রাণে জাগ্রত প্রার্থনার উদয় করিয়া দেয়, সেইরূপ কেহ প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত ঐ প্রার্থনার অবস্থা আপনার প্রাণে অবতীর্ণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলে কোন জাগ্রত শক্তিশালী পুরুষ নিজের ইচ্ছা শক্তিতে ও ভগবানের কৃপা-সম্ভূত নিয়মানুসারে নিজের অভ্যন্তরীণ প্রার্থনার অবস্থা তাঁহার প্রাণে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন। বস্তুতঃও তাহাই হয়। যিনি নিতান্ত ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থী হন, আমি সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সম্মুখে প্রার্থনা করি; এবং এই সময়ে আমার পূজনীয় গুরু শ্রীযুক্ত পরমহংস বাবাজি সাহায্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে সেইরূপ প্রার্থনা জাগ্রত হয়; এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগ-শক্তি প্রস্ফুটিত হয়। ইহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহই বুঝিতে পারেন না। তৎপর যিনি যে পরিমাণে ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠার সহিত সাধন করেন তিনি ততই গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হন।"

"এই সাধনে পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধি চাই না; ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে

কেহ বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত না হইয়া যোগপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হন এবং যতদিন প্রকৃত অবস্থা লাভ না করেন ততদিনের জন্য সাধন সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ না হইলে প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হন তিনিই এই সাধন গ্রহণ করিতে পারেন।"

"প্রার্থনা করিতে করিতে পবিত্রতার আধার পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলে সমস্ত অজ্ঞানতা, শুষ্কতা, মলিনতা দূর হয়। কোন ধর্ম্মসাধন অবলম্বন করিবা মাত্রই কেহ উদ্ধার হয় না। সাধনের পরিণত অবস্থার নামই মুক্তি। যে সকল লোক সাধনহীন হইয়া কেবল ভ্রম ও পাপের মধ্যে নিমগ্ন ছিল তাহাদিগকে এই পথের যাত্রী করিয়া ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত করা কি মঙ্গল নয়? সাধক ও ভগবানের মধ্যে একটি কুটারও স্থান এখানে নাই।"

"মানুষ অপূর্ণ, তাহার শক্তিও অপূর্ণ; কিন্তু যতই আমরা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইব আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তির ততই বিকাশ হইবে, ততই আমরা পূর্ণতার দিকে ধাবমান হইব। প্রত্যেক লোকেরই অপরের দেহের ন্যায় আত্মা দর্শনের শক্তি আছে। কিন্তু যাহার জ্ঞানের জড়তা যত অধিক তাহার এই শক্তি তত অল্প, যাঁহার যে পরিমাণে অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়াছে তিনি সেই পরিমাণে বিশ্বসংসারের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এইরূপে মহাত্মারা সাধারণ লোক অপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে সকল তত্ত্ব অবগত হন ও মানুষের আত্মার অবস্থা এমন কি বহু দূর হইতেও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে সমস্ত বিষয়ে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না।"

"এই সাধনে কোন সম্প্রদায় নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, নানকপন্থী ইত্যাদি পৃথিবীতে যত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে তাঁহাদের সকলেরই মধ্যে সত্যধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সেই সত্য সর্ব্বত্র

হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ও যেখানে কিছু পাইবে তাহারই নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। জগতের সমস্ত সাধু মহাত্মাদিগকেই সত্যের প্রচারকজ্ঞানে সরল ও অবিমিশ্র শ্রদ্ধা করা চাই। কিন্তু যিনি যাহা নিজের প্রাণে সত্য বুঝিবেন কোন দলের বা লোকের অনুরোধে বা ভয়ে তাহা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না, অথবা এই সাধন অবলম্বীরা কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িতে পারিবেন না।"

"দেহ ও মন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। বিবিধ উপায়ে শারীরিক সুস্থতা রক্ষা না করিলে সাধন হয় না; এবং কোন প্রকার পাপ কার্য্য বা কুচিন্তা এমন কি মন্দ কল্পনা পর্য্যন্ত মনে উদয় হইলে সাধনের বিশেষ ক্ষতি হয়।"

"দিবানিশি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করা আবশ্যক। জীবনের যে সকল কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত মত সময় নির্দ্ধারণ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সময় সাধনে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। এইগুলি সকলের অবশ্য প্রতিপালনায় বিশেষ নিয়ম। তদ্ভিন্ন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে।"

"এই সাধনে মাংস ভক্ষণ নিষেধ। তবে শরীর রুগ্ন হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা মতে নিতান্ত আবশ্যক স্থলে খাইতে পারেন। মাংসের উগ্রকারিতা শক্তি বশতঃ উহা চিত্ত-সংযমের বিরোধী; এজন্য যোগ সাধকেরা চিরকাল মাংস ভোজন নিষেধ করেন। কিন্তু মৎস্যের সে দোষ নাই বলিয়া উহা নিষিদ্ধ নহে। যাঁহারা জীবহিংসা অবৈধ মনে করেন তাঁহারা দুইই ত্যাগ করিতে পারেন।"

"স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বতন্ত্র গৃহে সাধন করা আবশ্যক। তবে যেখানে সেরূপ সুবিধা নাই, তথায় অতি সতর্ক হওয়া উচিত; যেন পরস্পর স্পর্শ না হয়। ইহা ঋষি ও পরমহংসদিগের অতি আদরের পবিত্র সাধন। কোনরূপে ইহার মধ্যে অপবিত্রতার লেশমাত্র না প্রবেশ করে। যতদিন

সাধক পবিত্র স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া আপনার প্রবৃত্তি নিচয়কে সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনিতে না পারেন, ততদিন চরিত্র স্খলনের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনার মধ্যেও তাঁহার থাকা বিধেয় নহে।"

"কোন সৃষ্ট বস্তু বা জীব বা মনুষ্যকে বিশ্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান, পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করার নাম অবতারবাদ। উহা সত্যের বিরোধী। এজন্য আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে উহার কোন সংশ্রব নাই। পূর্ব্বোক্ত সাধনের নিয়মগুলি এককালে বিলুপ্ত না হইলে এ সাধনের মধ্যে অবতারবাদ আসিতে পারেনা।"

"অপূর্ণ মনুষ্যকে, তাহার উপদেশকে, অথবা তল্লিখিত শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করিয়া ইহাদের সম্মুখে নিজের বিবেককে, হীন ও অবরোধ করার নাম গুরুবাদ। এই ভয়ানক মত আমাদের নিয়মের যারপর নাই বিপরীত। বিবেকই ঈশ্বর লাভের প্রকৃত পথ, এজন্য আপনার বিবেকই মানবের সর্ব্বোপরি অনুসরণীয়। যেখানে কাহারও উপদেশ আমার বিবেকের বিরুদ্ধ হইলেও তাহা আমার অনুসরণীয় বলিয়া ধরা হয় সেখানেই গুরুবাদ আসে। ঈশ্বরের ও মানবাত্মার মধ্যে একটী তৃণকণা পর্য্যন্তও যতক্ষণ ব্যবধান থাকিবে অর্থাৎ যতক্ষণ তদ্ব্যতীত কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা প্রণালীকে উপায় জ্ঞানে অবলম্বন করা হইবে ততক্ষণ এই সাধন পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং গুরুবাদ যোগের বিনাশক।"

"এই সাধন দিবার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ হইতে পারে না। ভবগবানের সত্যধর্ম্ম যিনি যে পরিমাণে প্রাণে লাভ করিবেন তাঁহার সেই পরিমাণে পরোপকার করিবার শক্তি জন্মে। কিন্তু অন্যের ধর্ম্ম চক্ষু খুলিয়া দিতে যে শক্তি আবশ্যক সেই শক্তি যিনি লাভ করেন নাই, তিনি কখনও এই সাধনে অপরকে দীক্ষিত করিতে অধিকারী নহেন। যোগ পথের চারিটি অবস্থা বর্ণিত আছে;—(১) প্রবর্ত্তক

(২) সাধক, (৩) যুঞ্জন, (৪) যুক্ত সিদ্ধ। প্রবর্ত্তক অবস্থার মধ্যে ধর্ম্মের প্রাথমিক কয়েকটি ভাব মাত্র উন্মেষিত হয়; যথা দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম, পবিত্রতা।

তৎপরে সাধক অবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব অল্প প্রকাশ হইতে থাকে এবং এই অবস্থার শেষভাগে সুস্পষ্ট ব্রহ্মদর্শন হয়। তাহার পর যুঞ্জন যোগীদিগের অবস্থা। তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বর সহবাসে থাকেন ও বিবিধ সত্য লাভে জীবন কৃতার্থ করেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইঁহাদেরও বিচ্ছেদ হয়। সেই সময় অত্যন্ত ক্লেশে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যেও বিচ্ছেদের মুহূর্ত্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে। অবশেষে ঈশ্বরকৃপায় যাঁহারা অবিচ্ছিন্নযোগের অবস্থায় থাকিয়া সেই পূর্ণ পরমেশ্বরে প্রতিনিয়ত অবস্থিতি ও বিচরণ করেন তাঁহাদিগকে যুক্তযোগী কহে। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। যোগ শিক্ষা করিতে হইলে এইরূপ কোন সিদ্ধ যোগীর নিকটই শিক্ষালাভ করা উচিত। কিন্তু যে সকল যোগীর সহিত কোন সিদ্ধমহাপুরুষের সাক্ষাৎযোগ আছে, তাঁহাদিগকে যদি এই মহাত্মারা অপরের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা দিয়া দীক্ষিত করিতে আদেশ করেন তাহা হইলেও সেইরূপ ফললাভ করা যায়। নতুবা যার তার কাছে দীক্ষিত হওয়া যৎপরোনাস্তি অকর্ত্তব্য। যে অন্ধ সে অপরকে পথ দেখাইবে কি? যে একশত টাকার অধিকারী, সে দান-সত্র খুলিলে চলিবে কেন? যাঁহার শক্তি অনন্তশক্তিমান পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে তিনিই শক্তির অনন্তপ্রস্রবণ লাভ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্ত কাহারও যোগ-দীক্ষা দিবার অধিকার নাই। এইরূপ হীনাবস্থার লোকের নিকট দীক্ষা লওয়াতেই আমাদের দেশে গুরুবাদের ভয়াবহ অত্যাচারে ঘৃণিত পাশবাচার সমূহ প্রচারিত হইয়াছে।”

“এই পথ ভিন্ন মুক্তির অন্তপথ নাই, এমন ভয়ানক কথা আমি

বলিতে পারি না। ইহাতেই যত দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে পাইবার সাধন ও উপায়। যে কেহ সরলভাবে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিবে ও মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, সেই মুক্তিলাভ করিবে। তাঁহার ধর্ম্ম লাভের জন্য যে উপায় শ্রেয় তাহা তিনিই তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দিবেন। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলা আবশ্যক; এমন কি আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর পাপীতাপী যাবতীয় নরনারীই মুক্তির অধিকারী। ইহলোকে যদি না হয় পরলোকে অনন্তকালে প্রত্যেক মানবাত্মা পূর্ণতার দিকে চলিবেই চলিবে। ইহলোকেও পাপ প্রভৃতি সমস্তই তাহার আত্মার মধ্যে চরমে মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছুই প্রসব করে না।"

"যোগে আলস্য আনে না; বরং ঠিক তার বিপরীত। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এই তিনের এককালীন সমঞ্জসীভূত উন্নতিই যোগের ফল। পরমেশ্বর রসস্বরূপ। রস যেমন উদ্ভিদের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে তাহার মূলকাণ্ড শাখা প্রশাখা ও পত্র সর্ব্বত্র সমভাবে জীবন সঞ্চারিত করে, মানবাত্মায় পরমাত্মার আবির্ভাব হইলেও সেইরূপ তাহার সমস্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আংশিক উন্নতি ইহার বিরোধী। তিনি পূর্ণ; সেই পূর্ণ-আদর্শ প্রাণে অবতীর্ণ হইলে অপূর্ণতা কি সংকীর্ণতা তথায় স্থান পায় না। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলে কার্য্য করিতেই হইবে। তবে কার্য্য সকলের একরূপ কখনই হইতে পারে না। সকলেই প্রচার কি বক্তৃতা বা সংবাদপত্র প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন করিবে, নতুবা তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল বলিব না ইহা অজ্ঞের কথা। সকলকেই ধর্ম্মপরায়ণ যোগী হওয়া চাই, অথচ সাংসারিক নানাকর্ম্মে বিভক্ত হইতে হইবে। বক্তৃতা করা কাহারও কার্য্য,

পুস্তক লেখা অপরের কার্য্য; কেহবা কৃষিকার্য্য করিবে, কেহ বিচারপতি হইবে; কাহাকে জমিদারী দেখিতে হইবে, কাহাকে স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে; আর কেহ বা কেবল নির্জ্জনে বসিয়া সাধন করিবেন ও অপর সকলকে আপনার ধর্ম্মজীবনের অমূল্য সত্য বিরলে শিক্ষা দিবেন। সুতরাং দেখা গেল যে যোগ সকলের সাধারণ ভিত্তি ভূমি। তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাঁহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইরূপ উপায়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।”

গোস্বামী মহাশয় ১২৯০ সনে আষাঢ় মাসে যোগসাধন গ্রহণ করেন, আর ১২৯২ সনে বামাবোধিনী পত্রিকায় তাঁহার লিখিত আশাবতীর উপাখ্যান প্রকাশিত হয়। আমরা বহু লোকের মুখে শুনিয়াছি ঐ উপাখ্যান তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। আশাবতীর অকপট বিনয়, তীব্রবৈরাগ্য, চিত্তের দীনতা হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্রতা, গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ, তীর্থভ্রমণ, সাধুর সঙ্গে ধর্ম্মালাপ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে গোঁসাইজীর জীবনে ঐরূপ ঘটিয়াছিল। একথা সত্য তাঁহার ব্যাকুলতার অবধি ছিল না। তীব্র ব্যাকুলতায় এক এক সময়ে তিনি ‘আমার কিছুই হইল না’, বলিয়া কতই না মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন। অবশেষে প্রেমময় পরমেশ্বর আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার তৃষিত আত্মার পিপাসা দূর করিলেন, দেহে থাকিয়াই তাঁহার মুক্তিলাভ হইল।

আশাবতীর উপাখ্যানে ধর্ম্মসাধনবিষয়ক অনেক সারগর্ভ উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ হইতেও কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইল;—

“মনুষ্য কুসঙ্গে কুঅভ্যাসে পবিত্র স্বভাবকে নষ্ট করিয়া ফেলে। পুনর্ব্বার সেই স্বভাব লাভ করিবার জন্য সাধনের প্রয়োজন।

মাতার স্নেহ, স্তন্য দুগ্ধ, জল, বায়ু, উত্তাপ শরীর রক্ষার উপযোগী সকল পদার্থ অনায়াস-লভ্য; আত্মার প্রয়োজনীয় বস্তুও যে দুষ্প্রাপ্য তাহা নহে। আত্মা ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিলেই বিশ্বজননী অমৃতরস ঢালিয়া দেন। ঈশ্বরের জন্য প্রবল ক্ষুধা অর্থাৎ অনুরাগ হইলেই অনায়াসে যোগলাভ করা যায়। সংসারাসক্তিতে সেই ধর্ম্মক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে, এজন্য যোগসাধনের প্রয়োজন। শারীরিক ক্ষুধা নষ্ট হইলে যেমন মন্দাগ্নির ঔষধ সেবন করিতে হয়, তেমনি আত্মার অনুরাগ ক্ষুধার মান্দাভাব দেখিলেই তাহার চিকিৎসা-সাধনভজন করা নিতান্ত প্রয়োজন।"

"স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূল। সামান্য ঔষধে এ রোগ নিবারণ করা যায় না। সংসার অসার, অনিত্য সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা ও আলোচনা এবং সাধুসঙ্গ করিতে করিতে যখন বাস্তবিকই সংসারের তাবৎপদার্থকে অসার অনিত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইবে তখনই স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া তীব্র জীবন্ত বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে। এই বৈরাগ্য হইতেই সাধনে অধিকার জন্মাইবে।"

"এই নশ্বর শরীরকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করাকেই সংসার কহে। এই দেহকে অত্যন্ত ভালবাসার নামই সংসারাসক্তি। যে স্ত্রী কি পুরুষ কেবল আহার, বস্ত্র অলঙ্কার, গৃহ, শয্যা এই সমস্ত লইয়াই ব্যস্ত সেই সংসারাসক্ত। অনেকে মনে করেন নগর ছাড়িয়া বনে বাস করিলেই সংসার ত্যাগ করা হইল। ইহা অত্যন্ত ভ্রম। বনে আসিয়াও আহার লইয়া, কুটীর, কৌপীন, আসন, অগ্নিকুণ্ড কমণ্ডলু লইয়া যে ব্যস্ত সেও সংসারাসক্ত। ভগবানকে প্রেম না করিয়া তাঁহার সৃষ্টপদার্থ সকলকে ভালবাসা ও তাহাতে আসক্ত হওয়ার নামই সংসার। যতদিন ঈশ্বরে প্রেম না হয় তত দিন সংসার ত্যাগ করা যায় না।"

"প্রশ্ন। ভগবান সাকার কি নিরাকার?

উত্তর। ভগবান সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সীমা নাই, তিনি অনন্ত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ। আমাদের যেমন শরীর আছে, তাঁহার সেরূপ শরীর থাকা কখনই সম্ভব নয়।"

প্রশ্ন।—ঈশ্বর দর্শন ভিন্ন মন নিঃসংশয় হয় না। কেহ বলে তিনি সাকার, কেহ বলে নিরাকার; তাহা প্রথমে কিরূপে স্থির করিব?

উত্তর।—শাস্ত্রে আছে, তিনি নিরাকার এবং তিনি সাকার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তত্তদ্‌যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতেই স্বতন্ত্র। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু নিজে স্বতন্ত্র। কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। এজন্য তিনি নিরাকার। নিরাকার বলিতে শূন্য নহেন; তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহার রূপ আছে; সে রূপ নিত্যরূপ; সেরূপ সচ্চিদানন্দময়; জ্ঞানচক্ষু, ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্য রূপ দর্শন করা যায়। যত দিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন তাঁহাকে সাকার, নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা। চিরকাল ভক্ত সাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপমাধুরী যে একবার দেখিয়াছে সে আর তাহা ভুলিতে পারে না। বাগানের কর্ত্তা বাগানে আসিলে বাগানের মালী যেমন দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ দীনবন্ধু প্রভু হৃদয়-উদ্যানে উপস্থিত হইলে অহঙ্কার মালী দূরে গিয়া করযোড়ে অবস্থিতি করে। 'প্রভো! আমি দাস' মালীর মুখে কেবল এই কথা। প্রভুর আগমনে মালী বন্দনা করিলে শরীরের

রামগুলি ভক্তি ভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর স্তব করে, নয়ন তাঁর চরণ ধৌত করে।

প্রশ্ন। তবে লোকে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে কেন?

উত্তর। অজ্ঞান লোকদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

প্রশ্ন।—অনেক জ্ঞানী বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন। তাঁহারাত অজ্ঞান নহেন?

উত্তর।—রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি নহে। ঈশ্বর পুরুষ এবং প্রকৃতি; এই পুরুষ প্রকৃতি পূজাই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা। রাধাশ্যাম, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ এ সকলই এক; যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। (যেমন) অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি দুই একই বস্তু।"

নবম পরিচ্ছেদ

যোগসাধন গ্রহণের কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার গুরুর অভিপ্রায় অনুসারে লোকদিগকে যোগসাধনে দীক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। তখনও তিনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের এবং ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রদ্বারা শিষ্যগ্রহণ এবং আরও কোন কোন মত ব্রাহ্মসমাজবিরোধী বিবেচিত হওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজের কোন কোন সভ্য তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন বিষয়ে অল্পাধিক মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতিবাদ করিতেছেন তখন উক্ত সমাজের প্রচারক পদ ত্যাগের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সমীপে

এক পত্র প্রেরণ করিলেন (১২৯২ সন, ১০ই চৈত্র)। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ ধর্ম্মপিপাসুগণের তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পদত্যাগ সংবাদ তাঁহাদের গভীর মনোবেদনার কারণ হইল। ইহার পর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ তাঁহার মত ও কার্য্যাদিসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া উক্ত পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাহাতে আন্দোলন প্রশমিত হইল না; বরং তখনও দুই খানি প্রতিবাদপত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনাধীন রহিল। পরে তিনি পুনরায় পদত্যাগ করিলেন

সাধা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার মত ও সাধন-প্রণালী সম্বন্ধ.. প্রতিবাদ পত্র পাইয়া তাঁহাকে ঢাকা হইতে কলিকাতা আহ্বান করেন এবং আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণকে এক সব-কমিটিভুক্ত করিয়া উক্ত কমিটির উপর অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধে তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতা আসিয়া সিটি কলেজ গৃহে সম্মিলিত ব্রাহ্মগণের সম্মুখে নিজের মত ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। "ঐ দিন এরূপ সদ্ভাবের সহিত কথা বার্ত্তা হইয়াছিল যে যাঁহারা তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরস্পর বিরোধী দুই দলকে এমন সদ্ভাবের সহিত আলাপাদি করিতে প্রায় দেখা যায় না।" ঐ দিন অনেকের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় সব-কমিটির সম্মুখে তাঁহার মত প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া এবং বন্ধু বান্ধবগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ সংগৃহীত হইল সব-কমিটি উহাই কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় প্রেরণ করিলেন। সব-কমিটির প্রদত্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ;—

(ক) নূতন সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তন—গোপনে সাধন, প্রাণায়াম শক্তিসঞ্চার, উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ, মৎস্য খাওয়ায় আপত্তি নাই, মাংস ভোজনে আপত্তি আছে, গুরুবাদ, সাধু বা গুরুর বাক্য বিনা যুক্তিতে গ্রহণ, পদধূলির মাহাত্ম্য স্বীকার, রাধাকৃষ্ণের লীলাঘটিত ছবি ও সঙ্গীতাদির ব্যবহার, কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন, দেবমূর্ত্তির নিকট প্রণাম, অদ্ভুতশক্তিতে বিশ্বাস ইত্যাদি মত তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারিত ও আচরিত হইতেছে। গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও কার্য্য-প্রণালী দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা আছে। (খ) তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজেরই মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সাধনাবলম্বী দল সৃষ্ট হইতেছে। ইহারা অপরাপর সভ্যদিগকে আধ্যাত্মিক বন্ধুতা হইতে দূরে ফেলিতেছেন। বিজয়বাবুর পদধূলি গ্রহণ ও প্রসাদ ভক্ষণ লইয়া বাড়াবাড়ি চলিতেছে; যে দলের মধ্যে অল্পবয়স্ক বালক বালিকাও প্রবেশ করিতে পারে ও করিতেছে সেই দলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও লীলাসংক্রান্ত ছবি ও গান ব্যবহৃত হইতেছে; কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন করার অনুকূল মত সমর্থিত হইতেছে; পৌত্তলিকদিগের দেবালয়ে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইয়া প্রণাম ও গড়াগড়ি চলিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সামান্য সভ্য এই সকল মত ও কার্য্য অবলম্বন করিলে তত অনিষ্ট হইত না, গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন একজন প্রচারকের দ্বারা এই সকল মত প্রচারিত ও এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়াতে আরও অধিক অনিষ্ট করিতেছে ও ভবিষ্যতে আরও করিবার সম্ভাবনা।"

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সব-কমিটির উক্ত বিবরণ ও মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়া স্থির করিলেন (ক)—নিম্নলিখিত মতগুলি অতীব আপত্তিজনক এবং এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। "গুরুর আবশ্যকতা অর্থাৎ গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টা ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি

লাভ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল; ঈশ্বরে চিত্ত অর্পিত থাকিলেও দেবমন্দিরে ও দেবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম ও গড়াগড়ি দেওয়া; নিজের উপাসনাকালে অথবা অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রকাশ্য উপাসনাকালে কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর নাম গ্রহণ; রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও লীলাসংক্রান্ত গীতসকল ধর্ম্মসাধন স্থলে গান করা এবং রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদিগের লীলাবিহারসংক্রান্ত ছবিসকল উপাসনা স্থলে রক্ষা করা; কোন প্রকারে ঐ সকল গান ও ছবির আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে পারিলেও ব্যবহার করা; যে প্রণালীতে ও যে যে নিয়মে গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা দিতেছেন সেই প্রণালী ও সেই সকল নিয়ম; কোন কোন মত বা আচরণ কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তিবিশেষের কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার না করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে এই মত; কোন ব্যক্তিবিশেষের পদধূলির কিছু আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য আছে এরূপ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করা কি তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হওয়া কিম্বা পদধূলি দ্বারা অপরের আধ্যাত্মিক কি শারীরিক যাতনা নিবারণের সাহায্য হইতে পারে এই বিশ্বাসে অপরের অঙ্গে মাখাইয়া দেওয়া।" (খ)—"ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সকল মত বা আচরণ অবলম্বন করিয়াছেন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আগ্রহ ও সদ্ভাবের সহিত তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা একবার ঐ সকল মত ও আচরণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন; এবং তদ্দ্বারা কত অনর্থ ঘটিবে ও ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মত সকলের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যের কিরূপ উচ্ছেদসাধন করিবে তাহা অনুভব করিয়া এগুলিকে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য বাধা দিবার উপায় করুন।"

উক্ত দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হইলে অনেক বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সভ্যের মতে নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল। (গ) "তাঁহাদের সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দ্বিতীয়বার পদত্যাগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গভীর দুঃখের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। তিনি অনেক পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সেবা করিয়াছেন সে সেবার মূল্য নাই, তাহার জন্য উক্ত সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এবং আগ্রহ ও প্রীতির সহিত অনুরোধ করিতেছেন যে তিনি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্যের প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহার কিরূপ ফল দর্শিবে। পূর্ব্বোক্ত যে প্রস্তাব কমিটি একবাক্যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার সহিত মিলাইয়া ঐ সকল বিষয় চিন্তা করুন। সভাগণ ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তাঁহাদের ভক্তিভাজন প্রচারক ভ্রাতা যেন ত্বরায় আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন, এবং যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া যাবজ্জীবন নিযুক্ত আছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যেন পুনরায় আপনার অগ্নিময় উৎসাহ, বল ও চরিত্রের সাধুতা নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা আরও আশা করেন যে, তাঁহার সহিত প্রচারকের সম্বন্ধ রহিত হইলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে তাহা চিরদিন প্রবল থাকিবে।"

পদত্যাগপত্র গ্রহণের মীমাংসার জন্য ঐ দিন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বাদানুবাদ হয়; এবং তৎপর দিবস স্থগিত অধিবেশনে অধিকাংশের মতে পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। তাঁহার পদত্যাগপত্রের উল্লেখ করিয়া উক্ত সমাজের সভাপতি ৺শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "ইহা আমার নিকট খুব আনন্দের বিষয় যে এই বাহ্য-স্বতন্ত্রতায় সমাজের সভাগণের সঙ্গে তাঁহার ভালবাসা ও বন্ধুতার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই।"

প্রচারক পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামী মহাশয় একখণ্ড নিবেদন-পত্র ব্রাহ্মদিগের নিকট প্রেরণ করেন। পদত্যাগপত্র, এবং তাঁহার নিবেদন-পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে কোন কোন কথার দ্বিরুক্তি হইবে :—

ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন।

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ইহাতে দল নাই। এই জন্য আমি যেখানে সত্য পাই, এবং যাহা সত্য বুঝি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে আমার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদিসমাজ, হিন্দুসমাজ খ্রীষ্টীয়সমাজ, মুসলমানসমাজ আমি সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সকল সম্প্রদায় আমার। যেখানে যতটুকু সত্য সেই টুকু আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম। এখন হইতে এই সার সত্য সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব। আমার মতের আভাস নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দ শান্তি মঙ্গলস্বরূপ, অজর, অমর, নিত্য, একমাত্র অদ্বিতীয়, পবিত্রস্বরূপ। তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার জড়ীয় রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা, কোন সৃষ্টবস্তুর মত নহেন ; তিনি স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুই জন ঈশ্বর নাই, তিন জনও নাই ; অথবা অনেক ঈশ্বর নাই। যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই তখন অন্য ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে?

পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। নানাদেশের লোকে আপন আপন ভাষায় তাঁহাকে এক একটী নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে। সৃষ্টি-কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, খোদা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কেহ কেহ বলেন, লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে। একথাও ঠিক নহে। কারণ হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর, এবং পাপ-হরণকর্ত্তা পরমেশ্বর, এই সমস্তগুলি বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হরি বলিয়া গদ্গদ্ভাবে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে তখন এমন লোক কেহ নাই যে বলিবে এ লোকটা বানর প্রভৃতি পশু গুলাকে ডাকিয়া কাঁদিতেছে। বিশেষতঃ মনুষ্যের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি? আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা মনুষ্য নহেন। আমার দেবতা অন্তর্য্যামী, তিনি জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর, সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের জড়ীয়রূপ নাই। এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। তাঁহাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়। যেমন জ্ঞান-চক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞান-কর্ণ আছে, জ্ঞান-নাসিকা, জ্ঞান-রসনা ইত্যাদি আছে, যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন অনুভব হয়। জ্ঞান-চক্ষে ইহলোকে পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু বিকশিত করা হয়। যাঁহার শরীর আত্মা নির্ম্মল, তাঁহার আপনা আপনি জ্ঞান-চক্ষু বিকশিত হইতে পারে; অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক, তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্ম্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য ধর্ম্মে দল নাই সম্প্রদায় নাই। মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদে দলাদলির সৃষ্টি হয়; প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা, তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা যায়। আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসি তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহাকে পূজা অর্চ্চনা করেন তিনিই আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু। এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হয় সেই স্থানেই গমন করি; যেখানে তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয়, সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, আমার প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিতেছে, কত আনন্দ, আনন্দ ধরে না। এজন্য শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি। কত বৃক্ষতলে, কত পর্ব্বতে, নদীগর্ভে, দেবমন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায় আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ একটী আধ্যাত্মিক রূপক। উপাসনা ও যোগের এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনাকালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দর্শন করা যায়।

পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলের মধ্য দিয়া সেই জগদ্গুরু শিক্ষা দিতেছেন। যখন যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই সে বস্তুকেই ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা, মাতা, উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করা প্রয়োজন; তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ধর্ম্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে কি তাঁহার অবতার কি মধ্যবর্ত্তীরূপে প্রার্থনা

করিলে অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে নরনারী মাত্রেরই পদধূলি গ্রহণ করা বিশেষ উপায়।

অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেম, শক্তির যোগ করাকেই যোগ-সাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে মনুষ্যের দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই 'করতলন্যস্ত আমলকবৎ' বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন ;—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।"

কলিকাতা,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচারক নিবাস।
৩১শে বৈশাখ, ১৮০৮ শক।

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পদত্যাগ পত্র।

সত্য স্বরূপ, জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে দিব্য চক্ষে দর্শন করা যায় এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁহাকে নিয়ত দেখা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক কথায় তাঁহাকে লাভ করিয়া নিয়তই তাঁহার সত্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম করা ও জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ।

(১) এইরূপ ব্রহ্মলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। সম্পূর্ণ তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সাধনভজন করিলে যথাসময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য তাঁহার চরণেই আমার ধর্ম্মজীবনের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত যোগসাধন পথ অবলম্বনে গত কয়েক বৎসর চলিয়া

আসিতেছি। পরমহংস বাবাজির উপদেশানুসারে যোগ-পিপাসুব্যক্তি গণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধনপথ তাঁহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। (২) এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংস্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে কিছুদিনের জন্য ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশে অনেককে প্রাণায়াম করিতে হয়। কিন্তু উহা আমাদের সাধন নহে। (৩) এইজন্য সাধক-মণ্ডলীর বহির্ভূত লোকদিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি না। তাঁহারা ইহার ভিতরের তত্ত্ব-কথা কিছুই বুঝিবেন না, কেবল বাহিরের প্রাণায়াম টুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। (৪) কোনরূপ অহঙ্কার বা অন্য পাপাচার, পাপচিন্তা, পাপ-কল্পনা পর্য্যন্ত দ্বারাও এ সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। আমরা কোন সম্প্রদায় বিশেষ মানি না; হিন্দু, পৌত্তলিক, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃষ্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মসমাজের লোক যে কেহ আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থী হন তিনিই সাধন পাইতে পারেন; এবং সাধন করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানতা, পাপ, নীচতা ও কুসংস্কার ব্রহ্মকৃপায় দূর হইয়া তিনি পবিত্র হইবেন।

(৫) ইহাতে গুরুবাদের লেশমাত্র নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার গুরু আর সকলেই ইহার উপদেষ্টা ও তন্নিযুক্ত পথপ্রদর্শক মাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, উপগ্রহ ও পর্ব্বত উপায় দ্বারা নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ মনুষ্যরূপ উপায় দ্বারাও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য আমরা সমস্ত পদার্থকে ও মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্ত্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত, শক্তি-শালী মনুষ্যের সাহায্যের আবশ্যক; এবং তদ্ভিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা

থাকিলে ও অন্যান্য অবস্থা ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতি বিরল। সুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। যেমন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি ভগবান দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যদি কোন কুটী পড়ে তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না।

(৬) পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করা ধর্ম্ম-সঙ্গত। পদধূলি লওয়ার সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছা হয় সেই বিনীত অবস্থা অতি সুন্দর ও উপকারী। এই জন্য অন্যের উপকার হইতেছে দেখিলে আমার পদধূলি লইতে বাধা দিই না। আমিও সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, তখনই আমি সেই প্রণাম সেই বিশ্বগুরুর প্রাপ্য এই অর্থে "জয় গুরু জয় গুরু" উচ্চারণ করিয়া থাকি। একটী প্রণামও স্বয়ং গ্রহণ করি না।

(৭) আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করি না। তাহাতে নানা শারীরিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতিও হয় একথা সাধু মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে। তবে পিতা, মাতা গুরুজন যখন আদর করিয়া কিছু দেন তাহা এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে হয় তাহা আহার করিলে হানি নাই; বরং উপকারই হইয়া থাকে। এজন্য সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া থাকি।

(৮) দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি আমার ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, তবে সেই খানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই; ও আমার

ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়াও হয়ত সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই সেইখানে মুগ্ধ হই, স্থানের বিচার থাকে না।

(৯) কালী, দুর্গা সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয় তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে কোথাও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না।

(১০) রাধা কৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম্ম ও যোগ পথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর; এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আমি ঐ ভাব সাধনের চেষ্টা করি ও যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে রাধা কৃষ্ণের গান করিয়া থাকি। তবে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে কখনও ঐ নাম গ্রহণ করি নাই; এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ করা উচিতও মনে করি না।

এই আমাদের যোগ-সাধন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহা সত্য বুঝিব তাহাই অবনত মস্তকে অনুসরণ করিব, এইজন্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহ্যিক সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ব্ববৎ "অক্ষুণ্ণ

রহিল। কেবল প্রচারক পদ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি ধর্ম্ম প্রচারের সমস্ত কার্য্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাকিব। আমার একটি কথাও এখন অবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক।

আমি মনে করি যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, এবং সমস্ত মানব মণ্ডলীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক, তাঁহার ধর্ম্মও এক। মনুষ্যের ভ্রম, প্রমাদ ও রুচি অনুসারে নানাপ্রকার দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মে দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি; এবং করিব। আমি সমস্ত মনুষ্য সমাজের দাসানুদাস, কিন্তু কোনও দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। দয়াময় প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন, এই সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিন প্রচার করিতে পারি।

কলিকাতা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার আশ্রম
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮ শক।

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলে তাঁহার অন্যতম বন্ধু কালীনাথ দত্ত ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কতিপয় শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত অপর একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। উহাতে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে 'গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণে উপযুক্ত বিচার হয় নাই, এবং তাঁহার অবলম্বিত মত যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী তাহাও সাধারণ ব্রাহ্মগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।' এইরূপে একদল গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র হওয়ার পক্ষে ও অপর দল তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের

মুখেও তাঁহার সাধুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিকী ঈশ্বরভক্তি ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদীতে ঐ সময় নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মন্তব্যগুলি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের সকল মতের সমর্থন না করিলেও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার অকপট ভক্তি ও সাধুতার প্রশংসা করিয়াছেন।

"গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা অতি অল্প লোকেই করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বার বার যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন আমাদের মধ্যে এরূপ কেহ করেন নাই। তাঁহার সত্যপ্রিয়তাতে আমাদের যেরূপ বিশ্বাস তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে দিন তিনি তাঁহার যে ভ্রম দেখিতে পাইবেন সেই দিন বিষাক্ত দ্রব্যের ন্যায় তাহাকে বর্জ্জন করিয়া আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে আলিঙ্গন করিবেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন সামান্য মতভেদের জন্য আমরা প্রেম ও কৃতজ্ঞতার ঋণ বিস্মৃত না হই।" *

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং প্রচারক সংখ্যা যেরূপ অল্প তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে নিজপদ হইতে অবসৃত হইতে দেওয়া কি সুখের ব্যাপার? যাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা আর কেহ করে নাই, যিনি ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, যিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য চিরদিনের মত দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্ত দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর মৃৎপিণ্ড মাত্র আহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, যিনি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্থল, তাঁহাকে সহজে ও অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে কে

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৮ শক, ১লা আষাঢ়।

পারে? বরং এই কথাই কি সত্য নহে যে, তাঁহার সহিত যে যে বিষয়ে মতভেদ তাহার বিচার বহুদিন হইতে হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকাতেই তাঁহার কার্য্যের প্রতি বহুদিন কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই।

গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার যে তিনি যেখানেই থাকুন তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিককতা ও প্রবল নিষ্ঠা দ্বারা বিশেষরূপে ধর্ম্মভাব প্রচারিত হইতেছে ও হইবে।"

"কিরূপে সত্যের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে হয় ইহার দৃষ্টান্ত আমরা যেমন তাঁহার নিকট পাইয়াছি এমন অতি অল্প স্থানেই দেখিয়াছি। তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রতিবাদ কে করিয়াছে? তিনিইত সর্ব্বপ্রথমে প্রতিবাদ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন, তিনি বিদ্ধতকীর্ত্তি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে সহায়তা করেন। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতি তাঁহার এই একমাত্র দাওয়া নহে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রতি সাধক নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে তিনি তন্মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।" *

তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের পদ ত্যাগ করিয়া মহৎ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যে সমাজকে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন, যে সমাজের উন্নতির জন্য তিনি তাঁহার কায়মনোপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং যাহার সেবায় ব্রতী হইয়া ভগ্নদেহ লইয়া অম্লানচিত্তে দেশে দেশে নগরে নগরে ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়া ফিরিতেন, তাহার সংস্রবত্যাগ সামান্য ত্যাগ নয়। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত বন্ধুদের সেবা ও সন্তোষের

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক, ১লা পৌষ।

জন্য তিনি কোন সুখ, কোন স্বার্থত্যাগে বিমুখ ছিলেন না; তাঁহাদের স্মৃতিতে তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইত, তাঁহাদিগকে দেখিলে তাঁহার হৃদয় প্রেমাশ্রুতে আর্দ্র হইয়া যাইত। এমন কি তাঁহাদের জন্ম স্থানের ধূলিকণা মাথায় তুলিয়া দিয়া তিনি নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক পদত্যাগ আর এই সমস্ত হৃদয়বন্ধুর সহবাস হইতে দূরে যাওয়ায় কোন প্রভেদ ছিল না। যাঁহারা তাঁহার এমন প্রাণের বন্ধু ছিলেন তাঁহাদের সহবাস হইতে দূরে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অবশ্যই ক্লেশকর হইয়াছিল। কিন্তু সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, পরমেশ্বরের জন্য সুখ দুঃখ সকলই তাঁহার নিকট তুচ্ছ ছিল; এজন্য কোন স্বার্থ সম্পদই তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। যেন "তাঁহার জীবনের গতি বাষ্পীয় শকটের গতির ন্যায় তীব্র ও অনন্যমুখাপেক্ষী ছিল। বাষ্পীয় শকট যেমন সরল ও প্রবল গতিতে অগ্রগামী হইবার সময় পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া চায় না, সৌন্দর্য্যপূর্ণ পার্ব্বত্য উপবন, কলনাদিনী গিরিনদী, হংসসারস-সমাকুল প্রস্ফুটিতকমল-শোভিত বিমল হ্রদ, অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী মহানগরী কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যাত্রীগণকে পলকে পলকে নবনব সৌন্দর্য্য দেখাইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে লক্ষ্যস্থলে ছুটিয়া যায়, তাঁহার জীবন-শকটও সরলতার পবিত্র পথে, ধর্ম্মানুরাগের তীব্রগতিতে, সংসারের মানমর্য্যাদা যশজিগীষা, ঘৃণালজ্জা, সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতা, স্নেহ মমতা এবং বন্ধুতা ও বিরাগ প্রভৃতিকে দুইপাশে অতিক্রম করিয়া উন্মাদ ব্যাকুলতায় অক্লান্ত সাধনায়, দর্শকমণ্ডলীকে নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্বে আলোকিত করিয়া লক্ষ্যস্থলে ছুটিয়া চলিয়াছিল।" *

গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের পদ ত্যাগ করিলে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন "আপনি ত ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলেন, এখন আপনার

* নব্যভারত ১৩০৬।

সংসার চলিবে কিরূপে"? তিনি বলিলেন "আমি মানুষের মুখাপেক্ষী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই। আমি যখন ব্রাহ্ম হইয়াছিলাম, তখন একটি ব্রাহ্মপরিবারও ছিল না। তখন আমার ব্যয়ভার কে বহন করিতেন? আমি চিরকালই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছি। এখনও তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া চলিব। সমুদ্রগর্ভস্থ প্রাণীর যিনি আহার যোগাইয়া থাকেন, আমি তাঁহারই হস্তে আমার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যাহা বিধান করিবেন তাহাই হইবে। মানুষ মানুষকে খাওয়ায় পরায় ইহা সম্পূর্ণ ভুল। একমাত্র ভগবানই সকলকে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তিনিই একমাত্র অন্নদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি চিরদিন তাঁহাতে নির্ভর করিয়া চলিতে পারি।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের পদ ত্যাগ করিবার পর তিনি ঢাকাতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে মনোনীত হন; এবং তথাকার প্রচার-আশ্রমে বাস করিয়া নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা ও আলোচনাসহকারে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ঢাকায় গিয়া তিনি তাঁহার তৎকালীন মত সম্বন্ধে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন; উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"সাধারণের নিকট নিবেদন।

লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম যে, নানাকারণে অনেকে মিথ্যা-রূপে অন্যায় করিয়া মনে করিতেছেন যে আমি পৌত্তলিক হিন্দু হইয়া গিয়াছি এবং এই অসত্য কথা চারিদিকে প্রচারও করিতেছেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্যই তাহার সহিত বাহিরের সম্বন্ধমাত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এতকাল জীবনে অবলম্বন ও প্রচার

করিয়া আসিয়াছি তাঁহা হইতে একচুলও অপসৃত হই নাই, কখনও হইব না। যাহা কিছু সত্য তাহা যেখানেই থাকুক আমার পবিত্র পূজনীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধানসমাজ, আদিসমাজ, হিন্দু সমাজ, খৃষ্টীয়সমাজ, মুসলমানসমাজ, আমি সকল সমাজেরই সেবক। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সব সম্প্রদায়ই আমার। যেখানে যতটুকু সত্য তত-টুকুই আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য আছে তাহার সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।

আমি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা অসত্য বলিয়া মনে করি এবং আমি তাহার বিরোধী। আমি একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাসনার লক্ষ্য ও সাধন বলিয়া জানি। তিনি একমাত্র গুরু এবং বিশ্ব সংসারের সকল পদার্থের মধ্যদিয়া যেমন ধর্ম্মশিক্ষা করি সেইরূপ মনুষ্যের নিকটও শিক্ষা করি। ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত মনে করি। রাধাকৃষ্ণের বা কালীদুর্গার নাম আমি কি সজনে কি নির্জ্জনে কখনও জপ করি না। রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক অশ্লীল ভাব অত্যন্ত ঘৃণা করি, কিন্তু উহার মধ্যে সাধক ও পরমেশ্বরের প্রেম সম্বন্ধীয় যে আধ্যাত্মিক রূপক আছে তাহার ভাব অতি উচ্চ বলিয়া মনে করি। সত্যদেবতা নিরাকার পরব্রহ্মকেই উদ্দেশ্য করিয়া যে কেহ যে নামে তাঁহাকে ডাকে সেই নামেই সে পাইবে মনে করি। কেননা, নাম কিছুই নহে। তাঁহার কোন নামই নাই। কিন্তু যে স্থলে কোন নাম ব্যবহার করিলে ঈশ্বর ব্যতীত কোন দেবদেবী বা বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায় সেখানে ঐ নাম ব্যবহার করা উচিত মনে করি না। সকল প্রকার অবতার বাদ, অভ্রান্তগুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তীবাদে মানবাত্মার অধোগতি হয়, বিশ্বাস করি। *

ঢাকা ব্রাহ্মপ্রচারক নিবাস	নিবেদক
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮ শক	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৮ শক, ১লা শ্রাবণ।

ঢাকাতে আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে তথায় তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপাসনা ও বক্তৃতায় লোকের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইল; দিন দিন উপাসক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেবল যে সামাজিক উপাসনাতেই অধিক লোকের সমাগম হইত এমন নয়, প্রচার আশ্রমেও সর্ব্বদা ব্যাকুল ধর্ম্মার্থীগণের সম্মিলন হইত। ঐ সময় তাঁহার ভক্তি, ব্যাকুলতা, বিনয়, ধর্ম্মানুরাগ আপামর সাধারণের প্রবল আকর্ষণের কারণ হইয়াছিল। ঢাকাতে বেদীতে উপাসনা কালে অনেক সময় তিনি দুই হস্ত বিস্তার করিয়া উপাসকগণের পদধূলি ভিক্ষা করিতেন। বলিতেন— "আপনারা আমার সহায় হউন, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি বিনয়ী হই, যেন আমি প্রভুর আহ্বান শুনিয়া সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দৌড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি; আপনারা আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন।" এইরূপ কাতরতা-পূর্ণ বাক্য সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিত, ধর্ম্মের জন্য উপাসকগণের প্রাণে ব্যাকুলতার উদয় করিত।

একজন শ্রদ্ধেয়া মহিলা * বলিয়াছেন;—"গোস্বামী মহাশয়ের ঢাকায় প্রচারআশ্রমে অবস্থান কালে প্রতিদিন দুইবেলা আশ্রমে কীর্ত্তন, আলোচনা ও উপাসনা হইত। গৃহে লোক ধরে না, বারাণ্ডায় রাশি রাশি পাদুকা একত্র হইত, পুরুষ মহিলারা অনেক সময় কীর্ত্তনে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। আমরা প্রায়ই কীর্ত্তনে উপস্থিত হইতাম। গাড়ী হইতে নামিতেই শরীর কণ্টকিত হইত, ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনিতে গৃহ প্রাঙ্গন সমস্ত যেন জীবন্ত সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে অনুভব করিতাম। প্রচারক নিবাসে অহর্নিশি মহোৎসব চলিত; সমস্ত নরনারী বৈষয়িক চিন্তা ভুলিয়া সমস্তক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান,

* ৺রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

গৃহী, ফকির, উদাসীন নানাশ্রেণীর লোক সর্ব্বদা দলে দলে গোস্বামী মহাশয়ের মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য, কীর্ত্তনের সময় তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া যে বাহু সঞ্চালন করিয়া মধুর হরিবোল হরিবোল বলিতেন তাহা শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। মন্দিরের উপাসনায় ও কীর্ত্তনে অনেক সময় এমন ভাবের তরঙ্গ উঠিত যে তাহাতে যুবকগণও স্থির থাকিতে পারিতেন না, অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে তুলিয়া বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া সুস্থ করিতে হইত, সময় সময় তাঁহারা এমন গভীর নাদে ব্রহ্মনাম করিতেন যে তাহা শুনিয়া প্রাণ উদাস হইয়া যাইত।”

একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন ;—“তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা ভগবানের নাম ও গুণানুকীর্ত্তন হইত ; হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ভেদ নাই, সকলেই আসিয়া তাহাতে যোগ দিত। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্যলীলা বিষয়ক গান হইতেছে, ব্রহ্মমহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে, তিনি সেই সমুদয়ের মধ্যে অচল, অটল ; সমুদয়ের মধ্য হইতেই তিনি তাঁহার গ্রহণীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় বাছিয়া লইতেন।” *

ঢাকা প্রচার আশ্রমে অবস্থানকালে অনেক সময় মফঃস্বল হইতে সাধনার্থী বহুলোক আসিয়া আশ্রমে মিলিত হইতেন ; এবং এক এক জন অনেক দিন বাস করিতেন ; আশ্রম সর্ব্বদা লোকজনে পূর্ণ থাকিত। যদিও অর্থের অভাব ছিল কিন্তু অতিথির অভাব ছিল না। সময় সময় (সম্ভবতঃ অসচ্ছলতাবশতঃ) লোকবাহুল্যে আশ্রমস্থ মহিলারা যেন একটু বিরক্তির ভাব পোষণ করিতেন ; এবং কখন কখন উহা বাহিরেও প্রকাশ হইত। গোস্বামী মহাশয় এইরূপ ব্যবহারের অত্যন্ত প্রতিবাদ করিতেন ; এবং লোকসমাগমে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিতেন ;—‘কে কাহাকে খাইতে দেয়, ঈশ্বরই সকলকে খাওয়ান।’ +

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৮ শক।
+ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

ঢাকা আশ্রমে অবস্থানকালে বারদির ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। এই গুপ্তযোগীর সংবাদ তিনিই শিক্ষিত সমাজে প্রথম প্রকাশ করেন; ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মচারীর নাম শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাত ছিল। ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আলাপে উভয়ে উভয়কে চিনিয়া লইলেন; এবং পরস্পরের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইল। বারদি গ্রামে একজন অসাধারণ জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার মুখে একথা শুনিয়া ঢাকা হইতে অনেক শিক্ষিত লোক তাঁহার দর্শনাশায় বারদি গমন করিতে আরম্ভ করেন; এবং নানাস্থান হইতে বারদিতে লোক সমাগম হইতে থাকে। বারদির ব্রহ্মচারী একদিন এক মহান্তকে বলিয়াছিলেন (গোস্বামী মহাশয়কে দেখাইয়া) "তোমার মহাপ্রভু নিমকাঠের কিন্তু আমার মহাপ্রভু সচল।"

এইবার ঢাকাতে 'জীবনের লক্ষ্য,' 'ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী,' 'প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা,' 'উপাসনা ও পরকাল' সম্বন্ধে তাঁহার কতিপয় হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা হইয়াছিল। উৎসব ও প্রচার উপলক্ষে কাকিনা, ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান দুবড়ী, বাঁকীপুর, মোকামা, দ্বারভাঙ্গা এবং আসামের নানাস্থানে গিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের উৎসবের উপদেশে প্রতিপন্ন করেন "দেবকী শ্রদ্ধা, নন্দ—আনন্দস্থান, যশোদা সুকৃতি, গো ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয় বিষয় সকল।" বলা বাহুল্য সর্ব্বদা হিন্দুশাস্ত্রের এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি তাঁহার আন্তরিক ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল কোথায় তাহারই পরিচয় দিতেন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে দ্বারভাঙ্গা গমন করেন। তথায় রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের গৃহে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন। ২।৩ জন বিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রাণপণ চেষ্টায় মাসাধিক কালেও রোগের উপশম হয় না। অবশেষে তাঁহার

প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া আত্মীয়গণের নিকট সংবাদ দিতে বলেন। তদনুসারে জননী, পত্নী, পুত্র, কন্যা সকলে দ্বারভাঙ্গা উপস্থিত হন।

রবিবারে রাধাকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হইত রবিবারে ডাক্তারগণ বলিলেন অদ্য বিকালে গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবে। শুনিয়া সকলেই বিমর্ষ হইলেন। কিন্তু সময় অতীত হইল, গোস্বামী মহাশয়ের দেহত্যাগ হইল না। ব্রাহ্মগণ উপাসনায় আসিয়া ধীরে ও সন্তর্পণে উপাসনা শেষ করিয়া মৃদুভাবে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন শুনিয়া গোঁসাইর নৃত্য আরম্ভ হইল; রোগ, দুর্ব্বলতা অবসাদ কোথায় চলিয়া গেল। তাঁহার সেই নৃত্য এবং হরিনামের উচ্চধ্বনি তাঁহার কোন রোগ হয় নাই ইহাই প্রমাণ করিতে লাগিল। সকলে স্তম্ভিত হইলেন। আশঙ্কা হইল ইহার পরই পরিশ্রমজনিত অবসাদে সমূহ অনিষ্ট হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কোনই ক্ষতি হইল না। পর দিন তিনি অন্ন পথ্য করিলেন। ডাক্তারেরা ভয়ে ভয়ে আসিতেছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন "ভয় নাই, আসুন, আমি মরি নাই।" তাঁহারা অবাক হইয়া রহিলেন। শিষ্যগণের অসাধারণ সেবা যত্ন ও পরিশ্রম লক্ষ্য করিয়া গোঁসাই পত্নীকে বলিয়াছিলেন "ইহারা আমার মা বাপ।"

ইহার পর শিষ্য এবং আত্মীয়গণের সহিত কলিকাতা যাত্রা করেন। তাঁহার গুরুদেবও সঙ্গে ছিলেন। গোঁসাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এখন লিচুর সময়, আমরা লিচু না খাইয়া চলিয়া আসিলাম হয়ত মজফর পুরের লিচু খাইবার জন্য লিচুর পোকা হইয়া জন্মাইতে হইবে।" শুনিয়া পরমহংসজী বলিলেন "লিচু খাইবে?" তিনিও সম্মতি জানাইলেন তখন বাবাজী তাঁহার জামার পকেট হইতে তাঁহাদিগকে লিচু দিলেন।

তাঁহার ময়মনসিংহের প্রচার বিবরণে আছে;—"১৮৮৭ সালে মাঘোৎসবের কয়েকদিন পরেই সারস্বত উৎসব আসিল। 'এবার সার

যতের একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে সমিতির সভ্যগণ এতদুপলক্ষে ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের দলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের দল বিশেষভাবে পুষ্ট ছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাউলসঙ্গীত রচয়িতা হরিনাথ মজুমদার সদলে, ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক বাবু চন্দ্রনাথ রায়, এবং নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং গোস্বামী মহাশয় সদলে আসিয়াছিলেন। কয়েক দিন খুব ধুমধামে কাটিয়াছিল। ফকিরচাঁদের গানে, মন্মথবাবুর উন্মাদিনী বক্তৃতা, গোস্বামী মহাশয়ের মহাভাব নগরবাসীদিগকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম দিগ্বিজয়ী বক্তারূপে নবধর্ম্মের বিজয়ভেরী বাজাইয়া পূর্ব্ববঙ্গ কম্পিত ও সর্ব্বত্র নবজীবনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, আর [illegible] সময়ে যাহার মুখে মা নাম শুনিয়া শুষ্ক বিষয়ী ও পাপ-মলিন পাষাণপ্রাণ মানবের চিত্ত বিগলিত হইতেছিল এইবার আমরা তাঁহার পবিত্র সংসর্গ শেষবার লাভ করিলাম। ময়মনসিংহে আর তাঁহার আগমন হয় নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতে আর সেই অমৃতবাণী শ্রবণ করি নাই।" *

এইবার শ্রীনাথ বাবুর এক পুত্রের নামকরণ হয়। উপাসনার পর যখন প্রার্থনা করিতে করিতে শিশুর মুখে অন্ন দিতেছিলেন তখন বলিতেছিলেন "আজ আবার শিশু হইয়া তোমার হাতের এই মহাপ্রসাদ খাইতেছি।" এই বলিয়া পায়সান্ন একবার শিশুর মুখে একবার নিজের মুখে দিতে দিতে আত্মহারা হইলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই প্রাণ বিগলিত হইল।

গোস্বামী মহাশয় নানাস্থান ঘুরিয়া পরবৎসর (১২৯৪) আষাঢ় মাসে পুনরায় ঢাকা উপস্থিত হইলেন। এই সময় তাঁহার শরীর এরূপ ভগ্ন

---

* শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের লিখিত ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর হইতে সংগৃহীত।

হইয়াছিল যে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য পদ্মাতে গিয়া বাস করিতে হইল। পদ্মার বিশুদ্ধ বায়ুতে শরীরের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে পুনরায় ঢাকাতে কার্য্য আরম্ভ করেন; কিন্তু জননীর উৎকট পীড়ার সংবাদে পুনরায় শান্তিপুর যাইতে বাধ্য হন।

এ দিকে ব্রাহ্মসাধারণের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল উহা দূরীভূত হয় নাই। ঐরূপ মতভেদ হেতু ঢাকাতেও কোন কোন সভ্যের মনে আন্দোলন উঠিয়াছিল। ইহারই ফলে স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় ব্রাহ্মের উদ্যোগে উক্ত সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ তথাকার প্রচারক-নিবাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন।

(১) "যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চাদর্শ ও পবিত্রতা খর্ব্ব হয় প্রচারনিবাসে এমন কোনও কার্য্য হইতে পারিবে না। (২) মন্দিরে যখন উপাসনা বক্তৃতা বা উপাসনাদি হইবে তখন তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে এমন কোনও কার্য্য প্রচারকনিবাসে বা প্রচার কার্য্যালয়ে হইতে পারিবে না। প্রচারকনিবাসে যে আচার্য্য বা প্রচারক বাস করিতেছেন তাঁহার সম্পর্কীয় অথচ ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোনও ব্যক্তি যদি তাঁহার সহিত উক্ত বাটীতে থাকেন তবে উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী দৈনিক পূজা অর্চ্চনাদি করিতে পারিবেন। (৩) যাহাতে পৌত্তলিক অথবা নাস্তিকভাবের উদ্রেক হইতে পারে অথবা যাহা অন্য কোনও প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী এরূপ কোনও কার্য্য, গান বা সংকীর্ত্তন এই প্রচার-কার্য্যালয়ে হইতে পারিবে না। (৪) প্রচারকার্য্যালয়ে কোনও ধর্ম্মকে নিন্দা বা উপহাস করা হইবে না। কিন্তু সকল প্রকার ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিবে। (৫) রোগ প্রতীকার ভিন্ন অন্য কোনও কারণে কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য প্রচার কার্য্যালয়ে গ্রহণ বা সেবন করা হইবে না

তামাকু ও নস্য এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নহে)। (৬) যাহাতে পৌত্তলিক বা অপবিত্র ভাবের উদয় হইতে পারে এরূপ কোনও প্রকার চিত্র বা মূর্ত্তি প্রচার কার্য্যালয়ে রাখা হইবে না। (৭) আমাদের দেশে যে প্রকার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিবার রীতি প্রচলিত আছে, প্রচারকার্য্যালয়ে সেরূপ অভিবাদন চলিতে পারিবে, কিন্তু এখানে কেহ কাহাকেও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে বা কাহারও চরণ ধরিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরে প্রচারনিবাস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পাইয়া সম্পাদক রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়কে লিখিলেন ;—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার পত্র এবং পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত প্রচারক নিবাস সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলাম। এবিষয়ে আমি অধিক কিছু লিখিতে চাহি না, তবে এই মাত্র বলিতেছি যে আমি যে নিয়মে প্রচারকনিবাসে চলিয়া থাকি আমার বিশ্বাস মতে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করে না। বরং এই প্রণালীতে সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছে।

আপনারা যদি আমার প্রচারপ্রণালী মনোনীত না করেন আপনাদের বিশ্বাসমত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত নিয়মাবলীতে সম্মত হইয়া আমি প্রচারনিবাসে বাস করিতে পারি না। সুতরাং আমাকে ভিন্ন বাসা করিয়া থাকিতে হইবে। ভিন্ন বাসা করিলেই যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ থাকিবে না, তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আমার জীবনের ব্রত। যেখানে থাকি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াই জীবন শেষ করিব। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার জীবনের ব্রত পালন করিয়া যাইতে পারি।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৮০৯ শক। } নিবেদক

কলিকাতা। } শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ইহার পর কলিকাতার ন্যায় ঢাকাতেও তাঁহার কার্য্য ও আচরণ লইয়া কতিপয় লোক আপত্তি উত্থাপন করিলে তথাকার কার্য্যনির্ব্বাহকসভা এ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। তদুত্তরে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া তিনি তথাকার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও বাহিরের সম্পর্ক রহিত করিলেন ;—

"সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মজ্ঞানে পালন করিয়া থাকি। আমার কার্য্য লইয়া কেহ প্রতিবাদ করিয়া আলোচনা করিলে তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, সত্যই তিনি। সুতরাং সত্য অজর অমর। যাহা সত্য তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। অসত্য বায়ুরাশিতে মিলিয়া যাইবে।

যাঁহারা আমার কার্য্য লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, আমার ভ্রম বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদের সহিত প্রণাম করি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" *

ইহার পর ঢাকা আসিয়া তিনি আর প্রচারক নিবাসে অবস্থান করেন নাই। প্রথমে ঢাকার পাতলাখাঁর গলিতে শিকওয়ালা বাসায় ও পরে একরামপুরে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় বাস করেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতেন। যে সমস্ত ব্রাহ্ম মফঃস্বল হইতে উৎসবের সময় ঢাকা আসিতেন তাঁহারা তাঁহার নিকট গিয়া আগ্রহের সহিত তাঁহার মধুময় ধর্ম্মকথা শুনিতেন।

তখন ঢাকাতে তাঁহার কার্য্য লইয়া খুব আন্দোলন উঠিয়াছিল। কিন্তু যাঁহার বিষয়ে আন্দোলন তিনি সম্পূর্ণ নীরবে স্বীয় ব্রত সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। চতুর্দ্দিকের বাদ প্রতিবাদের মধ্যে তাঁহার প্রশান্ত ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই।

* পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যবিবরণ।

ব্রাহ্মসাধারণের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিয়াছিল তাহা তিনিও বুঝিতেন; কিন্তু তবু নিজেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত মনে করিতেন না। নিজেকে ব্রাহ্মই বলিতেন। ব্রাহ্মগণকে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতে দেখিয়াও অসন্তোষ প্রকাশ বা তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিতেন না। বরং যে যে মতে অমিল হইয়াছে, ব্রাহ্মগণের পক্ষে সরলভাবে তাঁহার সেই সেই মতের প্রতিবাদ করা ন্যায় সঙ্গতই বোধ করিতেন। বলিতেন "যদি ব্রাহ্মেরা আমার মতের প্রতিবাদ না করিতেন তাহা হইলে আমি মনে করিতাম, ব্রাহ্মসমাজ মরিয়া পচিয়া পুতি-গন্ধময় হইয়া গিয়াছে।" যিনি স্বয়ং এক সময়ে নানা প্রকার সংস্কার জন্য ঘোর প্রতিবাদকারী ছিলেন, অপরে তাঁহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহার কি বলিবার থাকিতে পারে? সরলভাবে অভিসন্ধিবিহীন হইয়া ন্যায়ের, সত্যের সমর্থন করা যেমন তাঁহার স্বভাব তেমনই ধর্ম্ম বুদ্ধিতেই ব্রাহ্মগণও তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতেছেন জানিয়া তিনি উহার সমর্থনই করিতেন।

নানাপ্রকার বাদ প্রতিবাদের মধ্যে কোন্ শক্তি তাঁহার প্রশান্তভাব রক্ষার সহায় হইয়াছিল? কোন্ শক্তি তাঁহাকে নিয়ত তাঁহার ব্রত সাধনে ও মধুর সন্তাপহারী উপদেশ দানে নিযুক্ত রাখিয়াছিল? ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত অপর কাহারও সে সাধ্য নাই। এই ব্রহ্মশক্তির উপর তাঁহার জীবনের সমস্ত ভার ন্যস্ত ছিল বলিয়াই ধীরভাব রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল।

এই ব্রহ্মযোগ সাধন দ্বারা তিনি যে পরমবস্তু লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকাশ করিতেছি;—"ঈশ্বর কৃপায় গয়া-তীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্ব্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্তু এ টুকু না বলিলে মিথ্যা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে

আমার অভাব মোচন হইয়াছে ; এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।"*

'আমার অভাব মোচন হইয়াছে' এইরূপ কথা মানুষ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইলে বলিতে পারে তাহা বিবেচনা করা উচিত। আর ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যই বা কি হইতে পারে ? সংসারে মানুষ অহর্নিশি ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু ইনি এই ঘোর সন্তাপের মধ্যে তাপ বিহীন শান্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন "আমার অভাব মোচন হইয়াছে। এরূপ লোকের কথায়ই নর নারীর প্রাণে আশা হয়। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যেমন অবাঙমনসোগোচর ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ;
বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ কর, আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি।" ইঁহার বাক্যও সেইরূপ।

ঢাকা, একরামপুরের বাসায় একবার ধূলোট উৎসবে সাত দিন খুব কীর্ত্তন হয়। শ্রীহট্টবাসী একজন বাবাজি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনে মহাভাবের আবির্ভাবে একজন লোকের দেহত্যাগ হয়, ও কয়েক জনকে অজ্ঞান অবস্থায় গৃহে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। সাতদিন কীর্ত্তনের পর নগর কীর্ত্তন হয় ; "কলিতে তারক ব্রহ্ম হরিনাম" গায়কদল এই গানে মাতিয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। কীর্ত্তনের সময় দুইটি লোক গোঁসাইকে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছিল। উৎসবের পর গোঁসাই কাকিনা, ধুবড়ী, কামাখ্যা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন।

---

* যোগসাধন।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়ার সময়ে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের মত ব্রাহ্মসমাজের মত হইতে স্বতন্ত্র, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়গণের মত সংগ্রহ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে লিখেন "যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যানে, ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস পুস্তকে তাহা তিনি সুব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকলের বিপরীত যিনি যাহাই বলুন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে।" রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্রের কতকাংশ এইরূপ;—

"কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেওঘরে আইসেন। তাঁহার সহবাসে একদিন থাকিয়া দেখিলাম, তাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্রাহ্মসমাজে বিরল। যে একদিন এখানে ছিলেন তাঁহার সহবাসে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু উল্লিখিত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের সঙ্গে তিনি এমত কতকগুলি মত অবলম্বন করিয়াছেন যাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শাস্ত্রসঙ্গত নহে; এবং যাহা অবলম্বন জন্য ব্রাহ্মেরা নিজ সম্প্রদায়ের বক্ষে তাঁহাকে রাখিতে পারেন না; আর তাঁহারও তাহাতে থাকা উচিত হয় না। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া একটা নূতন হিন্দু সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন তাহা হইলে উক্ত অসঙ্গতি দোষ দূর হয়; এবং তিনি আমার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন; আমি অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের (ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে আমি হিন্দু সম্প্রদায় জ্ঞান করি) একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রম সত্বেও যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তাঁহাকেও সেরূপ শ্রদ্ধা করিব। আমি তাঁহাকে একজন প্রকৃত

সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করি। মতবিভেদ সত্ত্বেও আমি ঐরূপ জ্ঞান করি। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আমি কখনই প্রত্যাশা করিতে পারি না, যে সকল মনুষ্য এক মতাবলম্বী হইবে।

স্নেহশীল

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।"*

ইহার পর গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বর্ত্তমান মত সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র লেখালেখি হয়। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

মহর্ষির পত্র। †

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার মূর্ত্তি যেমন সৌম্য, তোমার প্রকৃতি যেমন ধীর, তোমার ঈশ্বর-প্রেম তাহারই সদৃশ। তুমি একদিন শুভক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে তাহাতে আকৃষ্ট হইলে এবং কত কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আমার সমধিক আশা ছিল; কিন্তু তিনি পরম পিতার আহ্বানে অল্প বয়সেই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমাদের প্রতিই আমার সকল আশা ভরসা নিহিত। তন্মধ্যে তুমি ধার্ম্মিক প্রচারকদিগের অগ্রণী হইয়া এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় প্রাণ মন অর্পণ করিয়া খাটিতেছ। "নামাদেনন্তস্ত হতত্রপঃ পটন্ গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্ গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্ নমদো বিমৎ-সরঃ।" তোমাকে এই যে উপদেশ দিয়া প্রচারকের আদর্শ দেখাইয়া-

* তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৯ শক, ১লা পৌষ।

† তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক, ১৬ই ফাল্গুন।

ছিলাম তুমি সেই আদর্শকে ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া প্রচারকের নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে ব্রহ্মবীজ ছড়াইয়া বেড়াইতেছ। তোমার নিষ্কাম ভক্তি ও ঈশ্বরেতে প্রীতি তোমার আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তোমার উৎসাহ জীবন্ত; যে উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে তুমি আমার নিকটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে। তোমাদের মধ্যে আমি আর অতি অল্প দিনই আছি। যখন এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব তখন ব্রাহ্মসমাজ কেবল তোমাদেরই জীবন হইতে আলোক পাইয়া উজ্জ্বল হইবে এবং তোমাদেরই আত্মা হইতে জ্ঞান, ধর্ম্ম লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই আমার শেষ জীবনের আশা ও আনন্দ। এই আনন্দেই আমার শরীর সবল হয় ও ইন্দ্রিয় সতেজ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মাসের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে তোমার উপরে কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মতের আরোপ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ-চিত্ত হইয়া আমার জরাজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরেও তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। "সাধুদিগের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাখা, পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্মসাধনের উপায়; শক্তিসঞ্চার দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে দীক্ষা প্রদান করা; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনা আপনি পৌত্তলিকতা জাতিভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে; পূর্ব্বে ঐ সকল ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষতি নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম সরলভাবে বিশ্বাস করে সেই ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্য লাভ করিবে; সিদ্ধ-যোগীর সূক্ষ্ম শরীরে আগমন ও আলাপাদি করা, এই সকল' কথা তোমার মত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের

মত ও বিশ্বাসকে এই সকল অবথাবাদ ও কুসংস্কারযুক্ত করিয়া প্রচার করিতে হইলে তাহার গতিরোধ করা হয়। একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্যই এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন। এই চেষ্টা ও যত্নের পরিণাম কি এই হইবে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে না? আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই আত্ম-প্রত্যয়ের স্থানে কি এখন সাধুর পদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাখিলে এবং অন্য কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে? এই প্রত্যয় যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মূল্য থাকে না, "হৃদা মনীষা মনসাভি ক্লপ্ত" অর্থাৎ হৃদ্‌গত সংশয় রহিত বুদ্ধির যোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষি-বাক্য মিথ্যা হয়; এবং আধ্যাত্মিক যোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলবিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ধ্রুব সত্য। তাহা প্রথম যুগে যেমন শেষ যুগেও তেমনি। দ্যুলোকেও যেমন ভূলোকেও তেমন। তাহার রূপান্তর হয় না, পরিবর্ত্তন হয় না। তাহা সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর। তাহা মধুময়, প্রাণময়। এই সত্য তোমার হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক; তোমার প্রতি আমার এই শুভ আশীর্ব্বাদ। প্রার্থনা করি যে তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মগত বিভিন্নতা তিরোহিত হইয়া সাম্য বিরাজ করিতে থাকুক। তোমরা সকলে একহৃদয় একপ্রাণ হইয়া সত্য প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত

হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে আনন্দে পদনিক্ষেপ কর। ইতি ১৭ই পৌষ ১২৯৪ সন।

নিতান্ত শুভকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

উত্তর। *

ওঁ

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্,

মহাশয়ের ১৭ই পৌষ তারিখের আশীর্ব্বাদপত্র পাইয়া সন্তুষ্ট ও আপ্যায়িত হইলাম। দুর্ব্বল শরীরে এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ দ্বারা আমার প্রতি আপনার অবিচলিত স্নেহেরই পরিচয় দিয়াছেন। প্রার্থনা করি যেন আপনাদের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাকিয়া জীবনে সত্যস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি।

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমার এইরূপ বিশ্বাস এবং এই সত্য আমি চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছি। কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে কোনও সমাজ বা ব্যক্তি যে সকল সত্য প্রচার করেন তদতিরিক্ত কোনও নূতন বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় কেহই মনে করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মসমাজের নিকট হয়ত এখনও এমন অনেকগুলি সত্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে যাহা সহস্র সহস্র বৎসর মধ্যে ব্রাহ্ম সাধকের জীবনের মূল হইয়া দাঁড়াইবে। আর আমি যে পথে চলিতেছি, তাহা ঋষি-প্রবর্ত্তিত পথ; অতি পুরাকাল হইতে তদবলম্বনে অনেক মহাপুরুষ কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান গ্রন্থেও তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। "হৃদা মনীষা

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক ১৬ই ফাল্গুন।

মনসাভি ক্লপ্ত” এই শ্লোক শিরোধার্য্য করিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং ধ্রুব সত্য বলিয়া জানি যে নিঃসংশয় বুদ্ধিযোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশ ও লাভ হয়; কিন্তু বুদ্ধির অসংশয়তা লাভ অনায়াস সাধ্য নয়। তাহার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যদি তাহা না হয়, তবে ধর্ম্ম প্রচারের ও উপদেশের আবশ্যকতা থাকে না। মনের সেই উন্নত অবস্থা লাভের জন্য বিবিধ উপায় থাকিতে পারে। যিনি যাহাতে ফল লাভ করেন, তিনি তাহা অবলম্বন করুন। আমি এমন কথা বলি না যে আমার প্রণালী ভিন্ন অন্য প্রণালী নাই। কিন্তু যে উপায় আমার ব্রহ্মযোগ লাভের পক্ষে আমাকে সহায়তা করিয়াছে ও করিবে, তাহা আমার প্রাণের বস্তু, অতি আদরের ধন; সে ধনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। ধর্ম্ম-সাধনের উপায় সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থেই এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাই;—“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।” ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে সদ্‌গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেই হইবে। পৌত্তলিক ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকদিগকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ লোকেরই আধিক্য, যাঁহারা ব্রাহ্মমতে ধর্ম্মচর্য্যা করেন, অথচ নিজ নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের অপেক্ষা সরল-বিশ্বাসী সাকারোপাসকের অবস্থা আমি শ্রেষ্ঠ মনে। আর প্রকৃত বস্তু লাভ করিলে যখন সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতি ও সাম্প্রদায়িকতা সর্পকঙ্কবৎ স্বতঃই স্খলিত হইয়া পড়ে, তখন ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে আচারগত পার্থক্য আছে বলিয়াই কাহাকে পরিত্যাগ

করিতে হইবে, আমি এরূপ মনে করি না এবং প্রাণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সহসা তাহার গ্রহণ শক্তির অতীত সত্য তাহার সম্বন্ধে প্রচার করিলে তাহার হিত অপেক্ষা অনিষ্টেরই অধিক সম্ভাবনা; এবং আমার এই বিশ্বাস যে ঋষিগণও অধিকারী ভেদে ধর্ম্মগ্রহণের বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আমি অনন্ত জীবনে অনন্ত সত্য লাভ করিয়া সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, আপনার পদপ্রান্তে বিনীত ভাবে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।

'যোগসাধন' নামে একখানা পুস্তিকা প্রেরিত হইল। কাহারও দ্বারা উহা পড়াইয়া শ্রবণ করিলে আমার মতামত অনেক বিষয় আপনি জানিতে পারিবেন।

ঢাকা
১২৯৪ সন, ২০ পৌষ।

প্রণত
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মহর্ষির দ্বিতীয় পত্র। *

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ২০ শে পৌষ দিবসের পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বহু অন্বেষণ ও বহু সাধন করিয়াছ। যাহা সত্য বলিয়া তোমার প্রতীত হইয়াছে তাহা তুমি চিরদিন ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছ। তুমি অবশ্য অবগত আছ যে, সকল যোগ অপেক্ষা অধ্যাত্মযোগ আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ তুমি ব্রাহ্মদিগকে এই যোগের শিক্ষা দেও, ব্রাহ্মসমাজের হিত সাধন কর।

যদি জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি অপরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক, ১৬ই ফাল্গুন।

হয়, তবে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হইবে না? এমন কখনই হইতে পারে না। নিপুণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে হইলে বিদ্বান গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ আছে;—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু মেবাভি গচ্ছেৎ।" সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত তাঁহার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের কিছুই মাহাত্ম্য নাই। ইহা কখন ধর্ম্মসাধনের উপায় নহে। সদ্‌গুরুর নিকটে শিক্ষা লাভ করাই একমাত্র উপায়।

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কর। কিন্তু একথা বলিওনা যে;—"যাহার যাহা বিশ্বাস তিনি তাহাই সরল ভাবে সাধন করুন, কালে সত্য লাভ করিবেন।" একথা বলিলে কার্য্যেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদেশও আবশ্যক থাকে না। এইরূপ বাক্যে নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি জিজ্ঞাসুর চৈতন্যের উদ্রেক করা দূরে থাকুক বরং তদ্বিরুদ্ধে সাকার দেবদেবীর প্রতিই তাহার সংস্কারকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয়। অতএব ইহাতে সাবধান থাকিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় যেরূপ মনপ্রাণ দিয়া কর্ম্ম করিতেছ, সেইরূপই করিয়া ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন করিতে থাক। ইতি ২৬ শে পৌষ ৫৮।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

দশম পরিচ্ছেদ

গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কয়েক বৎসর ঢাকাতে অবস্থান করেন। প্রথম কতকদিন নানাস্থানে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিলেন, পরে গেণ্ডারিয়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। গেণ্ডারিয়া তখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয়ে দিবাভাগেও লোকের তথায় যাইতে সাহস হইত না। বহু অনুসন্ধানে জঙ্গলের একটী গোরস্থান তিনি আশ্রমের জন্য মনোনীত করেন; এই স্থান এক সময়ে কতিপয় ফকিরের সাধনস্থল ছিল। সাধনার প্রিয়সন্তান বিজয়কৃষ্ণ সাধনার অনুকূল স্থানই নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন।

শিষ্যগণের এক এক মাসের আয় দিয়া জমি খরিদ করা হয়। ১২৯৫ সনের জন্মাষ্টমীতে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। চারি খানি খড়ের ঘর, একটি পাকা কোঠা, ও গোস্বামী মহাশয়ের সাধনের জন্য মাটির দেওয়াল যুক্ত একখানি খড়ের ঘর প্রস্তুত হইল। সাধন কুটীরের এক অংশে সাধনের স্থান ও অপর অংশে কীর্ত্তন ও শিষ্যগণের সহিত আলাপাদির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কুটিরের সম্মুখস্থ আম গাছের নীচে পাঠ ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হইত।

প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চা পান হইত, পরে কুঞ্জবাবু চৈতন্যচরিতামৃত ও নরোত্তমদাসের প্রার্থনা পাঠ করিতেন। পরে গোঁসাই গুরু নানকের গ্রন্থসাহেব ও তুলসীদাসের রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি পড়িতেন। প্রায় ১১টায় পাঠ সমাপন হইলে আহারাদি হইত। আহারান্তে আমগাছ তলে ভজন ও সমাগত লোকদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা হইত। সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন ও পরে শিষ্যগণের সহিত সাধন ও সাড়ে নয়টায় আহার হইত। প্রতিদিনের সব কাজ ঘড়ি ধরিয়া হইত; সময়ের

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বৃথা কথা বলিয়া সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে সর্ব্বদা এইরূপ ধর্ম্মসাধন চলিত। কখন কখন প্রচারার্থে সশিষ্য মফঃস্বল গমন করিতেন। ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল তাঁহাদের আহ্বানে সময় সময় উৎসবাদিতে নানাস্থানে যাইতেন; এবং লোকদিগকে যোগসাধনে দীক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাদিতে ও কার্য্যবিবরণীতে তাঁহার এই প্রচারবিবরণ প্রকাশ করিতেন না।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমের আর্থিক অবস্থা কতকদিন অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। তখন কয়েকজন শিষ্যসহ তথায় বাস করিতেন। একদিন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমে উপনীত হইলে যোগজীবনবাবু তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন অভিলাষ করেন। নগেন্দ্রবাবু যথাসময়ে স্নানাদি করিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন, কিন্তু এদিকে রন্ধনের কোনই আয়োজন নাই; কারণ সে দিন রন্ধনের কোন উপকরণই ছিল না। ইতিমধ্যে মাষ্টার আনন্দবাবুর বাড়ী হইতে বিবিধ প্রকারের দ্রব্য আসিল। গোঁসাই সহাস্যে বলিলেন;—"আপনার সিধে আসিল।" নগেন্দ্রবাবু হাসির অর্থ না বুঝিয়া বলিলেন;—"হাস্‌ছেন কেন?" গোঁসাই বলিলেন "আজ আমাদের ঘরে একটীও পয়সা ছিল না যে নিজেরা খাই বা আপনাকে খাওয়াই। ভাবিলাম নিজেরা বরং উপবাস করিব, কিন্তু আপনি নিমন্ত্রণে এসে ফিরে যাবেন এ কেমন হবে? শেষে মনে করিলাম বিধাতা কিছু জুটিয়ে দিবেন, তা দেখছি যথাসময়ে আপনার জন্য সিধে এসেছে।" নগেন্দ্রবাবু বলিলেন "যোগজীবন আমাকে রেঁধে খাওয়াবেন বলেছেন।" গোঁসাই সহাস্যে চক্ষুতে হাত বুলাইয়া বলিলেন "তা'হলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে খেতে হবে।"

অর্থাৎ ভাল রাঁধা হবে না বলে খাইতে খুব কষ্ট হবে। তারপর যোগজীবনবাবু স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইলেন। *

এইরূপ অসচ্ছলতার অবস্থাতেও আনন্দের অভাব ছিল না। তিনি অনেক সময়ই ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। কত সময় আহার করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেন, আর দুইগণ্ড বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িত; কখনও আপনমনে কত কি বলিতেন, অন্যেরা নিজ নিজ আসনে চুপ করিয়া আহারে বিরত হইয়া শুনিতেন। কখনও আহারস্থলে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া যেন আহার হইয়াছে এই ভাবে উঠিয়া যাইতেন।

ঢাকার আশ্রমে অবস্থান কালেই তাঁহার শিষ্য সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অনুগত শিষ্যগণ পৈতৃক বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ বা বিক্রয় করিয়া আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনুরাগের কথা মনে হইলে সত্যযুগের কথা স্মরণ হয়। তাঁহারা তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের কার্য্যে ইহাই মনে হইত।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অনেক সময় দলে দলে স্কুল কলেজের যুবকগণ তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা, গোপনীয় কথা বলিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকের তিনি পরামর্শদাতা, বন্ধু, সহায় ও পরম আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার নিকট কোন গুহ্য কথা প্রকাশ করিতে কাহারও সঙ্কোচ ছিল না। তাঁহার শত্রু কেহ ছিল না, তিনি ছিলেন অজাতশত্রু, উদার-প্রেমে আপামর সাধারণ সকলকে তিনি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

ঢাকাতে ১২৯৫ সনে ২৬শে ফাল্গুন তাঁহার একমাত্র পুত্র যোগজীবন বাবুর এবং কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীর বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি মতে সম্পন্ন হয়। হিন্দু শিষ্যদের কেহ কেহ বিবাহ হিন্দুমতে হয় এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, বিবাহ ব্রাহ্মমতেই হইবে; এবং তাহাই হইল। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সম্পাদক রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় কন্যার বিবাহে এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রের বিবাহে পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, আর গোঁসাই উপদেশ দিলেন। উভয় বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩আইন মতে রেজিষ্টরী হইল।

বিবাহের দিন মধ্যাহ্নে সকলে আহারে বসিয়াছেন, আহার প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় নগেন্দ্রবাবু সহাস্যে বলিলেন "গোঁসাই দৈ দিবেন না? দৈ না দিলে আমরা উঠিব না।" গোঁসাই সহধর্ম্মিণীর দিকে চাহিয়া দৈ দিতে বলিলেন। তাঁহার পত্নী সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন "কেবল এক হাঁড়ি দৈ আছে তাহাতে সকলের হইবে না এজন্য উহা বাহির করি নাই।" গোঁসাই পত্নীর নিকট হইতে দধির পাত্র লইয়া নিজে পরিবেশন করিলেন, এবং পরিতোষপূর্ব্বক সকলের ভোজন হইল।

রজনীবাবু পুরোহিতের কার্য্য করিবেন শুনিয়া শিষ্যদের কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা বিবাহ হয়। ইহার উত্তরে গোস্বামী মহাশয় বলেন, "আমি ইঁহাকেই ব্রাহ্মণ মনে করি।" রজনীবাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল; তাঁহাকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বহু লোকে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, অথচ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত রজনীবাবু দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই দেখিয়া একদিন গোঁসাইর শাশুড়ী ঠাকুরাণী রজনীবাবুকে দীক্ষা লইতে বলিলেন। রজনীবাবু প্রায়ই গোঁসাইর নিকট গিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ও কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। রজনীবাবু নীরব প্রকৃতির লোক, তিনি ঠাকুরাণীর প্রস্তাবে কোন উত্তর না করিয়া

নিরুত্তর রহিলেন। বৃদ্ধা ঠাকুরাণী অবশেষে গোঁসাইর নিকট রজনীবাবুর দীক্ষার কথা বলিলেন। গোঁসাই বলিলেন "ইঁহার পক্ষে আর দীক্ষার আবশ্যকতা নাই।" *

গোঁসাই দিবানিশি ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। রজনীবাবুর জীবনেও ইহারই পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসারণের সঙ্গে গোঁসাইর কোন কোন বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলেও তিনি নিজেকে ব্রাহ্মই বলিতেন; এবং ধর্ম্মবুদ্ধিতেই পুরোহিত নির্ব্বাচনে জাতির বিচার না করিয়া ব্রাহ্মপদ্ধতি মতে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে যদিও তাঁহার কোন সমাজের সঙ্গেই বিশেষ যোগ ছিল না, তবুও আজীবন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও ট্রাষ্টীপদে স্থির থাকিয়া ও প্রসঙ্গক্রমে সর্ব্বদা ব্রাহ্মসমাজের কথা উত্থাপন করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুগণ বাস করিতেছেন পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ করিয়া ইহাই বুঝিতে দিয়াছেন ব্রাহ্মসমাজকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন; এবং ঐ সমাজের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক যোগ চিরদিন অবিচ্ছিন্ন ছিল। গেণ্ডারিয়া থাকিতে ব্রজসুন্দরবাবুর বার্ষিক শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন;—"আমি সমাজের সঙ্গে বাহিরের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমি কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু যোগজীবনকে সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি উক্ত ব্রাহ্মঅনুষ্ঠানে যোগজীবনবাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ যোগ ছিল, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে লিখিত তাঁহার শেষ পত্রেও তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

তাঁহার পুত্র ও কন্যার বিবাহে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের বাবাজি

* ৺রজনীবাবুর সহধর্ম্মিণীর কথিত।

(রঘুবরদাস) নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার ঢাকার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। গৃহী এবং উদাসীনকে সমানভাবে গ্রহণ ও সমাদর করিয়া তিনি উদার সার্ব্বভৌমিক ভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। যোগধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া কঠোর সাধনা বলে সিদ্ধিলাভ করিয়া দেখাইয়াছেন ধর্ম্মলাভ কথার কথা নয়। আমরা শুনিয়াছি যোগসাধনা বলে তাঁহার আত্মদৃষ্টি লাভ হইয়াছিল। আত্ম-দর্শন সম্বন্ধে আশাবতীর উপাখ্যানে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন "প্রশ্ন ;—যোগীরা কি আত্মাকে দর্শন করেন? উত্তর ;—হাঁ যোগের এমন একটি অবস্থা আছে যে অবস্থায় আত্মাকে দর্শন করা যায়। প্রশ্ন ;—আত্মা নিরাকার, নিরাকারকে কিরূপে দর্শন করা যায়? উত্তর ;—জড়বস্তু দর্শনের জন্য শরীরের চক্ষু আছে, চেতন দর্শনের জন্য আত্মার চক্ষু আছে, যোগবলে সেই চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়।" "চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সংযুক্ত হইলে ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তি সেই চক্ষু কর্ণে প্রবেশ করে। তখন একস্থানে থাকিয়া সমস্ত জগতের সংবাদ জানা যায়।" "আমাদের পৃথিবী হইতে আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র সকল কত দূরে তথাপি জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ তাহাদের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন। কেবল মনুষ্যের জ্ঞানে যদি আকাশের নক্ষত্রদিগকে জানা সম্ভব হয় তবে মনুষ্যের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান সংযুক্ত হইলে কিছু জানা কি অসম্ভব হয়? কিন্তু তাঁহারা যে সকল বিষয়ে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না।" *

ঢাকায় অবস্থান কালে ১২৯৫ সনে একবার তিনি সপরিবারে ও সশিষ্যে কাকিনা (রংপুর) ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গিয়া বিশ দিন অবস্থান করেন; তাঁহার আগমনে তথায় প্রায় দুই সপ্তাহ কাল মহাসমারোহে উৎসব হয়; উপাসকগণের মধ্যে অত্যন্ত ধর্ম্মোৎসাহ

* আশাবতীর উপাখ্যান ও যোগসাধন।

জন্মে, অনেকে যোগসাধন গ্রহণ করেন। কাকিনার রাজাও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কাকিনার উৎসবান্তে তিনি শান্তিপুর হইয়া নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে বাঁশবেড়িয়া উৎসবে যান। তথায় খুব জমাট ভাবে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। কীর্ত্তনে তাঁহাতে নানা সাত্বিক ভাবের প্রকাশ দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিলেন "গোঁসাই মানুষ নহেন, দেবতা; ঈশ্বর কৃপায় আমাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার মধ্যে জীবন্ত ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে।"

একবার কোন্নগর গিয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিবাসে কয়েক দিন অবস্থান করেন। ৺শিবচন্দ্র দেবের সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে কতকগুলি বস্ত্র দান করেন, গোঁসাই উহা পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁহার অন্যান্য শিষ্যদিগকে বিলাইয়া দেন। তথায় কয়েক দিন প্রেমত্তভাবের কীর্ত্তনে এক স্বর্গীয় দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছিল। জগৎবাবুর নয়নদ্বয় অশ্রুজলে ভাসিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকগণ কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। এখানে অনেকে যোগসাধন গ্রহণ করেন, নগেন্দ্রবাবুর একটী ঝিরও দীক্ষা হয়। *

একবার মুরসিদাবাদের উৎসবে নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রবাবুকে বলিলেন;—"আপনি বেদীর কার্য্য করিবেন, কেননা আমি মধুর ভাবের সাধন করি, সে ভাব সাধারণে গ্রহণ করিতে পারে না। যদি অন্য ভাবে উপাসনা করি তাহা হইলে আমার ক্ষতি হয়। অতএব আপনিই উপাসনা করিবেন।" তারপর নগেন্দ্রবাবু উপাসনা করিলেন। *

আর একবার কোন্নগরের উৎসবে গিয়া নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে বাস করেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা এত উন্নত যে সেই অবস্থায় উপাসনা করিলে সাধারণে গ্রহণ করিতে পারিবে না বুঝিয়া গঙ্গার ঘাটে

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

গিয়া পৃথিবীর দুঃখতাপ অত্যাচারাদির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত নিম্নগামিনী হইলে উপাসনা করিলেন। *

একবার নলহাটি গিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয় সপরিবারে তথায় ছিলেন। গোঁসাই তাঁহার গৃহে কয়েক দিন বাস করেন। কুঞ্জবাবুর পত্নী স্বর্ণময়ীকে গোঁসাই মা বলিতেন। তাঁহার হাতের রান্না খাইয়া ভাবে বিভোর হইতেন। একদিন মাথার অসুখে অত্যন্ত কাতর হইয়া ছিলেন। স্বর্ণময়ীর সেবা যত্নে যন্ত্রনার লাঘব হইলে কৃতজ্ঞতাভরে মাতৃস্তোত্র পাঠ করেন। এই গৃহে নিত্য মিলিত উপাসনা হইত, গোঁসাই বসিতেন এবং ভাবে ও প্রেমে সকলকে বিগলিত করিতেন। কিন্তু তিনি নিজে তখন কথা বলিয়া উপাসনা করেন না বলিয়া উপাসনা করিতেন না। একদিন মধ্যাহ্নে সকলের সঙ্গে আহারে ভাবোচ্ছ্বাসে এমন বিভোর হইলেন যে যাঁহারা নিকটে বসিয়া ছিলেন তাঁহাদের পাত হইতে খাদ্য, মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন কাহারও নিষেধ শুনিলেন না। একদিন পথে যাইতে এক দেব মন্দিরের প্রাঙ্গনে গড়াগড়ি দিলেন ও পরে বলিলেন "হিন্দুর মন্দিরে, মুসলমানের মসজিদে, খৃষ্টানের গির্জ্জায়, সর্ব্বত্রই আমার এই ভাব। মনে হয় যুগ যুগান্তর ধরিয়া ধর্ম্মার্থী ব্যাকুলাত্মারা এই সকল স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। এখানকার মাটিতে তাঁহাদের পদধূলি আছে তাই গড়াগড়ি দেই।"

পুত্রের বিবাহের পর সশিষ্যে ও সপরিবারে বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় সহধর্ম্মিণী বিসূচিকা রোগে আক্রান্তা হন। এজন্য শিষ্য, আত্মীয়, বন্ধু এবং ব্রজবাসী বহুলোকের অত্যন্ত চিন্তা ও উৎকণ্ঠা। কিন্তু যাঁহার সঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ যোগ তাঁহার মধ্যে কোন উদ্বেগ অস্থিরতা দৃষ্ট

---

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

হইল না। অবশেষে সহধর্ম্মিণীর দেহত্যাগ হইল। গোস্বামী মহাশয় অবাতবিক্ষোভিত বারিধির ন্যায় স্থির গম্ভীর ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়মিত পাঠ ও অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্বানুরূপ চলিতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই। সমগ্র প্রাণমন ঢালিয়া যাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, বিবাহ অবধি যিনি সর্ব্বদা সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহার দৈহিক বিয়োগ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। বৃন্দাবন হইতে ঢাকাতে লিখিলেন ;—

"গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার চির-প্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসীলোকে ইহাকে মৃত্যু বলে, কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজি সখী বৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে সে যেন শোক না করে। ইহা শোকের ব্যাপার নহে, অতি আনন্দের কথা। বহু ভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামী ২১শে ফাল্গুন এখানে তাঁহার নামে উৎসব হইবে। তাহার পর ঢাকায় যাত্রা করিব। শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালী দিগকে খাওয়াইয়া দেয়। মা শান্তি শোক করিও না, আনন্দ কর। যত শীঘ্র পারি আমরা যাইতেছি।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।"

ঢাকার বন্ধুগণ তাঁহার কন্যার নিকট মাতৃবিয়োগ সংবাদ গোপন রাখিলেন। তৎপর তিনি ঢাকাতে আসিয়া কন্যাকে সংবাদ দিয়া বলিলেন "শান্তি, তোমার মা আসিলেন না।" শান্তি বলিলেন "কেন আসিলেন না।" গোঁসাই ;—"তিনি বৃন্দাবনেই রহিলেন।" শান্তি—"তিনি কি একা রহি-লেন ?" গোঁসাই—"একা কেন, যেমন চৈতন্যদেব প্রভৃতি সকলে দেহত্যাগ করিয়াও জীবিত আছেন, তোমার মাও সেইরূপ দেহত্যাগ করিয়াছেন।"

কন্যা মাতৃবিয়োগ সংবাদ পাইয়া শোকে অধীরা হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তিনি আশ্চর্য্যরূপে কন্যার শোক প্রশমিত করিলেন।

পত্নী বিয়োগের পর তিনি ঢাকাতে আসিয়া পত্নীর অস্থি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শুনিয়াছি সহধর্ম্মিণীর দেহত্যাগের পর বৃন্দাবনে এই আদেশ পাইয়াছিলেন যে, "গেণ্ডারিয়া গিয়া ইঁহার অস্থি সমাধিস্থ করিয়া নাম ব্রহ্মের মন্দির প্রতিষ্ঠা কর, এবং তদ্দ্বরা গৃহে গৃহে ব্রহ্মনাম প্রতিষ্ঠিত এবং দেব দেবীর পূজা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হউক।" ব্রহ্মনামের মহিমা প্রচার তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। যে নামের প্রভাবে তাঁহার ধর্ম্মস্রোত খুলিয়া গিয়াছিল সেই নাম লইয়া নরনারী নবজীবন লাভ করুক এজন্য তিনি সকল অনুষ্ঠানে নামব্রহ্মের যোগ করিয়া লইতেন।

যোগমায়া দেবীর সমাধি মন্দিরের নিয়মিত পূজার জন্য যোগজীবনবাবু শুদ্ধাচারী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শুনিয়া গোঁসাই বলিলেন "ওরূপ ভাব মনে আসিতে দিওনা। ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত যদি কেহ জল তুলসি দিয়া পূজা করে তাহাও শ্রেষ্ট। প্রণালীগত পূজাতে কৃপা লাভ করা দূরে থাকুক তাহাতে ইনি ফিরিয়াও চাহিবেন না। এ স্থানের পূজা ঐরূপ হইবেনা।" শ্রীযুক্ত তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ঐ মন্দিরে কি যোগজীবনের মাতা-ঠাকুরাণীর ভোগ, পূজা, আরতি হয়?" গোঁসাই উত্তর করেন "ঐ মন্দিরে নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারই ভোগ, পূজা, আরতি হয়।"

ঢাকার আশ্রমে কিছুদিন সাধনভজনে যাপন করিয়া তিনি সশিষ্যে কলিকাতা গমন করেন। এখানেও তাঁহার সাধনভজন ও দীক্ষাদান প্রবল উদ্যমে চলিয়াছিল। কলিকাতা অবস্থান কালে তাঁহার আশ্রমের

কার্য্য কি ভাবে নির্ব্বাহ হইত তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রাচীন বন্ধু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উক্তির মর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কলিকাতায় অবস্থানকালে নানা স্থানের বহু ধর্ম্মানুরাগী পুরুষ ও মহিলা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া একত্র হইয়াছিলেন। শিষ্যগণে তাঁহার গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় প্রতিদিন নিয়মিতরূপে নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন, আর উহা শ্রবণের জন্য দলে দলে লোক একত্র হইত। তাঁহার সরল ও প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মব্যাখ্যায় শ্রোতৃগণ এতদূর আকৃষ্ট হইত যে উহা পরিত্যাগ করিয়া কাহারও উঠিতে ইচ্ছা হইত না। ঐ সময় যদিও তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট আয় ছিল না, তবুও অনায়াসে আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার আশ্রমের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। কোথা হইতে কিরূপে অর্থ ও দ্রব্যাদি আসিত এবং ব্যয় হইয়া যাইত তাহার হিসাব ছিল না। কলিকাতার মত স্থানেও গোস্বামী মহাশয়ের নাম এত বিখ্যাত হইয়াছিল যে তাঁহার নাম সকলেই জানিত। তিনি অদ্বৈত বংশের গোস্বামী, তদুপরি জটাজুট শোভিত সন্ন্যাসী, ধার্ম্মিক, সাধু ; সুতরাং তাঁহার আকর্ষণে চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্বদা দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার আশ্রমটীকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছিল।"

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বাহ্যসম্পর্ক রহিত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার উচ্চভাবের ব্যত্যয় কখনও হয় নাই। নিম্নলিখিত ঘটনাটীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ;—

এলাহাবাদ হইতে একজন মুসলমান ফকির কলিকাতা আসিয়াছেন। কলিকাতার লোক তাঁহার নানাপ্রকার অলৌকিক ক্রিয়া দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের একজন পৌত্র তাঁহার শিষ্য হওয়াতে তাঁহার প্রতি

অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাধু, গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিলে গোস্বামী মহাশয় লোক পাঠাইয়া নগেন্দ্রবাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঐ সাধু প্রায়ই গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিতেন। কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ বুঝিতে পারিলেন, সাধুর সত্য মিথ্যার বিচার নাই। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়কে এ কথা জানাইলে তিনি বলিলেন;—"সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন।" যোগজীবনবাবু বলিলেন;—"কই তুমিও ত সন্ন্যাসী, তুমি ত কখনও মিথ্যা কথা বল না।" তিনি বলিলেন;—"আমি যে ব্রাহ্মসমাজের লোক, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা পাইয়াছি।" *

শেষ জীবনে তিনি যখন যেখানে থাকিতেন ধর্ম্মপিপাসু লোকেরা আসিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষার্থী হইতেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাব বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল; এজন্য বহু দূর হইতেও সাধনার্থীগণকে আসিতে দেখা যাইত। কেহ সাধনপ্রার্থী হইলে অথবা পত্রদ্বারা সাধন গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলে গুরুর অনুমতি লইয়া গোপনে শক্তিসঞ্চার করিয়া দীক্ষা দিতেন। বলিতেন, "যেমন বীজ ভূমিতে প্রোথিত না থাকিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি মন্ত্র গুপ্ত না থাকিলে সিদ্ধিলাভ হয় না।" সাধনার্থীগণের সকলেই যে সাধন পাইতেন এমত নহে; অনেককে ফিরাইয়াও দিতেন। কেহ কেহ দুই তিন বৎসর ঘুরিয়া পরে সাধন পাইতেন। শিষ্য গ্রহণে জাতি ও সম্প্রদায়ের বিচার ছিলনা। বলিতেন;—"আমার গুরুদেব কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে এই সাধন দিবেন তাঁহারা সকলে লিষ্টভুক্ত হইয়া আছেন। যাঁহাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা হইবে তাঁহারা এ দেশের হউন, কি সে দেশের হউন, নিষ্ঠাবান হউন

---

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

কি বিরোধী হউন, এমন কি মহাপাতকী হইলেও সময়ে সাধন পাইবেন।" * তবে ভগবৎকৃপা ও সাধনার্থীর সুকৃতি সাপেক্ষ মনে করিতেন। বলিতেন;—"ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।" শিষ্যগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। যিনি যে সমাজের তিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া সেই সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির ও শাস্ত্রের অনুগত হইয়া চলিতে পারিতেন। বলিতেন; "যিনি যাহা সরলভাবে বিশ্বাস করেন অনুষ্ঠান করুন, আর শ্বাস প্রশ্বাসে ভক্তির সহিত অবিশ্রান্ত নাম করুন, তাহা হইলে ক্রমে সত্য প্রকাশিত হইবে।" তিনি ভক্তি পথের পথিক ছিলেন, কাহারও সরল বিশ্বাসে ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সকলকে বিবেকের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন। বিবেক বিরুদ্ধ পথে চলিতে কখনও কাহাকেও আদেশ করিতেন না। না বুঝিয়া কোন ভাব গ্রহণ করা, না বুঝিয়া পরের মতের অনুসরণ করা যেমন তাঁহার নিজের পক্ষে অসম্ভব ছিল তেমনি অপর কাহাকেও সেরূপ উপদেশ দিতেন না।

নারীগণও তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু পুরুষ ও নারীদের আলাপাদি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে উপদেশ দিতেন। অনেক সময় নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলিতেন;—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনে বশেৎ
বলবান ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।"

মাতা, ভগিনী, দুহিতার সঙ্গেও নির্জ্জনে বাস করিবে না, যেহেতু বলবান ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানীগণেরও মতিবিভ্রম ঘটায়।

তিনি বলিতেন;—"মহাভারতে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি জ্ঞানী বীরগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিতেছি না বলিয়া যে নারীর অপমান সহ্য করিয়াছিলেন,

* সঞ্জীবনী ১৩০৬ সন, আষাঢ়।

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল, নারীজাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার ফল অদ্যাপি ভারতবর্ষ ভোগ করিতেছে।"

স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সাধনের অবস্থায় তিনি নিজে বহুদিন স্ত্রীলোকের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। একবার বৃন্দাবনের পথে তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতৃবধূকে চিনিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কখনও আপনার মুখের দিকে তাকাই নাই চরণ দর্শন করিয়াছি, এজন্য চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" অথচ তিনি এক সময় ঐ নারীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। নারীজাতির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল, বলিতেন, "স্ত্রীলোক ঘৃণার পাত্র নহেন। স্ত্রীলোক আমার গর্ভধারিণীর বংশ, স্ত্রীলোক আমার ভক্তির পাত্র। একটী স্ত্রীলোক দেখিলে আমার জননীকে মনে হয়।" *

শেষ জীবনে যে গৃহে তাঁহার আসন থাকিত সে. গৃহে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দৈবাৎ কেহ প্রবেশ করিলে তিনি অগ্রে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে অন্য ঘরে মেয়েদের নিকট গিয়া বসিতে বলিতেন। লোক-শিক্ষার জন্য স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল। তিনি স্বয়ং স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাব পোষণ করিতেন। নারীর মুখমণ্ডলে জগজ্জননীর দর্শন লাভে তাঁহার মাতৃভাব উথলিয়া উঠিত। এ সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বের একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি;—

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক অবস্থায় "একদিন গোস্বামী মহাশয় নির্জ্জনে পত্নীসহ যখন বাস করিতেছেন এমন সময় পত্নীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মুখে জগজ্জননীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া তিনি তাঁহাকে

* আশাবতীর উপাখ্যান।

পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। পত্নী একেবারে অবাক এবং কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইয়া গেলেন। যে স্বামী আপনার পত্নীর মুখে জগন্মাতার আবির্ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার বিশুদ্ধভাব হইবে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যে পত্নী তাঁহার সঙ্গে বহুবর্ষ যাবৎ বহুক্লেশ বহন করিয়া পরিশেষে শিষ্যমণ্ডলীতে আদৃত হইয়া সুখী হইলেন, তিনি স্বর্গস্থা হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী তৎপ্রতি হৃদয়ের বিশুদ্ধভাব রক্ষা করিলেন।" *

গোস্বামী মহাশয় ১২৯৭ সনে (১৮১২ শক) ফাল্গুন মাসে কলিকাতা হইতে সশিষ্য হরিদ্বার কুম্ভমেলায় গমন করেন। শুনিয়াছি হরিদ্বারের কুম্ভমেলা সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন;—"হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় প্রায় লক্ষ সাধুর সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে তিনজনকে যথার্থ তত্ত্বদর্শী দেখিয়াছি। আর অধিকাংশ বেশভূষা, সম্প্রদায়, ও মতামত লইয়া ব্যস্ত। ঐ তিন জনের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, সাধুরা এত কঠোর সাধনা করিয়াও তত্ত্বলাভ করেন না কেন? তিনি হিন্দিতে বলিলেন;—"বাবা আমি ক্ষুদ্রকীট কি বলিব?" অনেক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে বলিলেন;—"এখন কেহ ভগবানকে চায়না, মানমর্য্যাদা, মহান্তগিরি গুরুগিরি চায়, তাহা পায়। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং ইত্যাদি।" যে কুম্ভমেলায় লক্ষ সাধুর মধ্যে তাঁহার আদর্শানুরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল সেই স্থানে উপস্থিত হইতেও তাঁহার এত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহার প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা। এই ধর্ম্মতৃষ্ণা তাঁহাকে কোথাও সুস্থির থাকিতে দেয় নাই। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহান ঈশ্বরের ভাব দেশে দেশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রতি মানবের মুখমণ্ডলে তাঁহার দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠি-

* ধর্ম্মতত্ত্ব ১৩০৬ সন, ১ লা আষাঢ়।

তেছে, কোথায় তাঁহার প্রকাশ প্রাণে উজ্জ্বলরূপে অনুভূত হইবে কে জানে? এজন্য যথায় ধর্ম্মার্থী সাধুর সম্মিলন হইত, ব্যাকুলাত্মারা একত্র হইতেন, তথায় ছুটিয়া যাইতেন।

হরিদ্বার হইতে কলিকাতা আসিয়া কিছুদিন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন;—"আমার সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল। আমাকে কোন বিষয় গোপন করিতেন না। ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিয়া বহুবার আমার গৃহে বাস করিয়াছেন। আমার সহধর্ম্মিণীকে তিনি আনন্দময়ী মা বলিতেন, আর তাঁহার সেবা, যত্ন ও শ্রদ্ধায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছেন, পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ করিতেন। শিষ্য সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে শেষে আমার গৃহে না উঠিয়া স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করিতেন। কারণ তখন সর্ব্বদাই যোগধর্ম্মার্থী বহুলোক তাঁহার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন। একদিন মন্ত্রদানকালে আমি একজন অপরিচিত সাধুকে উপস্থিত দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমার মুখে তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন;—"ইনি ত আমার গুরু, আশ্চর্য্য যে ইনি দয়া করিয়া আপনাকে দর্শন দিয়াছেন; কিন্তু অন্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।"

নগেন্দ্রবাবুর গৃহে একদিন আহারের সময় গোঁসাই ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছিলেন "দেখ দেবগণ আমার সঙ্গে আহার করিতেছেন। এই মহাপ্রসাদ তোমরা সকলে খাও।" এই বলিয়া সকলকে সঙ্গে খাইতে বলিলেন। তখন সকলের একত্র ভোজন হইতে লাগিল। নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী এই মধুর দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া একথালা ভাত ও একবাটী ডাল আনিয়া দিলেন। সকল উপকরণ মিশ্রিত করিয়া আহার চলিতে লাগিল। গোঁসাই স্বহস্তে নিজের এবং অপরের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ভাবে এমন বিভের হইলেন যে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

১২৯৮ সনের অধিকাংশ সময় তিনি কলিকাতা বাস করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে একবার সশিষ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। গোঁসাই মহর্ষি সমীপে উপনীত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং ভাবে একান্ত বিহ্বল হইয়া বলিলেন "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, আপনাকে দেখিলে আমার ব্রহ্মদর্শনের ফল হয়।" মহর্ষির মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, ও মস্তক ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি "নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ, জগদ্ধিতায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ।" শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গোঁসাইকে প্রতি নমস্কার করিলেন ও অত্যন্ত আদর জানাইলেন। ভাবের স্রোত বিদ্যুৎবেগে উভয়ের মধ্যে খেলিতে লাগিল। নীরবে কিছুক্ষণ উভয়ের ভাব বিনিময় হইল। পরে শিষ্যগণের পরিচয় পাইয়া মহর্ষি বলিলেন "মানুষ যখন কোন উৎকৃষ্ট খাদ্য বস্তু পায় তখন কেবল নিজে খায় না। অন্যকেও দিয়া খাইতে ইচ্ছা হয়। তুমি সেইরূপ যাহা নিজে ভোগ করিতেছ তাহা তোমার শিষ্যদিগকে দিতেছ। ইহাতে তোমার এক বিন্দুও স্বার্থ নাই। তুমি সত্যই শিষ্যদের সন্তাপহারক। তোমাকে দেখিলে প্রাচীন কালের ঋষিদের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে।" তৎপর মহর্ষি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতনের উৎসবে গমন করিবার জন্য সশিষ্য গোস্বামী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিলেন। * গোঁসাই বলিলেন ;—"শান্তিনিকেতনের নিয়মাদি যাহাতে অসাম্প্রদায়িক ভাবে হয়, সকলেই যাইতে পারেন এরূপভাবে করিবেন।" ইহার পর মহর্ষিসঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাকথা হইল। মহর্ষি বলিলেন ;—

* এই বৎসর ৭ই পৌষ বোলপুরের মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার উৎসব হয়। অসুস্থতা জন্য গোঁসাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

"যাহাদের হৃদয়ে প্রেম তাহাদের কথায় অন্তরকে স্পর্শ করে। নতুবা কথা উপরে উপরে ভাসিয়া যায়। তুমি যাহা বলিলে তাহাই ঠিক, তাহাই সত্য। সাধুর কথা এইরূপ হয়। আমার অন্তরের কথা কাহাকেও বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝ তাই তোমাকে বলি। ঈশ্বরকে যেমন ভাবে চাই তেমন ভাবে এখনও পাই নাই। সময় সময় তিনি দয়া করিয়া দর্শন দিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হন। যতক্ষণ আবার সেই প্রেম-ময়ের উজ্জ্বল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মত থাকি। প্রাণ আমার ধরফর করে, সময় যে কি ভাবে যায় তিনিই জানেন। তিনি দয়া করিয়া দর্শন না দিলে কি আর করিব। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞান কেবল কথার কথা। যথার্থ প্রেম ভক্তিই তাঁহাকে পাবার একমাত্র উপায়। তাহা চেষ্টা সাধ্য নয়। তাহা তাঁরই দয়ায় হয়। পুরুষকার অর্থশূন্য কথা, তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া করিয়া তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা করিয়া তাঁর দয়ার দিকে চাহিয়া পড়িয়া আছি।" এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। গোঁসাই জয় গুরু, জয় গুরু বলিতে লাগিলেন।

মহর্ষি পরে বলিলেন—"জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন এই চারিটি একসঙ্গে না থাকিলে প্রকৃত সত্যবস্তু, ষোলআনা ধর্ম্ম, লাভ হয় না। তোমাতে এই চারিটি উপযুক্ত রূপে আছে। তারপর মানুষের চেষ্টায়, সাধনভজনে যতটা সম্ভব তাহাও তুমি পূর্ণ মাত্রায় করিয়াছ। সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রহিয়াছে। এখন তুমি যাহাই কর, ভগবান তাহাই সুন্দর দেখিতেছেন।" গোঁসাই বলিলেন "আপনিইত আমাকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়াছেন। আমার সবইতো আপনা হইতে। আপনিইতো আমার গুরু।" মহর্ষি একটু হাসিয়া বলিলেন "হাঁ তা ঠিকই

বলিয়াছ। গুরু ত বটেই ; তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরু মহাশয়ের মত। ক খ শিখিতে হইলে ছেলেদের গুরু মহাশয়ের নিকট শিখিতে হয়। পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পাইয়া ঐ গুরু মহাশয়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়। পাঠশালার গুরু মহাশয়কে গুরু বলিলে যেমন হয় তোমার বলাও ঠিক সেইরূপ হইতেছে।"

পরে গোঁসাই উঠিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "আমি আপনার বালক আমাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।" মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি না আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক।"

পরে শিষ্যগণও মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তোমাদের মঙ্গল হইবে তোমরা কখনও গোঁসাইকে ছাড়িও না। ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন।"

গোস্বামী মহাশয়কে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্য সময়ে মহর্ষির অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ;—"ইনি একেবারে ছাতা ফেলিয়া চলিয়াছেন" অর্থাৎ সংসারে আর কোন আশ্রয় নাই, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও অত্যন্ত উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সময় এক ব্যক্তি বেলুন হইতে ছাতা ধরিয়া নামিয়াছিল, এই জন্য তিনি মহর্ষির সম্বন্ধে ছাতার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিলেন। নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন ; "মহর্ষির প্রতি তাঁহার কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা ইহাদ্বারাই বোধ হইবে যে যখন তিনি মহর্ষির কথা শুনিতেছিলেন তখন একেবারে অনুগত শিষ্যের ন্যায় ছিলেন।"

কলিকাতায় কতক দিন শ্যামবাজারের একটী বাসায় ছিলেন। এই সময় একদিন শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন ;—"আপনার প্রতি

সঙ্কোচ ভাব ত যায় না।" উত্তর করিলেন ;—"নিজেকে যেমন পাপী ভাবেন আমাকেও তেমনি মনে করিবেন। নন্দ, যশোদা, গোপালকে যেরূপভাবে দেখিতেন আমাকে সেইভাবে দেখিবেন।" এই কথা বলিয়াই বলিলেন ;—"শ্রীমতীর প্রতি কৃষ্ণ বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইলে তিনি গর্ব্বিতা হয়েন। ঐ সময়ই কৃষ্ণ পলায়ন করেন। তৎপরই সখীগণ ও শ্রীমতী একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকেন। তখনই শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হইয়া রাসলীলা করেন। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল ; শ্রীমতী সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণের বামে দর্শন করিয়া আনন্দিত। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধও সেইরূপ। গুরু শিষ্যকে তুচ্ছ করিলে ভগবান গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু শিষ্য একত্র হইয়া ক্রন্দন করিলেই ভগবান প্রকাশিত হইয়া রাস করিয়া থাকেন। তখন শিষ্য গুরুকে কৃষ্ণের বামে দর্শন করিয়া সুখী, গুরু শিষ্যকে ভগবানের বামে দর্শন করিয়া সুখী হইয়া থাকেন।"

একবার থৈপাড়া (কলিকাতার নিকটস্থ) গিয়াছিলেন। কি দেখিয়া যেন ভাব-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, অশ্রুতে তাঁহার গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আকাশের দিকে মুখ করিয়া মুদিতনেত্রে বসিয়া রহিলেন। ভাবের আবেশ দূর হইলে বলিলেন ;—"আজ দেখিলাম, মহাপুরুষগণ দেশের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া দেশের কল্যাণ জন্য ভগবানের নিকট বিশেষ প্রার্থনা করিতেছেন। এই দলে মহাপ্রভুই অগ্রগণ্য। আজ ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে, এরূপ প্রকাশ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ভগবানের প্রকাশে নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল, পর্ব্বত সকল কম্পিত ও সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়াছে। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ নৃত্য করিলেন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের স্তব করিলেন, বাণী হইল শাঘ্র দেশের দুর্গতি দূর হইবে।"

তিনি দেশের জন্য কত ভাবিতেন ইহাদ্বারা তাহারই আভাস পাওয়া যায়। অপর একদিন বলিলেন ;—"হিমালয়ে এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হইলে প্রশ্ন করিয়াছিলাম ;—"এ দেশ দিন দিন সকল বিষয়ে হীন হইয়া যাইতেছে, কি উপায়ে ইহার কল্যাণ হইতে পারে?" সাধু উত্তর করিলেন ;—"কেবল বীর্য্য রক্ষা করিলে ও সত্য বাক্য বলিলেই এ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইতে পারে।"

অপর একদিন দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে বলিয়াছিলেন ;—"আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহারা যদি ছেলেদের সহিত বিশেষ ভাবে মিশিয়া তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া নিজ জীবনের সমস্ত বিষয় বলিবার সুবিধা দিয়া তাহাদিগকে বীর্য্য রক্ষা করিতে ও সত্যকথা বলিতে অভ্যাস করাইতে পারেন তাহাহইলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়।" এই বলিয়া ছাত্রগণ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তাঁহার নিকট জীবনের গুহ্য কথা বলিয়া কিরূপে উপদেশ লইত তাহার বিষয় উল্লেখ করিলেন।

দেশের দুর্গতি দেখিয়া তিনি তাঁহার সাধনের ধন নরনারীর জন্য বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ;—"নিজের প্রিয়তমা সুন্দরী স্ত্রীকে দান করিতে লোকের হৃদয় ছিন্ন হয়। উহা আদরে ও গোপনে রক্ষণীয়া। সেইরূপ বহু সাধনের ধন এই জিনিষ সাধুরা কাহাকেও দান করেন না, অত্যন্ত গোপনে রক্ষা করেন।" এই কথা শুনিয়া একজন প্রশ্ন করিলেন ;—"তবে এই মুক্তা জঙ্গলে ছড়াইলেন কেন?" উত্তর "ইহসংসারে তাপের যন্ত্রণা আমি নিজে ভোগ করিয়াছি। ইহা হইতে জগৎ রক্ষা পাইবে আশায় তাপিত ব্যক্তিদিগকে ইহা দান করিয়াছি।"

১২৯৯ সনে তিনি পুনরায় সশিষ্যে ঢাকায় গমন করেন। এই সময়

তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মৃতশব তাঁহার বিভিন্ন শ্রেণীর শিষ্যগণ বহন করিয়া লইয়া গিয়া দাহ করেন। তিনি সন্ন্যাসী; এজন্য সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়মে দানাদি সহকারে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন। মাতার প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল; মাতার কথা বলিতে বলিতে কত সময় তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া যাইত, তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন।

এইবৎসর তিনি মৌনব্রত লইলেন। যে প্রিয়তম দেবতার স্মরণ মননে জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মৌনব্রত গ্রহণ করিলে তাঁহার স্মরণ মননে আরও অধিক সময় ব্যয় করিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্যেই মৌনব্রত লইলেন। কিন্তু মৌনাবস্থায় একদিন কাহারও প্রশ্নে হঠাৎ কথা বলিয়াছিলেন; ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া নিজের হাতে নিজের পায়ের কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) দ্বারা সজোরে নিজের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে সম্মুখস্থ শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন; "তোমরা আমার বন্ধুর কার্য্য করিলে কই?" তাঁহার আত্ম-দৃষ্টি সর্ব্বদা অত্যন্ত জাগ্রত ছিল, নিজেকে কখনও ক্ষমা করিতেন না। যে নিয়ম গ্রহণ করিতেন ভ্রমবশতঃ তাহার একচুল এদিক ওদিক হইলে কঠোর দণ্ড ভোগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। প্রায় দুইবৎসর কাল তিনি মৌনী ছিলেন। এই সময় কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে লিখিয়া উত্তর দিতেন।

১৩০০ সনে বৈশাখ মাসে তিনি পুনরায় কলিকাতা গমন করেন। কলিকাতার সুকিয়াষ্ট্রীটের বাড়ীতে এক দিন মনোহর দাস নামক একজন বৈষ্ণব রাস্তায় দাঁড়াইয়া মধুর কণ্ঠে গান করিতেছিলেন। গোঁসাই দোতালার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া গান শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইলেন; এবং গায়ের ফ্লানেলের চাদর আলখেল্লা গায়ককে দান করিলেন। একটী সাধারণ চাদরগায়ে তাঁহার দুই দিন কাটিয়া গেল। পরে একজন অনুরাগী শিষ্য একখানা ফ্লানেলের চাদর কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। তিনি

চাদর গায় দিয়াছেন ইতিমধ্যে অপর দুইজন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন ;—"আপনি আর কতদিন এই চাদর রাখিবেন, কাহাকেও দিয়া ফেলিবেন" শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় চাদর ছুড়িয়া দিলেন এবং লিখিলেন ;—স্বত্বত্যাগই সম্পূর্ণ দান। যাহাকে দিবে সে অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও দাতা কিছু বলিতে পারেন না। কারণ তখন সে বস্তু তাহার নহে। দাতা যদি কিছুমাত্র মনে করেন যে আমার অভিপ্রায় মতে আমার দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, তবে তাহাকে দান বলে না, গচ্ছিত রাখা বলে। শাস্ত্রে ইহাকে ন্যস্ত বস্তু বলিয়াছেন। ন্যস্ত বস্তু অর্থাৎ এরূপ দান করা ও গ্রহণ করা উভয়ই পাপ। তোমাদের মনে এভাব আছে। আমি যাচ্ঞা করি না। যদি আমার কোন ব্যবহারে যাচ্ঞা করা প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা আমার অপরাধ সন্দেহ নাই। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং আমার ক্রটী থাকা অসম্ভব নহে। যখনই ক্রটী দেখিবে তখনই বন্ধুভাবে বলিবে। মনে মনে রাখিও না। যিনি আমার দোষ দেখাইয়া দেন তিনি আমার পরম বন্ধু। আমি তাঁহাকে ভালবাসি। হাজার রসগোল্লা দাও, কাপড় দাও, তাহাতে ভবী ভুলে না। কেবল দোষ দেখাইলে ভুলে। ভগবৎ কৃপায় তোমাদের মঙ্গল হউক।"

কলিকাতায় ১৩০০ সনের ১৭ই শ্রাবণ এক ব্যক্তি তাঁহার ফটো তুলিতে গিয়াছিল ; তিনি বলিলেন ; —"অত্যন্ত লজ্জার কথা ! ধূলি কীট অপেক্ষাও হীন হইয়া এই নশ্বর দেহের এত গুমর কেন ? পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া পাঁচজনার পরামর্শে যে ফটো উঠান হইয়াছে তাহাই এক্ষণে অপরাধ বলিয়া বোধ হইতেছে। মুখে বিনয় করিয়া ফটোতোলা ঘোর কপটতা। বিশেষতঃ গত সপ্তাহ হইতে এই ব্রত লইয়াছি যাহা মুখে বলিব, মনে বুঝিব, সেইরূপ আচরণ করিব। অনেক সূক্ষ্মপাপ অন্বেষণ

করি, কিন্তু মোটা পাপ চক্ষের উপর আসে, অভ্যাস ও সঙ্গদোষে দেখি না।" *

তাঁহার জীবনের শেষ ভাগের সমস্ত ঘটনা অবগত হওয়ার কোনও উপায় ছিল না; যদি তিনি বলিতেন তবেই জানা যাইত। এজন্য একদিন কয়েকজন অনুগত শিষ্য একত্র হইয়া সশঙ্ক চিত্তে তাঁহাকে বলিলেন;—"আপনার জীবনের অনেক ঘটনাই অজ্ঞেয় রহিল, যদি আমরা জানিতে পারিতাম তবে আমাদের এবং এদেশের অনেক লোকের উপকার হইত।" তিনি বলিলেন;—"রাম রাম! জগতে কত কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত রহিয়াছে; কত কত সংগ্রহ রহিয়াছে তাহা পড়িয়া যদি লোকের উপকার না হয়, আমি কোন ছার যে আমার জীবনচরিতে লোকের উপকার হইবে।" এই বলিয়া তিনি অন্য কথা পাড়িলেন; প্রস্তাব এখানেই চাপা পড়িল। *

১৩০০ সনের অগ্রহায়ণ মাসের ২ রা তারিখ তিনি সশিষ্য একখানা তৃতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ গাড়ীতে এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় যাত্রা করেন। শোণপুরের হরিহরছত্রের মেলা দর্শনের জন্য তাঁহারা পথে বাঁকীপুরে নামিয়া কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। পৌষমাসে এলাহাবাদ উপস্থিত হইয়া কিছু দিন সহরে বাস করেন এবং পরে চড়াতে মেলাস্থলে উপনীত হন। শিষ্যগণ সহ নামের মাহাত্ম্য গান করিতে করিতে যখন চড়াতে গিয়াছিলেন এবং ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া গভীরনাদে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি ও নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। তাঁহার বদন অশ্রুসিক্ত এবং শরীরের রোমকূপগুলি শিমুলের কাটার ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়াছিল; দেখিয়া সকলেরই প্রাণ বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

* নব্যভারত, ১৩০৬ সন।

কুম্ভমেলা সাধুদিগের একটী কংগ্রেস। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ প্রত্যেক তৃতীয় বৎসর হরিদ্বার, প্রয়াগ, পঞ্চবটী, উজ্জয়িনী ইহার এক একটী স্থানে একত্র হইয়া পরস্পরের সহায়তার জন্য একমাসকাল সদালাপে যাপন করেন। উক্ত স্থান কয়েকটীর প্রত্যেক স্থানে দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। কুম্ভরাশিতে হয় এজন্য কুম্ভমেলা নাম হইয়াছে। এই মেলার কেহ উদ্যোগকর্ত্তা কিম্বা নিমন্ত্রণকর্ত্তা না থাকিলেও বহুকাল হইতে ইহা এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

সে বৎসর প্রয়াগের কুম্ভমেলায় অসংখ্য লোকসমাগম হইয়াছিল; যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই জনপ্রবাহ নয়নগোচর হইয়াছিল। ক্রয়, বিক্রয়, আমোদ, প্রমোদ, অথবা পার্থিব কোনরূপ লাভের উদ্দেশ্য নয়, সাধু-দর্শনজনিত পুণ্যফল সঞ্চয়ই উদ্দেশ্য। উৎসাহ, উদ্যম, অনুরাগ, নিষ্ঠা, দান, সদাব্রত, বৈরাগ্য মেলার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। অযুত অযুত সাধু সন্ন্যাসী কেহ কুটীরে, কেহ বস্ত্রাবাসে, কেহ ছত্রাবাসে, কেহ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত স্থানে বসিয়া আছেন। কেহ গৈরিকধারী, কেহ কৌপিনবহির্ব্বাস-ধারী, কেহ বা শুদ্ধ কৌপিনধারী; কাহারও গাত্রে কিঞ্চিৎ আচ্ছাদন আছে, কেহ বা শুদ্ধ বিভূতিভূষিত দীর্ঘজটাধারী। এই সাধুদলে মহাপণ্ডিত আছেন; মহাধ্যানী, মহাকর্ম্মী, মহাপ্রেমিক, মহাদাতা সকল প্রকার লোক আছেন। অসংখ্য গৃহস্থ নরনারী সাধুদর্শন আশায় মেলায় আসিতেছেন, সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। *

গোস্বামী মহাশয় প্রয়াগের কুম্ভমেলায় বৈষ্ণব সাধুমণ্ডলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাবধি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ। যে অদ্বৈতবংশে তাঁহার জন্ম, সেই বংশের প্রভাব তাঁহাতে সর্ব্বদা বিদ্যমান

* "কুম্ভমেলা" হইতে সংগ্রহ।

ছিল। ভক্তি সেই বংশের প্রধান ভাব। ভক্তির প্রভাবই তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের কারণ। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট ভক্তি-সাধন গ্রহণ ও অবশেষে যোগমার্গাবলম্বন এ সমস্তও ভক্তিমত্তারই পরিচয়। প্রয়াগে কুম্ভমেলায় বৈষ্ণবমণ্ডলীতে স্থানগ্রহণ পূর্ব্বভাবেরই পরিণতি। কিন্তু এইরূপ বৈষ্ণবভাব প্রধান হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। কুম্ভমেলাতে এই অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষিত হওয়াতে তাঁহার প্রতি সকল শ্রেণীর সাধুর গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

তাঁহার মেলাস্থ আশ্রমের ব্যবহারের জন্য এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র একটী সুবৃহৎ বস্ত্রাবাস (তাঁবু) দিয়াছিলেন। উহা সর্ব্বদা লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। আশ্রমদ্বারে "হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই শ্লোক লিখিত হইয়াছিল। নামমাহাত্ম্য প্রচার এই আশ্রমবাসী সাধুর মূলমন্ত্র ইহাদ্বারা তাহা প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার আশ্রমে প্রতিদিন কীর্ত্তন হইত। আহার সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম ছিল যে আহারের সময় যাহারা আসিয়া বসিবে তাহারাই অন্ন পাইবে। আশ্রমের জন্য দৈনিক যাহা আসিত এইরূপে সমস্ত ব্যয় হইয়া যাইত; পরের দিন জুটিলে আবার আয়োজন হইত। তাঁহার সঙ্গেও প্রায় শতাধিক শিষ্য অবস্থান করিতেছিলেন। অথচ আশ্চর্য্যরূপে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতেন, আর বলিতেন;—"মানুষের মুখের দিকে কখনও চাহিবে না, ভগবানের দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকিবে, তিনি যদি খাইতে না দিয়া মারিয়া ফেলেন তথাপি অপর কাহারও দিকে চাহিবে না।" এইরূপে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া অযাচিত দানে আশ্রমের এবং দৈনিক দানের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

আর যখন কেহ আসিয়া অভাব জানাইত প্রায় তখনই তাহা পূর্ণ হইত। কেহ আসিয়া বলিল আমার কম্বল নাই, দাও উহাকে দুই টাকা, কেহ বলিল আমার ঘটি নাই, দাও উহাকে এক টাকা, কেহ বলিল রেলভাড়া নাই, দাও যাহা প্রয়োজন। এইরূপে যতক্ষণ টাকা নিঃশেষিত না হইত অনবরত দান করিতেন। টাকা ফুরাইয়া গেলে নিজের গাত্রবস্ত্র, আসনের কম্বল, পায়খানার ঘটী ইত্যাদি নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্য পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিতেন। অর্থের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। বলিতেন ;—"এখানকার সকল পদার্থে সমস্ত নরনারীর অধিকার। ভগবানই সমস্ত দিতেছেন, আবার তিনিই অভাবগ্রস্ত নরনারীকে এখানে পাঠাইতেছেন। আমি তাঁহারই মুটে মাত্র। এ তাঁহারই ভাণ্ডার, তিনিই আঁনিতেছেন, আবার তিনিই লইয়া যাইতেছেন, আমি ভাণ্ডারী মাত্র।"

একদিন এলাহাবাদ সহরের একজন ধনী তাঁহার নিকট আসিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইলেন ; এবং কয়েকজন লোক প্রকাণ্ড একটী গাঁটুরী সঙ্গে করিয়া তাঁবুর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ ধনী ব্যক্তি উক্ত গাঁটুরীতে এক হাজার জামা লইয়া আসিয়াছিলেন, অভিপ্রায় গোস্বামী মহাশয় তাহা গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত বিতরণ করেন। তাঁহার দান গৃহীত এবং এক ঘণ্টার মধ্যে বিঁরিত হইল।

কুম্ভমেলায় সমাগত সাধুমণ্ডলীর অনেকে তাঁহার ভক্তি ও প্রেমে যারপরনাই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে অনেক সন্ন্যাসীও তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাসীদিগকে রজনীতে গোপনে দীক্ষা দিতেন। মহাত্মা বড়কাটিয়া বাবা (ইনি একজন বিখ্যাত সাধু) তাঁহার নাম করিয়া বলিতেন,—"বাবা প্রেমী হ্যায় ; উস্‌কা বহুত্ প্রেম হ্যায়।" মেলার প্রধান প্রধান মহাত্মাগণ—যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার একবার দেখা হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেন।

এক দিন দেখা না হওয়াতে বড়কাটিয়া বাবা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন ;—"হাম্ উন্‌কা দরশনকা ভুঁখা হ্যায়।" আমি উঁহার দর্শনের জন্য ক্ষুধিত। মহাত্মা দয়ালদাস পুনঃ পুনঃ বলিতেন ;—"বাঙ্গালী বাবাকে আমি আবার কিরূপে দেখিতে পাইব।" মহাত্মা ছোটকাটিয়া বাবা দিনের মধ্যে কত বারই তাঁহার কাছে আসিতেন যেন তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহাত্মা অর্জ্জুন দাস (ক্ষেপাচাঁদ) বলিতেন ;—"সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হ্যায়।" ইনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং কখন কখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেন, গান করিতেন ও চরণতলে পতিত হইয়া পদধূলি মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন; কখনও বা দৌড়াইয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেন। আবার কখনও বা আরতি করিতে করিতে নানা প্রকারে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কখনও বা তাঁহার ভুক্তাবশেষ হস্তে লইয়া আহার করিতেন; আর বলিতেন ;—"এসা সিদ্ধ মহাত্মা হাম্ কভি নেহি দেখা, হাম্ উন্‌কা নফরকা নফর। দিনরাত্ ধ্যান্‌সে বঠ্ যাতা, পলক্ নেহি পড়তা।" কেহ কেহ বলিতেন ;—"এ বাবা সাচ্চা সাধু হ্যায়।" তিনি যখন সাধু দর্শনে বাহির হইতেন তখন রাস্তার চারিদিকে সকলেই তাঁহার দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিতেন; এবং 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি উঠিত। সন্ন্যাসীরা পর্য্যন্ত তাঁহকে দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেন।

"কুম্ভমেলায় এক দিবস প্রাতঃকালে সশিষ্যে আশ্রমে বসিয়া আছেন। মাঘ মাস, দারুণ শীত পড়িয়াছে, শিষ্যগণ ধুনির চতুর্দ্দিকে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছেন। হঠাৎ সকলে দেখিতে পাইলেন, গোস্বামী মহাশয় খুব কাঁপিতেছেন। তাঁহার গাত্রে ফ্লানেলের আলখেল্লা ও তদুপরি পুরু কম্বল, অথচ তিনি শীতার্ত্ত হইয়া ভয়ানক কাঁপিতেছেন, কোন কথাই বলিতে পারিতেছেন না, কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কি যেন দেখাইতেছেন। তখন

শিষ্যগণ দেখিতে পাইলেন যে বহির্দ্দেশে একজন শীর্ণ কলেবর দুঃখী নগ্নদেহে মাঘের ভয়ঙ্কর শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে আর গোস্বামী মহাশয় একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া আছেন ও সেইরূপ কাঁপিতেছেন। তখন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার শরীর হইতে কম্বল খানা খুলিয়া লইয়া সেই হতভাগ্যকে দেওয়া হইল। সেব্যক্তি কম্বল গায়ে ধুনিপার্শ্বে কিছু কাল বসিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইল, এবং গোস্বামী মহাশয়ও স্থির হইলেন। *

দ্বারভাঙ্গাতেও ঠিক এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। একটী শীতার্ত্ত বালকের কম্প দেখিয়া তাঁহার কম্প উপস্থিত হইয়াছিল এবং বস্ত্রদ্বারা বালকের শীত নিবারণের ব্যবস্থা করিলে তাঁহার কম্প নিবারিত হইয়াছিল। সহানুভূতির কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

তাঁহার কোন অনুরাগী উদাসীন শিষ্য বলিয়াছেন,—"কুম্ভমেলায় বাগচি মহাশয়ের (ইনি গোস্বামী মহাশয়ের একজন অনুগত শিষ্য) অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার আশ্রমে গৌরনিতাইর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গৌরনিতাই যে হরিনাম প্রচার করিয়া বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন সেই নামমাহাত্ম্য প্রচার গোঁসাইরও জীবনের ব্রত। নামের মাহাত্ম্য প্রচারকের প্রতি অপকট প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তিনি গৌরনিতাইর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে কীর্ত্তন ও আরতি হইত।"

কুম্ভমেলায় একদিন পূর্ণানন্দ স্বামীর (ইনি একজন বিখ্যাত মহান্ত) সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও প্রসঙ্গ হয়। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের কপালে তিলক দেখিয়া বলিলেন;—"তেরা ললাটমে ত মেরা মহাদেব ঝারা ফেরতা"। গোঁসাই উত্তর করিলেন—"মেরাত বহুত্ ভাগ্ হ্যায়, কি

* সঞ্জীবনী ১৩০৬ আষাঢ়

মহাদেবজী হামারা ললাটমে টাট্টি ফের্তা।" এইরূপে যিনি যাহা বলিতেন অবনতমস্তকে তাহারই সদর্থ গ্রহণ করিতেন।

কুম্ভমেলায় অবস্থানকালে একদিন সশিষ্যে এলাহাবাদে সা সাহেবের (একজন মুসলমান সাধু) আশ্রমে গমন করেন, এবং সশিষ্যে তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করেন। তৎপর একদিন রাত্রিতে সা সাহেব গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে আসিলে তিনি তাঁহাকে পরমসমাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজের পার্শ্বে বসাইয়া ধর্ম্মালাপ করেন।

ইহার পর মেলা ভাঙ্গিয়া গেল, সাধুরা পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিলেন। তখন যেন কত যুগের বান্ধবের নিকট পরস্পরের বিদায় আরম্ভ হইল। কোন প্রকার ঘটনায় যাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, কোন প্রকার আসক্তিতে যাঁহারা আবদ্ধ নহেন আজ তাঁহাদের চক্ষুতেও জল আসিল। প্রেমিক গোস্বামী মহাশয়ের নেত্রযুগল আর্দ্র হইল, বড় কাটিয়া বাবার মুখমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ মেঘমণ্ডলের আকার ধারণ করিল; সকলেরই প্রাণ ব্যথিত হইল। একমাস ব্যাপী মহোৎসবপূর্ণ প্রয়াগের চড়া একদিনে আবার শূন্যস্থানে পরিণত হইল। *

মেলার অবসানে ফাল্গুন মাসে গোঁসাই এলাহাবাদের বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমসখীর বিবাহ হয়। তাঁহার কোন অনুরাগী উদাসীন শিষ্যের মুখে শুনিয়াছি যাঁহার সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্থির হয় কন্যার তাঁহার প্রতি অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ হওয়ায় এবং কন্যাটী হিন্দুভাবে প্রতিপালিত হওয়ায় গোঁসাই হিন্দুসমাজের ছেলের সঙ্গে এই বিবাহ দিতে সম্মতি দান করেন। তখন একজন, বরের অভিভাবককে বলিয়াছিলেন;—"যাঁহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিতেছেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক।" এইরূপে সাবধান করা সত্ত্বেও

* কুম্ভমেলা ও শিষ্যগণ হইতে সংগ্রহ।

তিনি এই স্থলে পুত্রের বিবাহদানে ইচ্ছুক রহিলেন। গোসাঁইজী গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন না বলিয়া এই বিবাহে কন্যাকর্ত্তা হন নাই। তাঁহার পুত্র যোগজীবনবাবু মন্ত্রপাঠ করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "আমার নাম বলিবার সময় শ্রীবাদ দিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কন্যা বলিবে।" তিনি বিবাহ স্থলে উপস্থিত ছিলেন না। যদিও তিনি সামাজিক বন্ধনমুক্ত উদাসীন সন্ন্যাসী তবুও পুত্র কন্যাগণ সহিত বাস করিতেন। পরিবার ধর্ম্মসাধনের প্রধান স্থান এই ভাব, যাহা তিনি যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সেই ভাব তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্যান্য সন্ন্যাসীর মধ্যে এই ভাব প্রায় দেখা যায় না।

এলাহাবাদ হইতে তাঁহারা ফাল্গুন মাসে কলিকাতা যাত্রা করেন। যখন তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়াছেন, গাড়ী ছাড়িবার অল্পক্ষণ বাকী আছে, তখন একজন মুসলমান ফকির (তাঁহার গুরুভাই সা সাহেব, ইঁহার সঙ্গে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল) দ্রুতবেগে আসিয়া গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি গাড়ী বদল করিলেন, কিন্তু গাড়ী পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনরূপ প্রশ্নের উদয় হইল না। অবশেষে গাড়ী হুগলির নিকটবর্ত্তী মগরা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে অপর গাড়ীর সংঘর্ষে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল; কিন্তু তাঁহারা যে গাড়ীতে ছিলেন উহাতে কোন আঘাত লাগে নাই। গাড়ী পরিবর্ত্তন না করিলে অবশ্যই তাঁহাকে গুরুতর আঘাত পাইতে হইত। ঈশ্বরকৃপায় রক্ষা পাইলেন।

কুম্ভমেলা হইতে আসিয়া নবদ্বীপে চৈতন্যোৎসবে গমন করেন। তথায় কয়েক দিন খুব কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনে একদিন একটী স্ত্রীলোক উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমে জাতিভেদ ছিল না। এজন্য নবদ্বীপে যে

কয়েক দিন ছিলেন রন্ধনের কার্য্য কোন উদাসীন কায়স্থ শিষ্যদ্বারা সম্পন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে মিলিয়া আহার করিয়াছিলেন।

তৎপর কলিকাতা আসিয়া সুকিয়াষ্ট্রীটে অবস্থান কালে তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয়া, কনিষ্ঠা কন্যার জ্বরবিকার হয়। ডাক্তার নীলরতন সরকার ও জগদ্বন্ধু বসু চিকিৎসক নিযুক্ত হন। প্রাণপণে চিকিৎসা চলিল, কিন্তু তর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল। আত্মীয়স্বজনের উদ্বেগের অবধি ছিল না। কখন্ শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় ভাবিয়া সকলেই অধীর ছিলেন। কিন্তু সকলের অস্থিরতার মধ্যে কন্যার পিতা পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে পরামর্শ দিতেছিলেন ;—"যথাসাধ্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত কর, ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে এজন্য ব্যস্ত হইতেছ কেন" বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিতেছিলেন। পরে যথাকালে নিয়মিত কার্য্য সম্পাদনার্থ যাওয়ার সময় জানালা দিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া গেলেন। ক্রমে শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল, একজন শিষ্য কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব করিলে, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন ;—"যাহাতে তোমাদের মনে কোন ক্ষোভ না থাকে তাহাই কর।" অবশেষে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল, কন্যার দেহত্যাগ হইল (১৩০১ জ্যৈষ্ঠ)। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িল, কিন্তু তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি যেমন পাঠ করিতেছিলেন, তেমনই তাঁহার পাঠ চলিতে লাগিল। পরে পাঠ শেষ হইলে প্রণামাদির পর গ্রন্থ বাঁধিয়া রাখিলেন ও উঠিয়া স্নানের ঘরে যাওয়ার সময় মৃতশবের নিকট উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। গায়কের অভাবে বিধুবাবু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পলকহীন-দৃষ্টি, মাধুর্য্যপূর্ণ বদনকান্তি, অপূর্ব্ব প্রভায় আলোকিত হইল। বালুকণা যেমন সূর্য্যকিরণে জ্যোতির্ম্ময় হয় তাঁহার সর্ব্বশরীর তেমনি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। কীর্ত্তনান্তে একবার মৃতশবের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া

পুনরায় গিয়া আসনে বসিলেন, এবং পূর্ব্বের নিয়মে কার্য্যাদি চলিতে লাগিল। *

কিছুদিন স্থকিয়াষ্ট্রীটে রাখালবাবুর বাড়ীতে বাস করেন। একদিন শিষ্যবৃন্দ এবং অপর অনেক লোকসহ বসিয়া আছেন এমন সময় রাখালবাবু কোন সাহেবের হোটেল হইতে কিছু খাদ্য(নিরামিষ)+ আনিয়া গোঁসাইজীকে দিলেন। তিনি উহা ভাগ করিয়া গৃহের সকলকে দিলেন এবং নিজেও আহার করিলেন। আহারান্তে তাঁহার জনৈক শিষ্য বলিলেন ;—"আপনি এমন শুদ্ধাচারী অথচ আজ সাহেবের হোটেলের খাদ্য নিজে খাইলেন এবং আমাদের সকলকেও খাওয়াইলেন,এ কেমন ?" তিনি শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রলিলেন, এবং পরে করযোড়ে ব্রাহ্মসমাজের আরাধনার ন্যায় আরাধনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন ;—"তুমি সর্ব্বময়, সকল পদার্থেই তুমি আছ। আমি তোমাকে বিশ্বময় দেখিতেছি। তবে কিরূপে কোন খাদ্যদ্রব্য ঘৃণা করিয়া তুচ্ছ করিব ? এবং কিরূপেই বা কেহ কোন খাদ্য দিলে তাহা অশ্রদ্ধা করিয়া ত্যাগ করিব ?" এই ভাবে আরাধনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ঘরভরা লোক সকলে নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে কথাটি নাই, যিনি দোষারোপ করিয়াছিলেন তিনিও আর কিছুই বলিলেন না। ‡

এই সময় রাখালবাবুর বাড়ীতে একটী শিশুর হাম হওয়ায়, গৃহকর্ত্তা শঙ্কিত হন ; এবং গোস্বামী মহাশয় তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় প্রস্থান করেন।

ইহার পর তিনি অনেক দিন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের একটী বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার আশ্রমে অনেক হিন্দু শিষ্য ছিলেন ; কিন্তু গোঁসাইর মধ্যে

* নব্যভারত, ১৩০৬ সন। + একজন শিষ্য বলিয়াছেন কিছু মিষ্ট দ্রব্য।

‡ ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। একদিন তাঁহার শরীর একটু অসুস্থ হইল। কি খাইলে ভাল হইবে শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে নানা জনে নানারূপ বলিলেন। কেহ বলিলেন পাউরুটী খাইলে ভাল হয়। গোঁসাই তাঁহার সঙ্গে একমত হইয়া পাউরুটী খাওয়াই স্থির করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং কতকদিন নিয়মিতরূপে সাহেবের বাড়ীর পাউরুটী খাইলেন। *

"সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গোঁসাইজী অনেক দিন বাস করেন। এই বাড়ীতেই রমেশচন্দ্র মিত্র, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই স্থানে কত আনন্দে, কত উৎসবেই দিন গিয়াছে; কত কীর্ত্তন, সঙ্গীত, নৃত্য ও ভক্তির উচ্ছ্বাসই হইয়াছে। কত সময় পাগলের ন্যায় হইয়া ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়াছেন; কত সময় করযোড়ে প্রাণহীন কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় আসনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কতবার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার বহির্ব্বাস, কৌপিন খসিয়া পড়িয়াছে, কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। এই বাড়ীতেই একদিন ব্রহ্মব্রত সামশ্রমী মহাশয় তানপুরা সহযোগে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চমাধ্যায় গান করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন; তিনি শুনিয়া ভাবে বিভোর হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন; এবং পুস্তকখানি মস্তকে রাখিয়া ছিলেন। কীর্ত্তনে কত সময় ভাবে অধীর হইয়া গড়াগড়ি দিতেন আর বলিতেন;—"ইহলোক-বাসী, পরলোকবাসী, স্বর্গবাসী, নরকবাসী, সকল জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী যে যেখানে আছ সকলে আমাকে দয়া কর। আমি সকলেরই পায়ে নমস্কার করিতেছি! তোমরা সকলেই আমাকে আশী-র্ব্বাদ কর।" তাঁহার সেই সুগভীর প্রাণগত আর্ত্তি, সেই বালকের ন্যায়

* জনৈক অনুরাগী উদাসীন শিষ্য হইতে সংগ্রহ।

সরল ক্রন্দন, দেখিলে পাষাণও গলিয়া যাইত। ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতা! প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যপ্রভু যেমন বলিয়াছিলেন—

"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি,
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি।
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব,
নন্দের দুলালে আমি কোথা গেলে পাব।"

"তাঁহার আর্ত্তি, ব্যাকুলতাও এই প্রকারের।" * এই ব্যাকুলতা লইয়া তিনি আজীবন যাপন করিয়াছেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমিদার বদান্যপ্রবর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গোস্বামী মহাশকে নিজ ভবনে লইবার জন্য এক সময়ে রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়কে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। গোঁসাইজী বলিলেন;—"আমি যাইতে পারিব না।" পরে উক্ত ঠাকুর মহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন যে;—"আমি গোঁসাইজীর নিকট যাইয়া গোপনে কিছু কথা বলিতে চাই।" গোঁসাইজী বলিলেন; "আমার এখানে লোকেরা নিজের ইচ্ছামত আসে এবং ইচ্ছামত বসে কাহাকেও উঠিয়া যাইতে বলা হয় না, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তিনি আসিবেন অথচ হয়ত তখন এস্থান নির্জ্জন হইবে না, সুতরাং নির্জ্জনে কথা কিরূপে হইবে? বিশেষতঃ আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তিনি অতি ভাল ভাল সাধুদের সহিত আলাপ করিতে ও মনের কথা বলিতে পারেন"। গোস্বামী মহাশয় অনেক সময় বলিতেন "কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাপ্রাণ ব্যক্তি, তাঁহার অন্তঃকরণ অতি উচ্চ এবং তাঁহার ন্যায় বদান্য লোক কলিকাতায় নাই বলিলেই হয়", অথচ সেই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ী গেলেন না। সেই সময় কলিকাতায় বড়ই সাধুর ধুম পড়িয়াছিল, এবং সাধুর বেশধারী অনেকেই ধনীদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কয়েকটী

* জনৈক শিষ্যের উক্তি।

অবতারের দলও বাহির হইয়াছিল। যে ধনীকে হস্তগত করিতে হইবে তাঁহারা তাঁহাকেও অবতারত্বের কিছু কিছু অংশ দিতেন। এই জন্যই বোধ হয় গোস্বামী মহাশয় উক্ত ঠাকুর জমিদার মহাশয়কে মহাপ্রাণ ব্যক্তি জানিয়াও কেবল ধনী বলিয়া তাঁহার বাড়ীতে যান নাই।”

“এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পরে উক্ত ঠাকুর জমিদার মহাশয় বাবু মনোরঞ্জন গুহকে সঙ্গে করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের দর্শনার্থে গিয়াছিলেন। সকাল বেলায় পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময়ে ঠাকুরবাবু গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পৌঁছিলেন। গোঁসাইজী মর্য্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহাকে একখানি স্বতন্ত্র আসন দিলেন, বিনয়ী ঠাকুরবাবু আসনখানি পশ্চাতে রাখিয়া ভূমিতলেই উপবেশন করিলেন। কিছুকাল কথোপকথন করিয়া এবং সাধুর বেশধারী ব্যক্তিদিগের অত্যাচারের কথা কিছু বলিয়া ঠাকুরবাবু নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে উক্ত ঠাকুরবাবু মনোরঞ্জনবাবুকে বলিলেন;—“আমি এপর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশজন সাধুদ্বারা প্রতারিত হইয়াছি। প্রাণে যাহা একটু ভক্তিশ্রদ্ধা আসিয়াছিল, সাধুদের ব্যবহারে তাহাও বুঝি টিকিল না। তুমি গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদের ত দিব্যদৃষ্টি নাই, আমরা সাধু চিনিব কিরূপে?” মনোরঞ্জনবাবু একথা গোস্বামী মহাশয়কে জানাইলেন। গোঁসাইজী বলিলেন;—“সাধু চেনা বড়ই শক্ত; তবে কয়েকটি বাহ্য লক্ষণ আছে। সাধু কখনই ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না, সাধু কখনই আত্মপ্রশংসা করেন না, সাধু কখনই পরনিন্দা করেন না, সাধু কখনও বুজরুকী করেন না, সাধু কখনই অপরের ধর্ম্ম বিশ্বাস নষ্ট করেন না; অর্থাৎ ধনপ্রিয়তা, প্রশংসাপ্রিয়তা, পরনিন্দাপ্রিয়তা, বুজরুকী ও দল টানা ভাব সাধুতে কখনই থাকে না।” এই কয়েকটী

কথা লিখিয়া লইয়া মনোরঞ্জনবাবু ঠাকুর মহাশয়কে দিলেন, তিনি কাগজখানা একজন অনুগত লোককে বাক্সে পূরিয়া রাখিতে বলিলেন। সেকথা আসিয়া মনোরঞ্জনবাবু গোঁসাইজীকে বলিলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন ;—"রাখিলে কি হইবে, উনি (ঠাকুরবাবু) যেরূপ সরল ও অমায়িক লোক, ধূর্ত্ত লোকের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া উঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য। যদি উঁহার হিতৈষী সুবোধ কোন কর্ম্মচারী থাকেন তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি নিজে বিশেষভাবে না জানিয়া কোন সাধুকে তাঁহার নিকটে যাইতে না দেন।"*

গোঁসাই ধনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইচ্ছা করিতেন না, আবার ধনীগণকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষাও করিতেন না। বরং বলিতেন ধনীদের উপর অনেক লোকের সুখ দুঃখ ন্যস্ত আছে ; একটী ধনী সৎ হইলে কতলোক সৎ হয়, একটী ধনী অসৎ হইলে কত লোক অসৎ হয়। ধনীরা উপেক্ষার পাত্র নয়। কিন্তু ধনী লোকের বেশী সঙ্গ করা সাধুদের পক্ষে উচিত নয়। এইরূপে অনেক সাধুর পতন হইয়াছে। ধনীর সহবাসে একটী সাধুর পতনবিবরণ একদিন এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—

এক জমিদার মোকদ্দমায় পড়িয়া কোন সাধুর শরণাপন্ন হইলেন। সাধু অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে একটী তুলসীপত্র দিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে জমিদারের ভাগ্য প্রসন্ন হইল, তিনি জয়লাভ করিলেন। ইহাতে সাধুর প্রতি তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল যে সাধুর আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দেবোত্তর সম্পত্তি দানে ইচ্ছুক হইলেন। সাধু প্রথমে উহা গ্রহণে সম্মত হন নাই ; কিন্তু শিষ্যগণের অনুরোধ ও তাঁহারাই সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন শুনিয়া সম্মত হইলেন। ইহার পর

* নব্যভারত, ১৩০৬ সন।

জমিদারের মৃত্যু হইলে উক্ত সম্পত্তি লইয়া জমিদার পুত্রের সঙ্গে শিষ্যগণের মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, সাধু ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বিপন্ন শিষ্যগণের রক্ষার জন্য উকীলের গৃহে গমনাগমন আরম্ভ করিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন সহসা সাধুর বিবেক জাগ্রত হইল, তিনি ভাবিলেন ;—"হায় হায়, আমি কি এই জন্য সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি? ছি, ছি, ধিক আমাকে, আর না, আমি এখনই যাই।" এই বলিয়া পুনরায় নির্জ্জনে গিয়া গভীর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এই গল্পটি বলিয়া বলিলেন ;—"অর্থসঙ্গ সাধুর পক্ষে হলাহল।" কোন অবস্থাতেই যে মানুষের পতন অসম্ভব নয়, গল্পটিতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। অহঙ্কারী মানুষকে সতর্ক করিবার পক্ষে ইহা একটা সারগর্ভ উপদেশ।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসায় একদিন মুসলমান ফকির সা সাহেব তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া একটী পেয়ারার একার্দ্ধ নিজে দাঁতে কামড়াইয়া খাইয়া অপরার্দ্ধ তাঁহাকে খাইতে দিলেন। তিনি ঐ সাধুর প্রেমদর্শনে এমন মুগ্ধ হইলেন, যে তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রু পাত হইতে লাগিল। তিনি সাধুর প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু সাধু তাঁহার প্রসাদ চাহিলে আর দিলেন না।

তিনি কতকদিন কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। তথায় প্রতিদিন কীর্ত্তন হইত ; কীর্ত্তন শুনিয়া রাস্তার লোকও মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। একদিন অপরাহ্নে কীর্ত্তনের সময় দুই জন মুসলমান ফকির রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন ; তাঁহারা কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া সিঁড়ির নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মুসলমান বলিয়া উপরে উঠিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহাদের আগ্রহ ও অনুরাগ বিদ্যুতের ন্যায় অলক্ষিতভাবে গোস্বামী মহাশয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি স্বয়ং নীচে নামিয়া আসিয়া ঐ দুই জন ফকিরকে আলিঙ্গন

করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। তৎপর তিনজনে মিলিয়া প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিলেন। *

তিনি ফাল্গুন মাসে সশিষ্যে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। রওনা হইয়া উপর হইতে নীচে নামিয়াছেন তখন তথায় একজন মেথরকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন ;—"আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার বৃন্দাবন দর্শন সার্থক হয়।"

বৃন্দাবনে ছয়মাস কাল বাস করিয়া নানাশ্রেণীর সাধুসজ্জনের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ ও সাধনভজন করেন। তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তি দেখিয়া তথাকার বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়াছিলেন। গৈরিকবসন পরিধান করা এবং রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করা বৈষ্ণবগণের অনুমোদিত নহে। তাঁহারা তাঁহার ঐরূপ পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর গৌর শিরোমণি মহাশয় সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার নিকট বেশ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। গোঁসাইজী বলিলেন ;—আপনি কি বলেন যে বেশ পরিবর্ত্তন না করিলে আমার বৈষ্ণবধর্ম্ম লাভ হইবেনা ?" শিরোমণি মহাশয় বলিলেন ;—"এরূপ কথা আমি বলিতে পারি না ?" তিনি বলিলেন ;—"তবে লোকের কথার জন্য আমি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারি না।" জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তিনি কখনও মানুষের কথায় চলেন নাই। অথচ তাঁহার ন্যায় মানবপ্রেমী, বন্ধুবৎসল, মিষ্টভাষী লোক অতি বিরল।

একদিন বৃন্দাবনের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন এরূপ স্থির হয়। সকালে ৮টার পূর্ব্বেই তাঁহাদের আসিবার কথা ছিল। তাঁহাদের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন শিষ্য বলিলেন "অমুক মহাশয় তাঁহাদিগকে একটু বিলম্বে

* ৺ বঙ্কবিহারী বসু কথিত

আসিতে বলিয়াছেন। কারণ এই সময় আপনি চা খাইয়া থাকেন। * তিনি ভাবিয়াছেন যে বৈষ্ণবগণ সকাল বেলায় আপনাকে চা খাইতে দেখিলে হয়ত অবৈষ্ণব মনে করিবেন। সুতরাং তাঁহাদের একটু বিলম্বে আসাই ভাল।" তিনি বলিলেন, "সে কি? কথার অনুরূপই কার্য্য করা উচিত। যখন কথা তখনই তাঁহাদিগকে আনা উচিত। আমার চা খাওয়া দেখিলে তাঁহাদের অশ্রদ্ধা হইবে বলিয়া আমি কি করিব? আমি গোপন করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না।" †

তিনি যখন যেখানে থাকিতেন তথায় নিয়মিতরূপে শাস্ত্র পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হইত; কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। বৃন্দাবনেও এই নিয়ম ছিল। তিনি সকাল বেলা তাঁহার এক জন শিষ্যের মুখে কিছুক্ষণ বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ শুনিতেন, তৎপর নিজে কিছুক্ষণ পড়িতেন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিই তাঁহার সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল। ভাগবত, পুরাণ, চৈতন্যচরিতামৃত, তুলসীদাসের রামায়ণ, গুরু নানকের গ্রন্থসাহেব তাঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল। গুরু নানকের গ্রন্থ পড়িতে তিনি সমধিক ভালবাসিতেন; এজন্য প্রতিদিন অনেকক্ষণ উহা পড়িতেন। বৃন্দাবনে একদিন ভাবে মগ্ন হইয়া সুর করিয়া নানকের গ্রন্থ পড়িতেছেন এমন

* কোন উদাসীন শিষ্য বলিয়াছেন—"তিনি প্রাতে তিলক না কাটিয়া চা পান করিতেন, ইহা বৈষ্ণব রীতিবিরুদ্ধ হওয়াতে বৈষ্ণবগণ তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করেন। তাহা শুনিয়া পণ্ডিত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যথিত হইয়া তাঁহার ব্যবহারের জন্য প্রত্যূষে ক্ষুদ্র একটী পাত্রে চন্দন রাখিয়া যাইতেন। তদবধি গোসাইজী চা পানের পূর্ব্বে তিলক কাটিতেন। তিনি স্বয়ং কোন সংস্কার বা রীতি রক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। তিলক, মালা, গেরুয়া, জটা ইত্যাদি বাহ্য চিহ্ন সমূহ অন্যের অভিপ্রায়ে বা সন্তোষার্থে ব্যবহার করিতেন। কোনটী বা কাহারও স্মৃতিস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ইহার কিছুতেই তিনি আবদ্ধ বা আসক্তিযুক্ত ছিলেন না।

† নব্যভারত, ১৩০৬ সন।

সময় একজন বৈষ্ণব সাধু আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেছিলেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পাঠ শেষ হইলে বাবাজিকে দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। বাবাজি হিন্দি ভাষায় বলিলেন ;—"দেখ তুমি বৈষ্ণব, তুমি কেন নানকের গ্রন্থ পাঠ কর ? এই গ্রন্থ বৈষ্ণবের গৃহে রাখাও উচিত নয়।" বাবাজির কথায় তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন ;—"দেখুন আপনারা বিজ্ঞ, আমি অতি অধম মূর্খ, আমি কিছু বুঝি না ; কিন্তু আপনি ক্ষমা করিবেন, এই গ্রন্থসাহেব আমি কখনও ছাড়িতে পারিব না। ইহাকে আমি গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকি।" বাবাজি নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেলেন।

বৃন্দাবনে একদিন কচ্ছপকে ছোলা দিতে দিতে বলিতেছিলেন ;—"কেহ যদি মনে করেন এই কচ্ছপকে খাওয়াচ্ছি তবে ঠকিলেন।" প্রকৃত কথা এই মনুষ্য, ইতর জীব ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীতে যিনি প্রাণরূপে বিরাজিত, সকল জীবের তুষ্টিতে যাঁহার পরিতুষ্টি প্রত্যেক সেবার অনুষ্ঠানে তিনি তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত ছিলেন ; এবং প্রতিকার্য্যে ইহা অনুভব করিতেন। এজন্য বালকবালিকাদিগকে কত যত্ন ও আদর করিতেন। তাহাদের মুখশ্রীতে ও ক্রীড়াতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া কত সময় ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতেন।

তীর্থ ভ্রমণকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। তীর্থস্থলে সাধু সন্ন্যাসীগণ বাস করেন, তথায় গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিলে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত থাকিবে এজন্য তিনি ভগ্ন দেহ লইয়াও নানা তীর্থে গমন করিতেন। তাঁহার মতে—"যেখানে ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাগণ বাস করেন সেই স্থানই প্রকৃত তীর্থ।" "মৃগনাভি যেমন কোন গৃহে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া কিছুদিন পরে স্থানান্তরিত করিলেও বিশ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত যখনই বাক্স খুলিবে তখনই গন্ধ পাইবে তদ্রূপ যেখানে

কোন মহাত্মা তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সহস্র বৎসর পরেও যদি কেহ সেইরূপ তপস্যার ভাবে শুদ্ধমনে সেইস্থানে উপবেশন করেন তবে সেই মুহূর্ত্তেই সিদ্ধপুরুষের কুণ্ডলিনীশক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অভিভূত করিবে।" "সিদ্ধ পুরুষগণের শ্বাস প্রশ্বাস তথাকার সমীরণে নিয়ত প্রবাহিত হয়।" * তীর্থস্থান গুলিতে সাধারণতঃ অধিক সংখ্যক ধর্ম্মার্থী সাধু লোক বাস করেন। ঐ সমস্ত স্থানে তাঁহাদের সাধনার ফল মৃগনাভির সুগন্ধির ন্যায় বিরাজিত আছে। এজন্য তীর্থস্থানে গমন করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণের সাধনের ফল অন্ততঃ আংশিক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে এই বিশ্বাসে ভগ্নদেহ লইয়াও তীর্থস্থানে যাইতে ব্যস্ত হইতেন। তীর্থস্থানে গিয়া তিনি সুস্থির ভাবে বসিয়া থাকিতেন না, কোথায় কোন্ সাধু আছেন, কে কি ভাবে ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, তাহার সন্ধান লইতেন; সাধুদর্শনে, সাধুসহবাসে, সাধুর সঙ্গে ধর্ম্মালাপে তাঁহার দিবসযামিনী গত হইত; সাধুসঙ্গ লাভের জন্যই তিনি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানে বার বার গিয়াছেন।

কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে তাঁহার বহু ধর্ম্মালাভ হইয়াছিল; বৃন্দাবন, প্রয়াগ ইত্যাদি স্থানে কত সাধু মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসাধনই যাঁহার জীবনের ব্রত তাঁহার সঙ্গে সাধন পথের পথিকদের আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা হওয়া স্বাভাবিক।

১৩০২ সনের ভাদ্রমাসে অসুস্থ দেহে তিনি বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা আসেন, এবং অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকার অশ্রেমে উপস্থিত হন। মাঘ মাসে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মতিথি উপলক্ষে ধূলট উৎসব হয়। ঢাকাতে আরও কয়েকবার ধূলট উৎসব হইয়াছিল, কিন্তু এই বারে অত্যন্ত সমারোহ, ও উৎসবের বিপুল আয়োজন দেখিয়া লোকের

---

* আশাবতীর উপাখ্যান।

মনে বিস্ময় জন্মিয়াছিল। সপ্তাহকাল হরিনাম সংকীর্ত্তনে ঢাকার নরনারী প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র ঈশ্বরের প্রেরিত দানের উপর নির্ভর করিয়া এই কয়েক দিন অহর্নিশি দীনদুঃখী, গরীব, কাঙ্গাল এবং অন্যান্য যে কেহ আসিয়াছিল তাহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইয়াছিলেন। আহারে জাতির বিচার ছিল না। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে একত্র ভোজনে বসিত। দশ বার জন পাচক নিয়মিত রূপে রন্ধনের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। শত শত কাঙ্গালী এবং অপর লোক দলে দলে বসিয়া নানাবিধ সুখাদ্যদ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতেছে, আর সংস্থানহীন একজন উদাসীন ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। ভোজনের সময় গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া "ইহাকে আরও সন্দেশ দাও, এই বুড়কে আরও কয়েকটা রসগোল্লা দাও," এই বলিয়া আদর করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল যে ;—"ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ সজ্জনকে সকলেই যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু গরীব দুঃখীকে এমন আদর করিয়া এমন ভাল বাসিয়া বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্দেশ মিষ্টান্ন দিয়া ভোজন করায় এমন আর দেখা যায় না।" নানা স্থান হইতে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার আশ্রম পূর্ণ করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহাদিগের বাসের জন্য কয়েকটী বস্ত্রাবাস (তাঁবু) স্থাপন করিতে হইয়াছিল।* একদিন একজন বেশ্যা এই উৎসরের ব্যাপার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিল ; গোঁসাইজী তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রসাদ দেওয়াইয়াছিলেন। ধূলটের শেষ দিন বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। "হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম, কলিতে তারক ব্রহ্ম হরিনাম" এই গানে সহর নিবাদিত হইয়াছিল।

অতঃপর ঢাকা হইতে কলিকাতা গিয়া দুইবৎসর অবস্থান করেন।

---

* সঞ্জীবনী, ১৩০৬।

এই সময় সর্ব্বদা তাঁহার আশ্রম শিষ্য ও অনুগত জনের সমাগমে আনন্দপূর্ণ হইয়াছিল। শিষ্যগণের অনুরাগ কত তাহা ইহাতেই বোধ হইবে যে যাহারা সমস্ত দিবস অফিসের কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতেন তাঁহারাও সায়ংকালে সংসারের সকল কাজ ফেলিয়া দুই এক ক্রোশ দূর হইতেও তাঁহার আশ্রমে আসিয়া মিলিত হইতেন; এবং অনেকে তথায় রজনী যাপন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে এবং কলিকাতায় অনেক সময় দেখা যাইত যাঁহারা সুখে বর্দ্ধিত তাঁহারাও সামান্য আসনে উপবেশন করিয়া ও বিনা উপাধানে শয়ন করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতেন। তাঁহার সহবাসই যেন তাঁহাদের আনন্দ নিকেতন ছিল। শিষ্যগণের প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিতেন গুরু তাঁহাকে অধিক ভালবাসেন। কিন্তু তাঁহার ভালবাসায় ইতরবিশেষ ছিল না, সকলকেই সমান দেখিতেন। একদিন একজন আত্মীয় যোগজীবনবাবুর ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবের প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন;—"আমি যোগজীবন ও রাস্তার মুটেতে কোন তফাৎ দেখি না।" কেহ শিষ্যগণের মধ্যে ইতর বিশেষ করিলে তাঁহার প্রাণে ক্লেশ হইত। এজন্য তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন:—"দেখ গুরুভাইদের মধ্যে অমুক বড়, অমুক ছোট এরূপ ভেদজ্ঞান করিও না; তাহাতে অপরাধ হয়। কাহারও সাধনের অবস্থা ভাল দেখিয়া তাহাকে বড়, অন্যকে ছোট জ্ঞান করিও না। একথা মনে রাখিও যে তোমাদের সকলের সাধনার অবস্থার চাবিকাটি এক জনের হাতে, তিনি ইচ্ছা করিলে একমুহূর্ত্তে কাহারও অবস্থা খুলিয়া দিতে এবং কাহারও অবস্থা চাপিয়া দিতে পারেন।" আশ্রমে কোন দ্রব্য আসিলে তিনি সকলকে দিতে বলিতেন, কাহাকেও না দিলে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ হইত।

কলিকাতার হ্যারিসনরোডের বাড়ীতে একদিন ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা উচ্চকীর্ত্তন লইয়া আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় কীর্ত্তনে যোগ দেওয়ায় মুহূর্ত্তের মধ্যে কীর্ত্তনকারীগণের প্রাণে প্রবল ধর্ম্মোৎসাহ জন্মিয়াছিল। সকলের কণ্ঠ খুলিয়া গিয়া কীর্ত্তনে খুব জমাটভাব উপস্থিত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় ভাবে মত্ত হইয়া গড়াগড়ি দিয়া বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মসমাজ আমার পরম প্রিয়বস্তু, আমি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা পরম উপকৃত হইয়াছি।" *

কীর্ত্তনের শেষে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় † গোস্বামী মহাশয়কে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর করিলেন;—"আমিও আমার গুরুদেবের নিকট এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"এক ব্যক্তি একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু গাভীটি কিছুতেই লইয়া যাইতে সমর্থ না হওয়ায় বিরক্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি প্রহার আরম্ভ করে; এবং এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক পান্থশালায় উপবেশন করিয়া লোকদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। পান্থনিবাসী একজন বলিল "তুমি গোবৎসটীকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রে গমন কর, তাহা হইলে অতি সহজেই গাভীটি পশ্চাদনুসরণ করিবে। তাহাই হইল। ভগবানকে লাভ করিতে হইলেও তাঁহার সন্তানদিগকে বুকে তুলিয়া লইতে হইবে, তাহা করিতে পারিলে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

---

* স্বর্গীয় কৃষ্ণদয়াল রায় কথিত।

† ইঁহার সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল। তাঁহার বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণের কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। শেষ জীবনেও তাঁহাদের কথা অনেক সময় বলিতেন।

কলিকাতা অবস্থান কালে একবার ষ্টার থিয়েটারের গিরিশ ঘোষ মহাশয় চৈতন্যলীলা নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য গোঁসাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া কয়েক খানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট পাঠাইয়া দেন। গোঁসাই কতিপয় শিষ্যের সহিত অভিনয় দেখিতে যান। অভিনয় মঞ্চে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে মহাভাবের উচ্ছ্বাসে গোঁসাই নৃত্য আরম্ভ করেন। তাহা দেখিয়া দর্শক এবং অভিনেতৃগণের সকলের মনে একান্ত সদ্ভাবের উদয় হইয়াছিল। গিরিশ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন "চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল আজ আমরা সেই লীলা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

কলিকাতা অবস্থান কালে তাঁহার আশ্রমে সাধন ভজনের এক অমৃত প্রবাহ অহর্নিশি বহিত। আর গোঁসাই তাহাতে মগ্ন থাকিয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া কি সুখে যে ছিলেন কল্পনা করিয়া তাহা অনুভব করা কঠিন। অনেকে সমস্ত দিনের অফিসের শ্রমের পর বাড়ী না গিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে দুই একটী কথা শুনিয়া সমস্তদিনের শ্রান্তি দূর করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন একবার তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া গেলেই এক সপ্তাহের সম্বল হইল। এই যে আকর্ষণ, এই যে মিষ্টতা বোধ ইহা পৃথিবীর কোন বস্তুর লোভে মানুষের মধ্যে জন্মিতে পারে না। এক সত্য বস্তুর লোভেই মানুষের মনে এমন আগ্রহ সম্ভবে।

গোঁসাই একদিন হেরিশনরোডের বাসায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রাখালবাবু পুরীর বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া গোঁসাইর মন পুরীর দিকে ছুটিল। জগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এমন ভাব হইল যে চক্ষের জলে গণ্ড দুইটি ভাসিয়া গেল। পরে আরও কোন কোন শিষ্যের

মুখে পুরীর কথা শুনিয়া পুরী যাইতে একান্ত অভিলাষী হইলেন। তখনও পুরীর পথে রেল হয় নাই। পদব্রজে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁহার শরীর এরূপ অসমর্থ যে লাঠি ভর না দিয়া উঠিতে কি দুই পা চলিতে পারিতেন না। ষ্টীমারে যাওয়াও বহু ব্যয়সাধ্য। কিন্তু তাঁহার আগ্রহ ব্যাকুলতায় কোন বাধাই কার্য্যকরী হইল না। যাত্রার উদ্যোগ হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবন ও উপদেশ ভক্ত গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়জিনিষ ছিল। মহাপ্রভুর নামে তিনি ভাবে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিতেন। শচীনন্দন, শচীনন্দন, বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেন। একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"যখন ব্রাহ্মসমাজে ছিলাম তখন একদিন হাজারিবাগের রাস্তায় নির্জ্জনে এই অভিপ্রায়ে গড়াগড়ি দিয়াছিলাম যে মহাপ্রভু এই পথে গিয়াছিলেন, যদি তাঁহার পদধূলির এক কণাও গায়ে লাগে কৃতার্থ হইব।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বহু দিবস নীলাচল ভূমিতে সাধন ভজনে যাপন করেন। ঐ স্থান তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত বঙ্গবাসিগণ প্রায় আঠার বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর পথের অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের আশায় অনায়াসে বঙ্গদেশ হইতে পদব্রেজে নীলাচলে যাইতেন।

যে নীলাচল ভূমি গোস্বামী মহাশয়ের অতিপ্রিয় শচীনন্দনের প্রিয়স্থান, যথায় শচীনন্দন কত সাধন ভজন ও হরিগুণ কীর্ত্তনে যাপন করিয়াছেন,

শত শত নরনারী যথায় তাঁহার মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, সেই পুণ্যভূমি দর্শনের জন্য ব্যগ্র হওয়া প্রেমিক গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। গোস্বামী মহাশয় যে ইষ্টদেবতার দর্শন আশায় দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া ফিরেন, পুরুষোত্তমে না জানি তাঁহার কত করুণা প্রত্যক্ষ হইবে ইহাও তাঁহার পুরী যাত্রার উদ্দেশ্য।

গোস্বামী মহাশয় যৌবন কাল হইতে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতে পরিণত বয়সে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি এক প্রকার অচল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য প্রায় দুই বৎসর কাল কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাতায়াত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন কোন বন্ধুর মুখে পুরীর বর্ণনা শুনিয়া পুরুষোত্তম দর্শনে একান্ত ব্যগ্র হন। ইহাতে অবশেষে ভগ্নদেহেই পুরীযাত্রার আয়োজন করেন।

সমস্ত আয়োজন হইলে শিষ্যগণের কেহ কেহ মা'র নিষেধের কথার উল্লেখ করিলে বলিয়াছিলেন "মা রক্তামাশয়ে তথায় অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহাতেই আমাকে পুরী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি কাহারও সঙ্গী নই, আমার সঙ্গীও কেহ নয়। আমার পিতা পিসীকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে পুরী গিয়াছিলেন, পদ ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়াছিল, তবু নিরস্ত হন নাই। পায়ে ছালা ও বুকে কাঁথা জড়াইয়া গিয়াছিলেন। আমি লাঠি ভর দিয়া পায়ে ন্যাকড়া জড়াইয়া যাইব। তোমাদের কাহারও আমার সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন নাই।" তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া সকলের বাক্য বন্ধ হইল। অবশেষে একখানি ষ্টীমলঞ্চ ভাড়া করা হইল এবং শিষ্যদলসহ দুইখানি বজরায় কটক পর্য্যন্ত গিয়া ট্রেনে পুরী গমন করিলেন। (১৩০৪ সনের ২৪শে ফাল্গুন)।

বিদায় কালে বহু পুরুষ এবং নারী শিষ্য গঙ্গার ঘাটে একত্র হইলেন।

গোঁসাইজী গঙ্গার ঘাটে উপনীত হইলে শিষ্যগণ গাড়ী হইতে ষ্টীমার পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তায় তাঁহাদের গাত্রবস্ত্র পাতিয়া দিলেন। তিনি অনুগতগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া সেই সকল বস্ত্রের উপর চরণকমল অর্পণ করিতে করিতে ষ্টীমারে উঠিলেন। ষ্টীমার ছাড়ার সময় হইয়াছে কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই উঠিতে পারিতেছেন না।"* সকলেরই চক্ষে জল; মনোরঞ্জন-বাবু অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে প্রণাম করিয়া উঠিতেই গোঁসাইজী দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বলিলেন "আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" মনো-রঞ্জনবাবু সজল নয়নে বলিলেন "আপনাকে আমরা কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?" তিনি বলিলেন "এই আশীর্ব্বাদ করুন জগন্নাথদেব যেন আমাকে গ্রহণ করেন।" এই কথায় শিষ্যবর্গের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। একজন ভক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিদায়ের সেই করুণ দৃশ্য অদ্যাপি শিষ্যগণের স্মৃতিতে জাগিতেছে।

তাঁহাদের ষ্টীমার যখন ক্যানেল পথে যাইতেছিল তখন তীরস্থ বালক বালিকাগণ ভিক্ষা চাহিতেছিল। তিনি দরিদ্রদিগকে পয়সা দিতে একজন শিষ্যের প্রতি অনুমতি করিয়াছিলেন। দরিদ্রেরা প্রায় সকলেই পয়সা পাইয়াছিল, কিন্তু দুই একজন বাদ পড়িয়াছিল। তিনি বলিলেন;— "আহা ঐ লোক দুইটী পাইল না।" তখন ষ্টীমার অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি দিতে চাহিতেছেন অথচ দেওয়া হইবে না ইহা অনুগতের প্রাণে সহ্য হইল না; তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নির্গত হওয়া মাত্রই সেই চলন্ত ষ্টীমারের উপর হইতে তাঁহার শিষ্য বিধুবাবু জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন; এবং কূলে উঠিয়া ঐ দরিদ্রদিগকে পয়সা দিয়া সাঁতার দিয়া আসিয়া পুনরায় ষ্টীমারে উঠিলেন।

কটক গিয়া যখন তাঁহাদের লঞ্চ বিদায় দেওয়া হইল তখন তিনি

কুম্ভমেলা।

খালাসীদিগকে বক্‌সিস দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং তাহাদের আশার্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। বলিলেন "তোমাদের প্রসাদেই আমার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন হইতেছে। তোমরা কত বড় লোক আন, কত বক্‌সিস পাও। আমি যাহা দিতেছি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর; এবং আশার্ব্বাদ কর যেন আমার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন হয়।" শুনিয়া সকলের প্রাণ গলিয়া গেল।

তিনি যখন যে স্থানে গমন করিতেন বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের দর্শনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইত। এজন্য ব্যক্তি ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন। ভগবান সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, এ জন্য কাহারও চরণে মস্তক নত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বৃন্দাবন যাত্রা কালে মেথরের পায়ে এবং পুরী যাত্রায় খালাসীগণের নিকট আশার্ব্বাদ ভিক্ষা করা তাঁহার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা ও বিনয়েরই পরিচয়। তাঁহার এই ভাব যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের চক্ষু সার্থক এবং যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন কৃতার্থ হইয়াছে।

পুরীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই একজন পাণ্ডা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পাণ্ডা হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিল। তিনি ঐ ব্যক্তিতে ইষ্টদেবতার দর্শন পাইয়া ভাবে আত্মহারা হইলেন এবং সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সমস্ত তাহাকে দান করিলেন।

গোস্বামী মহাশয় ভগ্নদেহে প্রায় পঞ্চাশ জন শিষ্যসহ পুরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় পুরীর রেলওয়ে ষ্টেসন জগন্নাথের মন্দির হইতে প্রায় একক্রোশ ব্যবধানে ছিল। প্রেমোচ্ছ্বাসে এই পথ তিনি পদব্রজে গমন করিলেন। তাঁহারা আঠারনালা নামক স্থানে উপনীত হইলে মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইল। চূড়া দেখিয়াই ভাবের আবেগে তাঁহার নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া গেল; হুঙ্কার শব্দে 'হরিবোল' 'হরিবোল' করিতে করিতে নৃত্য

আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে শিষ্যমণ্ডলীতে তাঁহার ভাব সঞ্চারিত হইল; কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। এইভাবে শিষ্যদল কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং পঙ্গুপ্রায় বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয় সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে করিতে পুরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস এক দিন ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন;—"প্রবেশমাত্র স্থানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য আমার হৃদয়কে অধিকার করিল, আর যখন স্মরণ হইল, এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না।" জগন্নাথের মন্দির দর্শনমাত্র গোঁসাইজীরও ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হওয়াতে আত্মহারা হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাতেই অচল শরীরে এতটা পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার কোনরূপ ক্লেশ বোধ হয় নাই।

তিনি যদিও প্রায় অচল অবস্থায় পুরীতে উপনীত হইলেন তবু পুরীর মন্দিরাদি সমস্ত দর্শন না করিয়া নিরস্ত হইলেন না। যে দিন পুরী আসিলেন সেই দিনই বিশ্রাম করিয়া মন্দির দর্শনে যাত্রা করিলেন। বলিলেন "আজই মন্দির দর্শন করিতে হইবে। মৃত্যুর স্থিরতা নাই। কি জানি অদ্য রজনীতেই যদি মৃত্যু হয়।" এই বলিয়া লাঠি ভর দিয়া মন্দিরে চলিলেন।

পুরীতে বৎসরাধিক (পনর মাস) কাল বাস করেন। পুরীতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, তথাকার মিউনিসিপালিটীর আদেশে শিকারীগণ যেখানে সেখানে গুলি করিয়া বানর বধ করিতেছে।

"একদিন মিউনিসিপালিটির নিযুক্ত এক শিকারী একটা বানরকে গুলি করিয়া মারিয়াছে, উহার মৃতদেহ রক্তাক্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, বানরপল্লী সভয়ে দূর হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সেই মৃতদেহ দেখিতেছে,

ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জটিয়াবাবা এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার পরে বাসায় আসিয়া বানরবধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সমস্ত সংবাদ পত্রে টেলিগ্রাম করিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করিলেন না।"

"এই আন্দোলনের ফলে মিউনিসিপালিটি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত করিলেন যে বানর বধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য কিনা তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ করা হইবে। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত জটিয়াবাবার সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী দেবপ্রসাদ সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বানরবধের বিরুদ্ধে একখানি পাতি লিখিলেন। সেই পাতিতে কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড় এবং নবদ্বীপ, ভাটপাড়া বাকলা ও বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ যোগদান করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে মিউনিসিপালিটির কয়েকজন অনুগত উড়িয়া পণ্ডিতের প্রদত্ত বিরুদ্ধ পাতি উপস্থিত করিয়া তাঁহারা আপনাদের জেদ বজায় রাখিলেন। পুনরায় অধিকতর আগ্রহের সহিত বানরবধ কার্য্য চলিতে লাগিল।"

"ইহার কিছুদিন পরে তখনকার ছোটলাট উডবরণ সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনার্থ পুরীধামে উপস্থিত হইলেন; এবং অযাচিতরূপে বানরবধ বন্ধ করিয়া দিলেন। ছোটলাটের এইকার্য্যে জটিয়াবাবার এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের হৃদয়ের ভাব কিরূপ হইল তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? সমস্ত সজ্জনের মুখে ভক্তের জয় এই ধ্বনি বিঘোষিত হইতে লাগিল।" *

তাঁহার পুরীর আশ্রমে সর্ব্বদা দলে দলে বানর আসিত। তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভাল ভাল কলা ও আম খোসা

* কুম্ভমেলা হইতে সংগ্রহ।

ছাড়াইয়া স্বহস্তে তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। বানরগুলি এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিল যে যখন তখন তাঁহার নিকটে আসিত এবং নির্ভয়ে কাছে বসিয়া থাকিত। যে সমস্ত বানর সর্ব্বদা আসিত তিনি তাহাদিগকে সরলচিত্ত, দাদামহাশয়, নাককাটা, বুড়গোদা, লেজকাটা, বুড়ী, দুঃখিনী, কাণ-কাটা, লালমুখ, কাণি ইত্যাদি নামে ডাকিতেন; ঐ গুলি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কলা, ছোলা, চাউল ইত্যাদি খাইতে পাইত।

কেবল বানরজাতি নয়, সমস্ত প্রাণীতে তাঁহার ভালবাসা ছিল। আশ্রম দ্বারে অনেক সময় এক দল মেষ আসিয়া শব্দ করিত, তিনি তাহাদিগকে চাউল, ছোলা ইত্যাদি খাইতে দেওয়াইতেন; একটা ষাঁড় আসিত, তিনি তাহাকে ছোলা, কন্দ, ঘাস ইত্যাদি দেওয়াইতেন। পুরীর মন্দির-দ্বারে একটি গরু ছিল, যখনই মন্দিরে যাইতেন গরুটীকে ঘাস দেওয়াইতেন; আশ্রমে দলে দলে পাখী আসিত, তাহাদের জন্য শস্যাদি ছড়াইয়া দিতেন; অনেক সময় পিপীলিকা, ইন্দুর, আড়শুলা, চড়ুইপাখী প্রভৃতিকেও আহার দেওয়াইতেন। তাঁহার পার্শ্বস্থ গ্রন্থাধারের (চৌকি) নীচে এই উদ্দেশ্যে বাতাসা রাখিতেন যেন পিপীলিকা খাইতে পায়। সর্ব্বদা এইরূপ জীবসেবায় রত ছিলেন। হরিতে যাঁহার রতি হয় সর্ব্বজীবে তাঁহার এমনই প্রীতি জন্মে।

ঐ সময় পুরী মিউনিসিপালিটী মন্দিরপ্রাচীর সংলগ্ন করিয়া একটী পায়খানা নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। গোঁসাই ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রুপাত করেন; এবং শিশু যেমন কোন অভাব হইলেই কাঁদিয়া গিয়া মার কাছে বলে তিনিও তেমনি জগন্মাতার কাছে বলিলেন। পরে আন্দোলন উঠিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে এই পায়খানা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের সেবা কার্য্যে সেবকদিগের নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম দেখিয়া, তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল

জগন্নাথের রথযাত্রা হিন্দুদিগের একটী বিশেষ উৎসব। এই রথযাত্রা দর্শন করিতে ভারতের নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র নরনারী অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বর্ষে বর্ষে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া থাকে। কিন্তু এমন একটী প্রধান পর্ব্বেও পুরীর সেবকদিগের অশেষ অমনোযোগ ও অবহেলা দৃষ্ট হইয়াছিল। পাণ্ডাদিগের এইরূপ আচরণে গোসাই অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। এমন কি সাময়িক ভাবে রথযাত্রা দেখা বন্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রতিবাদ ও আন্দোলনে বিশৃঙ্খলার প্রতিবিধান হয়।

তিনি পুরীতে সর্ব্বদাই সমুদ্র স্নানে যাইতেন। একবার ঢেউ লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহাতে তিনমাস বাহির হইতে পারেন নাই। সমুদ্র দর্শনে ও সমুদ্র স্নানে এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে যাইতে কষ্ট হইলেও নিরস্ত হইতেন না, লোকের সাহায্যে যাইতেন। ঘটিতে জল তুলিয়া স্নান করিতেন তবু যাওয়া চাই। কষ্ট দেখিয়া এক বন্ধু পালকির কথা বলিলে বলিয়াছিলেন "এস্থানের বালুকণা সুবর্ণ বালুকা, ইহা দ্বারা দেহ পবিত্র হয়। শরীর পাত হইয়া ইহাতে মিশিয়া যাওয়া বরং ভাল, তবু পালকিতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।" সমুদ্রের তীরে এক দল জেলে বাস করিত, তাহাদেরে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, বলিতেন "ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপ্রভুকে সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছিল।" সমুদ্রস্নানে গিয়া সময় সময় ভাবে বিভোর হইয়া সমুদ্রের পাবনী শক্তির বর্ণনা করিতেন। কখন বা বলিতেন "এই সমুদ্রবারি অমৃত, তোমরা ইহা পান কর।" কখন্ কখন্ বলিতেন "আজ মহোদধি আমাকে বড় কৃপা করিয়াছেন, আমার ভিতর বাহিরের ময়লা মুছিয়া দিয়াছেন।" সমুদ্রে সূর্য্যের উদয়অস্ত দেখিলে তাঁহার ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিত।

যে সমস্ত কার্য্যে পুরীতে তাঁহার নাম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে দান একটী প্রধান ব্যাপার। ভগবৎ নির্দ্দেশে তিনি

তথায় মহা দানসত্র খুলিয়াছিলেন। যাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার জীবন পরিচালিত হইত, তাঁহার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে এই দানের আরম্ভ। এজন্য জাতি ও ব্যক্তির বিচার ভুলিয়া দান করেন। যিনি এক সময় বলিয়াছেন "দানেও অবস্থা বিশেষে পাপ সঞ্চয় হয়," আবার তিনিই অন্য সময় বলিয়াছেন, "যদি সাধ্য থাকে তবে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত যে কেহ কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থী হইলে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে।" গোসাইজী নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে সারথী না করিয়া ভগবৎ ইঙ্গিত শুনিয়া চলিয়াছেন ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলেই এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবের উক্তির সামঞ্জস্য সহজে হইতে পারে। তাঁহার অজস্র দানের বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় জগতের দুঃখমোচন, সুখবৃদ্ধি, আনন্দ ও শান্তির বিস্তার কল্পেই তিনি এই দানব্রতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও সাধুতা যেমন লোকের আকর্ষণের বিষয় ছিল, এই দানও তেমনি সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। তাহাতেই জটিয়াবাবার * নাম না জানিত পুরীতে এমন লোক ছিল না।

তিনি পুরীতে আসিয়া শিষ্যদিগকে এই আদেশ করেন যে প্রতিদিন দীন, দুঃখী, কাঙ্গাল, পরদেশী (ভিন্নদেশীয়) দিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে। শিষ্যগণ তদনুসারে আশ্রমে সেবার ব্যবস্থা করেন। একদিন গরীবদিগকে আহ্বান করিয়া খুব বড় এক ভোজ দিলেন। লোকেরা ব্রাহ্মণদিগকেই খাওয়ায় গরীবদিগকে খাওয়ায় না, এজন্য একদিন গরীবদিগকে কানিকাপ্রসাদ সহযোগে পরম পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন ;—"গরীবদিগকে খাওয়াইলে, আমাদিগকে খাওয়াইবে না ?" তৎপর ব্রাহ্মণদিগকেও খুব খাওয়াইলেন। অপর তাঁহার জন্ম দিনেও কানিকাপ্রসাদ সহযোগে দরিদ্রদিগকে খুব

* পুরীতে তিনি জটিয়াবাবা নামে পরিচিত ছিলেন।

খাওয়াইলেন। একজন শিষ্য গোসাইর জন্মদিনে খুব ঘটা করার ইচ্ছা জানাইলে বলিলেন "কাঙ্গালীদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।" অবশেষে তাহাই হইল।

সময় সময় একই লোকে তাঁহার নিকট হইতে দুই তিন বারও দান গ্রহণ করিত, কিন্তু তিনি কখনও বিরক্ত হইতেন না, কেবল ভগবৎ আদেশের অপেক্ষা করিতেন। এক দিন মন্দিরে সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় একজন লোক প্রার্থী হইলে এক টাকা দিতে বলিলেন; এক টাকা দেওয়া হইল। কয়েক সিঁড়ি নামিলে ঐ ব্যক্তি আবার প্রার্থী হইল; তখন দুই টাকা দিতে বলিলেন, দুই টাকা দেওয়া হইল। আরও কয়েক সিঁড়ি নামিলে লোকটী আবারও চাহিল; তখন তাহাকে ১০৲ টাকার একখানা মুগার কাপড় দিতে বলিলেন, এবং তাহাই দেওয়া হইল। ব্যাপার দেখিয়া সঙ্গী ভাবিলেন, "লোকটী কি প্রতারণাই করিতেছে, ইনি হয়ত জানিতেও পারিতেছেন না।" কিন্তু তিনি সেই মুহূর্ত্তেই বলিলেন;—"আমি কি করিব, ঈশ্বর জগন্নাথদেব দান করিতে বলিতেছেন, তাই দিতেছি। এ লোকটী তিনবার দান গ্রহণ করিল তাহা আমি জানি, কিন্তু যাঁর দান তাঁর আদেশে এ দান চলিতেছে।"

তিনি যৌবনের প্রারম্ভে বিষয়-মুক্ত হইয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ-সংস্থান তখন তাঁহার ছিল না। কেবল শরীর মন দ্বারাই পরহিত সাধন করিতেন। লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দীন দুঃখীর সহায়তা করিতেন, সেবা শুশ্রূষা করিয়া, হিত চিন্তা ও মঙ্গল কামনা করিয়া পরহিত সাধন করিতেন। এখন অর্থাভাব মোচন হইয়াছে। কারণ "যে সাধক অনন্যমনে ভগবানের শরণাপন্ন হন ভগবান তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন, তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন।" ভগবৎ ইচ্ছায় এখন শত শত নরনারী তাঁহার সেবার সহায় হইয়াছেন।

এক দিন পুলিস কয়েকজন সাধুকে তাঁহার আশ্রমে আনিয়া উপনীত করিলে জানিলেন, বিনা টিকিটে ট্রেণে ভ্রমণ করায় তাঁহাদিগকে পুলিসের হাতে পড়িতে হইয়াছে। টিকিটের মূল্য না দিলে সাধুদিগকে হাজতে যাইতে হইবে শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের মুক্তির জন্য পনর টাকা দিলেন।

অনেক সময় ঘটী, কম্বল, লুই, বস্ত্র, এবং মূল্যবান রেশমী কাপড় দান করিতেন। মূল্যবান দ্রব্য পাইয়া প্রার্থীর মনে আশাতীত আনন্দ জন্মিত; বলিত, "ইনিই প্রকৃত দাতাকর্ণ।"

মন্দিরে এক দিন একটী বালক তাঁহার নিকট কাপড় চাহিয়াছিল। তিনি ঐ বালকের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিয়া আত্মহারা হইলেন; এবং আশ্রমে আনিয়া ভাল করিয়া দান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বাসায় আসিবার সময় ভিড়ের মধ্যে বালকটী কোথায় চলিয়া গেল। অবশেষে বহু অনুসন্ধানে তাহাকে উপস্থিত করাইয়া ধুতি চাদর দিলেন।

পুরীতে অফিস, আদালত ইত্যাদিতে যে সমস্ত পুলিস, পেয়াদা, পিয়ন ও দপ্তরী ছিল তাহাদিগকে একত্র করিয়া বস্ত্রাদি দান করিলেন। এইরূপে এক এক দিন শত শত টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। মন্দিরের পাণ্ডা, পুরোহিত এবং অন্যান্য সেবায়তদিগের অনেককে রেশমী ও মুগার বস্ত্র দান করিলেন। যাহার যে অভাব, যে আকাঙ্ক্ষা যেন সে সমস্ত পূর্ণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা।

কাহাকেও উপনয়নের জন্য পাঁচ টাকা, কাহাকেও পাথেও বাবদ পঁচিশ টাকা, কাহাকেও বা অন্য নানা কারণে ৫, ১০, ১৫, ২০ টাকা সর্ব্বদা দান করিতেছিলেন। দান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে বলিতেন, "এ দান আমার কৃত নয়, ঈশ্বর জগন্নাথদেবের আদেশে দান করিতেছি, আমার এক পয়সাও দিতে শক্তি নাই।" দানে মুগ্ধ হইয়া লোকে বলিত, "বড়

নাম, চপ্‌চপালে" অর্থাৎ খুব নাম প্রচার করিলে। তিনি বলিতেন, "নাম অতল তলে ডুবিয়া থাক, নাম দিয়া কি হইবে?"

এক দিন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (ইনি অনেক সময় আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন) এক ব্যক্তিকে অনুরোধ পত্র দিয়া দান গ্রহণের জন্য গোসাইর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তিকে তিনি কিছুই দিলেন না। বলিলেন এ দান উপরোধের ব্যাপার নয়।

একদিন সম্বলপুরের একদল কৃষক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া "রাম বিনু অযোধ্যা আন্ধিয়ারা" পদযুক্ত একটী গান করিয়াছিল। এই গান শুনিয়া তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। সমাধি ভঙ্গে স্ত্রীলোকটীকে মূল্যবান একখানি মুগার বস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

যে দিবস সমুদ্রস্নানে ও মন্দির দর্শনে যাইতেন দানে শত শত টাকা ব্যয় হইত। যে দিন দানের জন্য কিছুই ব্যয় করা সম্ভব হইত না, বলিতেন "আজকার দিন বন্ধ্যা।" একদিন গৃহে কিছুই ছিল না, অনুসন্ধান করিয়া অপরের নিকটও কিছুই পাওয়া গেল না, বলিলেন "আমার ঘটিটি লইয়া চল, উহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায় দান করিব।" পরে ঘটিটি বিক্রয় করিয়া একটাকা পাওয়া গেল, এবং দান করিলেন। একদিন একজন কাপড় চাহিয়াছিল, দিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন দুইজন শিষ্য তাঁহাদের আপন আপন বস্ত্র ছাড়িয়া দিলেন। গোসাই উহা প্রার্থীকে দান করিয়া বলিলেন "আজ তোমাদের বস্ত্রহরণ হইল। আমি তোমাদের সকলকে তেনাচুর না করিয়া ছাড়িব না।"

মন্দিরে ও সমুদ্রস্নানে গিয়া সময় সময় ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। একদিন বলিলেন;—"মন্দিরে গিয়া দেখিলাম আকাশ পাতাল জ্যোতির্ম্ময়, সমস্ত পুরী ব্যাপিয়া লোকনাথ বিরাজ করিতেছেন।"

আবার কোন সময় এরূপও বলিয়াছেন যে ;—"জগন্নাথ কোথায়? ওখানে কেবল চামচিকা রাশি উড়িতেছে। পাণ্ডাদের জন্য ঈশ্বর জগন্নাথদেব এখানে তিষ্ঠিতে পারেন না, তিনি ভক্তের গৃহে আছেন।"

একদিন বলিতেছিলেন "জগন্নাথের কি কৃপা তিনি বলিলেন আমিই ত আসিয়া দেখা দেই। তোর যাওয়ার দরকার কি? সকালে পূজার পর প্রায়ই তিনি আসেন। কখনও আচারীদের ন্যায় তিলক পরিয়া, কখনও ছেলে পিলের মত, কখনও অন্যরূপে। কাল পাঠের সময় আসিলে আমি এমনই ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম যে পাঠ শুনিতে পারিলাম না।"

মন্দিরে, সমুদ্রস্নানে, আশ্রমে, পথে গোঁসাইজীর অজস্র দান নিত্য চলিতেছিল। সাধু, ব্রাহ্মণ, ভিখারী, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, সাধারণ গৃহস্থ, বিপন্ন পথিক সকল প্রকার প্রার্থী প্রার্থনানুসারে বস্ত্র. লোটা. কমণ্ডলু, কম্বল পাথেয় ইত্যাদি পাইতেছিল। পুরীর সাধারণ লোক, আফিস আদালতের পিয়ন, পেয়াদা, দপ্তরী, পুলিস আদি কেহই তাঁহার এই দান হইতে বঞ্চিত হইল না। কেবল একবার নয় অনেকে বার বার তাঁহার দান গ্রহণ করিল। বিশেষ কথা এই অনেকে দশ বিশ টাকা করিয়া পাইয়াছে, অনেকে দামী দামী মটকার কি মুগার কাপড় পাইয়াছে। সাধু, সন্ন্যাসী, ভিখারী এবং সাধারণ লোকে, যাহারা জন্মেও ঐ রূপ সুন্দর কাপড় চক্ষে দেখে নাই তাহারা তাহা পাইয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে গোঁসাই তাহার মধ্যে আনন্দ ময়েরই প্রকাশ দেখিয়াছেন।

এইরূপে প্রতিদিন অজস্র দান চলিতেছিল। নানা স্থান হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহা দিতেন তাহা ব্যয় হইয়া যাইত। একদিন তিনি বলিলেন "জগন্নাথদেবের আদেশ—সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কাঙ্গাল, গরীব যে কেহ আসিবে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে ও দক্ষিণা দিতে এবং প্রয়োজনানুরূপ ঘটি, কম্বল, বস্ত্র, বিতরণ করিতে হইবে।

আপনারা চেষ্টা করিয়া দেখুন যদি দোকানীগণ আমাকে ধারে জিনিষাদি দেন তবে জগন্নাথদেবের আদেশে আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারি।"

"দীনবন্ধু নামে এক কাপুড়িয়া আছেন, তাঁহার দোকান খুব বড় ছিল না। তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া জটিয়াবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এই কার্য্যে যত বস্ত্র লাগিবে তাহা দীনবন্ধু সরবরাহ করিতে সাহস করেন কি না?" দীনবন্ধু যেন দীনবন্ধু দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ অসীম সাহসিক কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহার ভ্রাতা যোগ দিতে অস্বীকৃত হইয়া দোকান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দীনবন্ধুকে জটিয়াবাবা বলিলেন, "দেখ আমি কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসী, আমার কাছে পাওয়ার প্রত্যাশা কিছুই নাই। স্বয়ং জগন্নাথদেব দান করিতেছেন ইহা বিশ্বাস করিয়া যদি তুমি দিতে পার দিবে।" দীনবন্ধু বলিলেন "আপনার আজ্ঞা হইলেই আমি দিতে পারিব।" এইরূপ ঘটিওয়ালা, কম্বলওয়ালা, এবং মুদী প্রভৃতি যে যে দোকানদারকে ডাকিয়া জটিয়াবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন সকলেই আনন্দের সহিত জিনিষ পত্র দিতে রাজি হইল। *

পরে ২০শে চৈত্র পুরীর বড় আখড়ার বিস্তৃত ময়দানে, গৃহের ছাদে, নীচে আহারের স্থান করা হইল; ভাড়ে ভাড়ে মহাপ্রসাদ, তরকারী, মালপোয়া, দৈ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া স্তূপাকার হইল। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি বিভিন্ন দ্রব্যের রক্ষণভার দেওয়া হইল এবং অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় এই মহা সেবা শেষ হইল; এবং যে প্রচুর সামগ্রী উদ্বৃত্ত রহিল, তাহা দানে ব্যয় করিতে একজন মহান্তের উপর ভার দেওয়া হইল। যে কয়েক দিন ধরিয়া এই মহোৎসব চলিয়াছিল সে কয়েকদিন পুরীধামে এমন দুঃখী, কাঙ্গাল, সাধু, সন্ন্যাসী

* কুম্ভমেলা ১১২ পৃষ্ঠা।

কেহই ছিলেন না যিনি এই দানে বা সেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন। ক্রমে কাপুড়িয়ার কাপড়, ঘটিওয়ালার ঘটি ও কম্বলওয়ালার কম্বল ফুরাইয়া গেল, তাহারা ধার করিয়া নূতন আমদানি করিতে লাগিল।" *

শুনিয়াছি এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় উনিশ হাজার টাকা এবং পুরীতে বৎসরাধিক কালে তাঁহার আশ্রম হইতে বিবিধপ্রকার দানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। যে আশ্রমের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় ছিল না, সেই আশ্রম হইতে এত টাকা দানে ব্যয়িত হওয়া অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নাই।

তখন "পুরীর সুপ্রসিদ্ধ মহান্ত জগন্নাথদাস বাবাজী সাধুদের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। উহার ছাদের কার্য্য বাকি ছিল। তজ্জন্য তিনি জটিয়াবাবার নিকট সাত শত টাকা চাহিলেন। যখন হাজার হাজার টাকা অকাতরে বিতরণ করা হইতেছে তখন একজন প্রসিদ্ধ মহান্তের প্রার্থনা যে পূর্ণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ ছিল না। কিন্তু জটিয়াবাবা করযোড়ে মহান্তকে বলিলেন "আমি কিছুই নই, জগন্নাথ-দেবের হুকুম হইলেই দিতে পারি।" সে হুকুম হইল না। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া কোনও কার্য্য করেন নাই।" †

দানের জন্য দোকানে তাঁহার বহুসহস্র টাকা ঋণ হইয়াছিল, কেহ কেহ এ জন্য আশঙ্কাযুক্তও হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিতেন ;— "কোথা হইতে এই টাকা আসিবে তজ্জন্য তোমরা বিন্দুমাত্র সংশয়যুক্ত বা ভীত হইও না। নিশ্চয় জানিও যিনি এ কার্য্য করিতে হুকুম করিয়াছেন তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন।" তাঁহার কোন সংস্থান নাই, ইহা সকলেই জানিত, তবু দোকানীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল জটিয়া-বাবার টাকা কথনো অনাদায় থাকিবে না। এজন্য সহস্র সহস্র টাকা

* কুম্ভমেলা ১১৩ পৃঃ। † কুম্ভমেলা ১১৪ পৃঃ।

ঋণ থাকিতে আবার সহস্র সহস্র টাকার জিনিষ বাকী দিয়াছিল। বিষয়ী লোকের অর্থ শোণিত তুল্য। সেই অর্থ একজন সাধুর কার্য্যে ঢালিয়া দিতে কতটা বিশ্বাস আবশ্যক, এবং কিরূপ মানুষের প্রতি বিষয়ী লোকে এতটা বিশ্বাস রাখিতে পারে তাহা বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয় গোসাই একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। ঋণশোধের জন্য একজন শিষ্যকে চিন্তিত হইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ;—"ভগবান অর্থ দিবেন কি না তিনিই জানেন, তজ্জন্য আমাদের এত ভাবনার দরকার কি ? এ তাঁহারই ঋণ। তিনিই যাহা হয় করিবেন। সকলকে জানাইবার হুকুম হইয়াছে জানাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" এক ঋণ শোধ না হইতে দানের জন্য আরও ঋণ হইতেছে দেখিয়া একজন শিষ্য অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলে বলিয়াছিলেন ;—"ভয় নাই, সব টাকা শোধ হইয়া যাইবে, চুপ করিয়া বসিয়া দর্শন কর। ঈশ্বর জগন্নাথদেবের দান, এ দান কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আমরাত আর এখান হইতে যাইতেছি না, একটী পয়সা ঋণ থাকিতেও নড়িব না।" এই বলিয়া ভক্তমালের ভক্তের জন্য ভগবানের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত গল্পটী বলিলেন।

জগতের মহাপুরুষদের জীবনে ইহা এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত যে অর্থের কোন সংস্থান না থাকিলেও অর্থাভাবে তাঁহাদের কোন কার্য্য বন্ধ হয় নাই। 'ভগবান ভক্তের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন' গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে, ইহাই সার্থক হইয়াছে। "সংসারাসক্ত মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করে, তথাপি পরিবারের ভরণপোষণে সমর্থ হয় না এবং অর্থের অভাবও কিছুতেই যায় না। আর এই সাধু বিশ্বেশ্বরের চরণে দেহমন অর্পণ করিয়া কেবল তাঁহারই পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত আছেন। অর্থ সঞ্চয়ে মন নাই, অথচ ইঁহার ভাণ্ডার অযাচিতদানে পরিপূর্ণ। তবে যেমন আয় তেমনই ব্যয়, স্থিতির ঘর শূন্য। এস্থলে দাতা যিনি, ভাণ্ডারী

ও ব্যয়কর্ত্তাও তিনিই। ভক্ত কেবল লীলা দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন।

যিনি এইরূপ অজস্র দান করিতেছিলেন তাঁহার কিন্তু তিনখানি বস্ত্র-খণ্ড * ব্যতীত কিছুই ছিল না। প্রকৃত কথা দান উপলক্ষ্য, লক্ষ্য মহান দাতাকে দেখা। তীব্রবৈরাগ্য, উজ্জ্বল বিবেক, চিত্তের দীনতা, হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্রতা লইয়া সকল কার্য্যের অভ্যন্তর দিয়া তিনি সেই মহান দাতাকে দেখিতে এবং তাঁহার হাতের দান গ্রহণ করিতেছিলেন।

তাঁহার শেষ জীবনের ঘটনাবলী দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে—আহারে, বিহারে, শয়নে, বিশ্রামে, দানে কি অন্য যে কোন কার্য্যে ঈশ্বরের আদেশ না শুনিয়া তিনি কিছু করিতেন না। পুরীতে অনেক সময় আহার করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন, যেন কাহারও কথা শুনিতেছেন; পথ চলিতে চলিতে এমন ব্যবহার করিতেন যাহাতে মনে হইত কে যেন তাঁহাকে লইয়া চলিয়াছেন; পথের কাঁকরে চলিতে কষ্ট হইত, যেন কাহাকে বলিলেন তিনি তাঁহার ক্লেশমোচন করিলেন, পথের কাঁকর সরাইয়া দিলেন। আহার করিতে করিতে কত মধুরতা অনুভব করিতেন, বলিতেন;—"মা আজ স্পর্শ করিয়া দিয়াছেন এজন্য খাদ্য এত মধুর হইয়াছে।" এইরূপে তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ঈশ্বরাবির্ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল।

পুরীর আশ্রমে একদিন কোন বিষয় লইয়া দুইজন শিষ্যের মধ্যে খুব বাদানুবাদ হইতেছিল। একজন বলিতেছেন;—"গোঁসাইজী এইরূপ বলিয়াছেন, খাতায় লিপিবদ্ধ আছে।" অপরে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, "ইহা কখনও হইতে পারে না, তিনি কখনও এরূপ বলেন

* শুনিয়াছি এই সময় তাঁহার ব্যবহারের জন্য তিনখানি বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

নাই।” গোঁসাই শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কথার অর্থ না বুঝিয়া বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি দুঃখের সহিত বলিলেন;—“আমার ভাব গ্রহণ করে তোমাদের মধ্যে এরূপ কাহার অধিকার হইয়াছে? তোমরা কি জন্য আমার উক্তি না বুঝিয়া এইরূপে সংগ্রহ করিতেছ? উহা পোড়াইয়া ফেল। তোমরা যাহা সংগ্রহ করিতেছ তাহাতে বিষ উদ্গীরণ করিবে। আমরা তিল তিল করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছি আর তোমরা তাহা কীট হইয়া নষ্ট করিতেছ।” *

পুরীতে তাঁহার ভক্তি, বিশ্বাস, সাধুতা ও দানে আপামর সাধারণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। ভারতের নানাস্থান হইতে পুরীতে যে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইত জটিয়াবাবার দর্শন ব্যতীত তাহাদের তীর্থদর্শন যেন সার্থক হইত না। কিন্তু এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি দর্শনে কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয় বিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি এজন্য একব্যক্তি মহাপ্রসাদ সংযোগে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়াছিল। তীব্রবিষে অবশেষে তাঁহার শরীর একেবারে অশক্ত হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মসাধনের কঠোর পরিশ্রমে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর নিতান্ত ভগ্ন ছিল। পুরীতে আসিয়া এই অবস্থার আরও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ভগ্ন শরীরেও তাঁহার নিয়মিত কার্য্যের বিরাম ছিল না; চব্বিশঘণ্টা ঘড়ী ধরিয়া সমস্ত কার্য্য করিতেন। মল, মূত্র ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যয়ন, কীর্ত্তন, পাঠশ্রবণ, আলাপ, প্রসঙ্গ, ঔষধসেবন, খাদ্যগ্রহণ, আত্মীয়স্বজনের তত্ত্ব লওয়া, স্তব, আরাধনা, সাধন, জীবসেবা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য নিয়মিত করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থপাঠেরও ভিন্ন ভিন্ন সময় ছিল; বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণেরও সময় বাঁধা ছিল। এমন কি সংবাদপত্রাদির খবরও

* কোন অনুরাগী উদাসীন শিষ্য কথিত।

রাখিতেন এবং সময় সময় পড়াইয়া শুনিতেন। সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতি এরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলে প্রায় উত্থান-শক্তি-রহিত হইলেন। তখন উঠিতে ও দুই চারি পদ চলিতে একজনের সহায়তার আবশ্যক হইত। এই অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মনে আশঙ্কা জন্মিল। একজন শিষ্য কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব করিলেন। গোসাঁই উত্তর করিলেন ;—"এখানে আমার যে উদ্দেশ্যে আসা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, এখানে আমার আর কোন কর্ম্ম করিবার নাই ; এখন আদেশ হইলেই যাইতে পারি। কিন্তু এক কপর্দ্দক ঋণ থাকা পর্য্যন্ত আমি এখানেই আছি।"

১৭ই জ্যৈষ্ঠ চা পানের পর শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত ; সকলেরই মনে চিন্তা ও উদ্বেগ। যোগজীবনবাবু বলিলেন ;—"কিছু ঋণ করিয়া এখানকার ধার শীঘ্র শোধ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলে হয় না ?" তিনি বলিলেন ;—"তোরা এত ভাবিস কেন ? স্বয়ং ঈশ্বর জগন্নাথদেব আমার সংবাদ লইতেছেন, আমার ভয় কি ; অন্য স্থানে গেলেই কি ত্রাণ পাব ? একটী কাঁটা ফুটিলেও মৃত্যু হইতে পারে ? আর এস্থানে ধরিয়া আছাড়িলেও তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হইবার যো নাই। অন্যদিকে তোরা তাকাস্ কেন ? ইচ্ছা হইলে তোরা চলিয়া যা। আমি কেবল মাত্র লাঠিগাছা অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিব। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কদাপি কিছু করিব না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ঠিক হইয়া যায়। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আর কাহারও উপর নির্ভর করিস্ না।"

দানে তাঁহার যে সহস্র সহস্র টাকা দোকানে ঋণ হইয়াছিল ক্রমে তাহা প্রায় শোধ হইয়া যায়। এই সময় প্রতিদিন নানাস্থান হইতে তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ অকাতরে অর্থ প্রেরণ করিতেন। তাঁহার অনুমতি অনুসারে তাঁহার দানের বিষয় শিষ্যগণের গোচর করা হইলে তাঁহারা

যথাসাধ্য অর্থ প্রেরণ করেন। "তখন কৃপণ দাতা হইলেন, অলঙ্কার-প্রাণা অলঙ্কার পাঠাইলেন, কেহবা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, কেহ বা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া অর্থ পাঠাইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন।"* শুনিয়াছি, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসের মধ্যে তাঁহার নামে বিশ হাজার টাকার অধিক আসিয়াছিল। অতি অল্প ঋণ অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ২১শে জ্যৈষ্ঠ শোধ হইয়া গেল।

ঋণশোধ হইলে ঐ দিবসই তাঁহার কলিকাতা যাত্রার আয়োজন হইল এবং পর দিবস রওয়ানা হইবেন নির্দ্ধারণ করিয়া হোরমিলার কোম্পানিকে তারে ষ্টীমার ভাড়ার বাবদ ষোলশত টাকা পাঠান হইল। এইরূপে যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা হইল, কিন্তু বিদেহী আত্মা যে চিরন্তন আত্মীয় পরমাত্মার মহা আহ্বানে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন তাহা সকলেরই অবিদিত রহিল। ঋণশোধ হইলেই যাত্রা করা হইবে ইহাই স্থির ছিল, কিন্তু ইহা যে অনন্ত পরলোকে মহাপ্রস্থান তাহা কে জানিত? যিনি সংসারের কত ক্লেশ, নিষ্পেষণ, অভাব ও দুঃখের মধ্য দিয়া, প্রলোভন, উত্থান, পতন, সংগ্রাম ইত্যাদি বিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে আনন্দপূর্ণ, তাপহীন, শুদ্ধজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ইহলোকের কর্ম্মের যে অবসান হইয়াছে ইহা কাহারও মনে আসে-নাই। সংসারের শত শত নরনারী উত্তপ্ত প্রাণ লইয়া গিয়া যাঁহার শীতল স্পর্শে জুড়াইত, যাঁহার হৃদয়স্পর্শী উপদেশে কত আরাম ও আনন্দ লাভ করিত, তাহাদের সে আরামের স্থান যে পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইতেছে সে চিন্তা কাহারও মনকে অধীর করে নাই।

অনুগত, সহচর, শিষ্যগণ নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রার সকল আয়োজন করিলেন। কিন্তু পরের দিন প্রাতঃকালেই তাঁহার শরীর অত্যন্ত

* কুম্ভমেল।

অবসন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপ অবসাদ লইয়াও তিনি পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় স্থানীয় একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে (ইনি অনেক সময় তাঁহার নিকট আসিতেন) অৰ্দ্ধ ঘণ্টাকাল নানাবিধ ধৰ্ম্মপ্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন;—"কোন সাধুকে বিশেষ না জানিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করিবেন না; সাধুর বেশে অনেক অসাধুও থাকে; চিনিতে না পারিয়া অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়।" আলাপাদির অল্পক্ষণ পরেই পায়খানা হইতে আসিয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন; এবং সমস্ত দিন সেই ভাবেই কাটিল। তাঁহার দারুণ হৃদরোগ ছিল। উহার আশু প্রতিকার জন্য তাঁহার নিকট সর্ব্বদা একটি ঔষধ থাকিত। তাঁহার অত্যন্ত অবসাদ দেখিয়া উহা প্রয়োগের চেষ্টা হইল, কিন্তু অল্পই গলাধঃকরণ হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত এবং রজনীর ঘন অন্ধকারে চতুৰ্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। প্রায় আট ঘটিকার পরে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইলে চক্ষুরুন্মীলন ও একটু চা পান করিলেন। চা পান করিতে করিতে উৰ্দ্ধদৃষ্টি করিয়া প্রণাম করিলেন এবং মুহূর্ত্তে দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মহাপ্রস্থান করিলেন। ১৩০৬ সনে ২০শে জ্যৈষ্ঠ সায়াহ্ন ৯ ঘটিকা ২০ মিনিটে, কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে, আটান্ন বৎসর বয়সে (সাতান্ন বৎসর এগার মাস) হিন্দু জাতির মহাতীর্থে; সাধু, সন্ন্যাসী, উদাসীন, গৃহী, মুমুক্ষু, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন সকল সম্প্রদায়ের মহা সম্মিলনক্ষেত্রে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ধরাধাম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, পুণ্যক্ষেত্রেই তিরোধান হইল। হরিনাম শুনিতে শুনিতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হরিনাম শুনিতে শুনিতেই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই মহাপ্রস্থানে শত শত নরনারীর প্রাণে কি দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা কিরূপে বুঝাইব? তাঁহার মহাপ্রেমিক, মহাভক্ত,

মহাবিশ্বাসী আত্মার পার্থিব সংসর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্যাকুলাত্মা কি গভীর মর্ম্মবেদনা, কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা কোন্ ভাষায় ব্যক্ত করিব? তাহার ভাষা নাই।

মহাযোগী শাক্যমুনির অভাবে তাঁহার অনুগতগণ কেশ বিকীরণ করিয়া ও বাহু বিতাড়ণ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের অভাবে তাঁহার শিষ্যগণেরও ঈদৃশী অবস্থা হইয়াছিল। আর আজ ইঁহার অভাবে শত শত লোকের ক্রন্দনে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। পিতা, মাতা, বন্ধু, সুহৃদ, আত্মীয়ের অভাবে মানুষ যেরূপ শোকাচ্ছন্ন হয়, বিলাপ করে, শত শত নরনারী, সহস্র সহস্র শিষ্য, অনুরক্তজন ততোধিক শোকে আচ্ছন্ন হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বঙ্গভূমি এক পরম দয়ালু, উদার, প্রেমিক, ভক্ত সন্তানকে হারাইয়া মলিন বেশ ধারণ করিল।

দৃশ্য ইহলোকে যাঁহার অভাবে শোকের মর্ম্মান্তিক বেদনা বাজিয়া উঠিল, অদৃশ্য অমরলোকে তাঁহার শুদ্ধাত্মার সমাগমে না জানি কি আনন্দের কোলাহল আরম্ভ হইল। পুণ্যশীল দেবগণ "এহি এহীতি" শব্দে প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে না জানি তাঁহার কতই সম্বর্দ্ধনা করিলেন, এবং প্রবীণাত্মা দেবগণ, পূর্ব্বগামী সুহৃদ, বন্ধু, গুরুজন স্নেহভরে প্রেমপূর্ণ অন্তরে তাঁহার নিকট মহান ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তির কতই না কীর্ত্তন করিলেন।

পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইল, প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন, এজন্য আত্মীয় ও শিষ্যগণ তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে উদ্যোগী হইলেন। পুত্র যোগজীবনবাবু দেহমুক্ত পিতার এই আদেশ অন্তরে অনুভব করিলেন যে "আমার বন্ধু নগেন্দ্রবাবু, শিবনাথবাবু ও উমেশবাবুকে সংবাদ দাও।" তদনুসারে তাঁহাদিগকে টেলিগ্রাম করা

হইল। পুরীর নরেন্দ্রসরোবরের উত্তর তীরস্থ বারবিঘা জমি চৌদ্দশত টাকায় ক্রয় করিয়া শিষ্যগণ তথায় তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিলেন। ইহার পরে যথাসময়ে সমাধিস্থানে নানাবিধ ফলের বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, এবং অমরাত্মার চিরপ্রিয় পরমেশ্বরের নিত্য অর্চ্চনা, বন্দনা ও গুণানুবাদের বিধান হইয়া সেই পরলোকগত শুদ্ধাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণের উপায় হইয়াছে; এবং অদ্যাবধি প্রতি বৎসর তাঁহার স্মৃতি-উৎসব সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ।

গোস্বামী মহাশয় কোন সময়ে শান্তিপুর মিউনিসিপালিটির কমিশনর ছিলেন। কর্ম্মচারীগণকে একদিন তাঁহার বাড়ীর নিকট বিশেষভাবে পরিষ্কার করাইতে দেখিয়া থামাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন অপর সাধারণের অপেক্ষা তাঁহার বিশেষ কোন দাবী নাই। এই প্রকার স্বার্থহীনতার দৃষ্টান্ত আজীবন প্রদর্শন করিয়াছেন।

কোন সময়ে শান্তিপুরের মহিলারা এমন সূক্ষ্মবস্ত্র পরিত যে উহাতে লজ্জা নিবারণ হয় না। তিনি এক সভা করিয়া এই কুপ্রথা রহিত করিতে বদ্ধপরিকর হন। তাহাতে অনেকে বিরক্ত হয়। একদিন কতকগুলি দুষ্টা স্ত্রীলোক প্রত্যূষে গঙ্গায় স্নান করিবার পথে,তাঁহাকে মনে করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে (ইনি দেখিতে তাঁহার ন্যায় স্থূল ছিলেন) প্রহার করে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে ছিলেন—"আমি বিজয় গোঁসাই নই, আমি বিজয় গোঁসাই নই।" গোঁস্বামী মহাশয়ের চেষ্টায় এই দুষ্টাদের অর্থদণ্ড ও মহিলাদের জন্য পাবনা হইতে মোটা কাপড় আনাইবার ব্যবস্থা হয়। অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গিয়া সময় সময় এইরূপ বিপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু তবু নিরস্ত হইতেন না।

গোস্বামী মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে যখন কলিকাতা অবস্থান করিতেন তখন একদিন প্রয়োজন হওয়ায় গৃহের ব্যবহারের জন্য ঘুঁটের ঝুড়ি মাথায় বহিয়া সদর রাস্তা দিয়া গিয়াছিলেন। অথচ পায়ে জুতা, মোজা এবং গায়ে শাল ছিল। কর্ত্তব্য কার্য্যে লোকলজ্জা বা অপমান জ্ঞান কোন দিনই ছিল না।

ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের স্বাধীনতা লইয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত

হইলে গোস্বামী মহাশয় তাহাতে যোগ দেন। পত্নীকে বুট গাউন পরাইয়া প্রকাশ্য পথে ও সভায় যাইতে আরম্ভ করেন। "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা অবশ্য করিব তাহা" ইহাই তাঁহার আদর্শ ছিল।

একদিন কলিকাতার পথে যাইতে দেখিলেন একটী বারাঙ্গনা একখানি মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া শুষ্কমুখে পথের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল ইহার আহার হয় নাই; মনে বড় ব্যথা পাইলেন। তখন ভিক্ষা করিয়া একখানা বস্ত্র ও কিছু টাকা লইয়া ঐ দুঃখিনী বারাঙ্গনাকে দিয়া আসিলেন। বলিলেন—"ঈশ্বর এই কাপড় ও টাকা তোমার জন্য পাঠাইয়াছেন।" সমাজপরিত্যক্তা, নিন্দনীয়কার্য্যে আসক্তা কুলটার বেদনায় তাঁহার হৃদয় এমনই ব্যথিত ছিল।

বরিশালের জমিদার রাখালবাবুর একজন পাচক কর্ম্মচ্যুত হইয়া একবার কলিকাতা আসে, এবং সপরিবারে অনাহারে যারপরনাই ক্লেশে পতিত হয়। গোস্বামী মহাশয় ইহাদের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন, এবং শিয়ালদহ তাহাদের বাসায় গিয়া দিয়া আসিতেন।

একবার কৃষ্ণনগরে গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণপণ সেবা শুশ্রূষায় তথাকার একজন কলেরারোগী আসন্ন অবস্থা হইতে জীবন লাভ করিয়াছিল।

বাগআঁচড়ার একটি দরিদ্র বালক কলিকাতা আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি নিজের গাত্রবস্ত্র দিয়া তাহাকে দুঃসহ শীত হইতে রক্ষা এবং নিজে সমস্ত রজনী শীত ভোগ করিয়াছিলেন। এই বালকের তিনি বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন।

একবার কাকিনায় একটি দরিদ্র বালককে শীতে কাতর দেখিয়া তাঁহার দেহে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল, অথচ তাঁহার গায়ে ফ্লানেলের জামা ছিল। বালকটি তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি গায়ের জামা তাহাকে দান করেন। বালকটি প্রথমে উহা লইতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু অবশেষে সাহস পাইয়া

লইয়াছিল। ইহাতে গোস্বামী মহাশয় যেন একটু সুস্থ হইয়াছেন এরূপ বোধ হইয়াছিল। এই বালকের অভিপ্রায় অনুসারে গোস্বামীমহাশয় রাজা মহিমারঞ্জনকে বলিয়া বালকের পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

একবার প্রচারার্থে বড়বেলুন গিয়াছিলেন; শ্রীযুক্ত কেদার পণ্ডিত মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া গোঁসাইজী ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়াছেন। কিন্তু গ্রামের পথ ও মাঠ হাঁটিয়া ষ্টেসনে আসিতে পথে যারপরনাই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, ষ্টেসন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন ঈশ্বরমুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন;— "পণ্ডিত মহাশয় আর চলিতে পারি না, মা যদি এই গ্রামের সম্মুখে একখানা গাড়ী উপস্থিত না করেন তাহা হইলে আর ষ্টেসনে যাওয়া হইবে না।" এই কথা বলিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই গ্রামের সম্মুখে একখানি গাড়ী দেখিতে পাইলেন। পরে গাড়ীতে ষ্টেসনে যাইতে ও পথে কয়েকজন দুঃখী লোককে কিছু কিছু দান করায় তাঁহার পয়সা সমস্ত ফুরাইয়া গেল, ট্রেণ ভাড়ার জন্য কিছুই রহিল না। টিকিট ক্রয়ের কি উপায় হইবে ভাবিতে লাগিলেন। তৎপর বলিলেন;—"পণ্ডিত মহাশয় মা আমাদের পাথেয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমার কাপড়ে পাঁচটী টাকা বাঁধিয়া দিয়াছেন।" এই বলিয়া কাছার কাপড় হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিলেন, এবং বলিলেন;—"কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কালীশঙ্কর আগ্রহ করিয়া পাঁচটী টাকা কাছায় বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন;—"সময়ে ইহা কাজে লাগিবে।" কিন্তু আমি ঐ টাকার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন হঠাৎ মনে পড়িল।"

কলিকাতায় আসিয়া কনিষ্ঠা কন্যাকে পীড়িতা দেখিয়া বলিলেন;— "পণ্ডিত মহাশয় মা'ই আমাকে তাড়াতাড়ি আনিয়াছেন। নতুবা এত তাড়াতাড়ি আসা হইত না।" *

---

* ৺আভরণচন্দ্র রায় কথিত।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক সময়ে কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা করিতেন। ঐস্থানে তিনি উপবীত ফেলিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবুর প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। গোস্বামী মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসমাজে যোগদেওয়ার কথা শুনিয়া ছয় সাত ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়া বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সে মিলনে উভয়ের মনে যে প্রগাঢ় ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা প্রেমালিঙ্গনে ও সমস্তরাত্রি অনিদ্রায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে সূচিত হইয়াছিল। মতভেদেও এই বন্ধুতায় ভিন্নভাব জন্মে নাই।

গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম সহাধ্যায়ী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিজয়ের হৃদয় দয়ার সাগর ছিল। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বোধ হইত যেন তিনি জগতের দুঃখভার মোচন করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিজয়ের ভালবাসার যদিও তত বিকাশ ছিল না, তথাপি উহা অতি গভীর ছিল। বিপদে না পড়িলে বিজয়ের ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করা যাইত না। বন্ধুজনের বিপদে ইহা শতগুণ স্ফূরিত হইত। যখন বন্ধুজনের বিপদ ভঞ্জনের জন্য তিনি বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন, কোন বাধা বিপত্তি তখন তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিত না। বিজয়ের হৃদয় শোধিত সুবর্ণ; ইহাতে অঙ্কপাত সহজে হইত না বটে, কিন্তু ইহা খোদিত করিলে ইহাতে স্থায়ী অঙ্কপাত হইত।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে থাকা কালে একদিন প্রচারক নিবাসের দ্বিতলস্থ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। কথায় কথায় বলিলেন;—"ধর্ম্মের জন্য না করিতে পারি এমন কাজ নাই। যদি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে এই দ্বিতল হইতে লম্ফ দিলে ধর্ম্ম লাভ হইবে তবে নিশ্চয় বলিতেছি এই মুহূর্ত্তে লম্ফ দিয়া পড়িতে পারি।" কথাগুলি

এমন ভাবে বলিলেন যে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মুখশ্রী দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। * তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার এই উক্তির সমর্থন করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের পরবর্ত্তী জীবনে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তবুও তিনি বলিয়াছেন ;—"ঐরূপ সরল অন্তরে সমুদয় হৃদয়মনপ্রাণের সহিত কাহারও ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছি কি না মনে হয় না। এমন ভক্তি ও বিনয় অতি অল্পই দেখিয়াছি। এই কারণে তিনি আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু হইয়াও আমার গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহার ভক্তি ও বিনয় যদি পাই তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাই। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে ভক্তি-পথ দেখাইয়া গিয়াছেন. সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।" *

পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন ;—"কোন সময়ে কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের একটী শিশুসন্তান বিয়োগের পর আমি এবং গোস্বামী মহাশয় উপাসনার জন্য তাঁহার গৃহে গিয়াছিলাম। আমরা উপাসনার জন্য আসিয়াছি শুনিয়া দত্তমহাশয় বলিলেন ;—"শিশুর আত্মা নাই, তাহার জন্য আবার প্রার্থনা কি ? যত দিন আত্মজ্ঞান না জন্মে তত দিন আত্মা থাকে না।" এইরূপ মত শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। দত্তমহাশয় অন্য একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন ;—"ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন, নির্ম্মাতা।" গোস্বামী মহাশয় ইহাতে আরও দুঃখিত হইয়া বন্ধুকে নানা অদ্ভুত মতের সমর্থনকারী জ্ঞানে নাস্তিক, অবিশ্বাসী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। ইহার পর একজন তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে তিনি কালীনাথবাবুকে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি সেরূপ তিরস্কারের যোগ্য নহেন। ইহাতে গোঁসাইজীর মনে অনুতাপ জন্মিল। বন্ধুর মনে অকারণ ক্লেশ দিয়াছেন ভাবিয়া শতগুণ ক্লেশে তাঁহার মন দগ্ধ

---

* ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি ও পত্র হইতে উদ্ধৃত।

হইতে লাগিল। এমন কি রজনীতে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। অবশেষে রাত্রি তিনটার সময় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শয্যা হইতে উঠিয়া কালীনাথবাবুর গৃহে গিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলেন। এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছেন একজন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কালীনাথবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইলেন। কালীনাথবাবু পার্শ্বের একটী প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত ছিলেন, তিনি স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন। এ দিকে গোঁসাইজী ঘরে ঢুকিয়া একেবারে বন্ধুর পা জড়াইয়া ধরিলেন এবং ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। কালীনাথবাবু বলিলেন "আমি ত তখনই তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, এ জন্য এত কেন?" কিন্তু তিনি কিছুতেই পা ছাড়িলেন না। অবশেষে যখন বলিলেন "ক্ষমা করিলাম" তখন স্থির হইলেন। বন্ধুর প্রাণে ক্লেশ দিয়াছি মনে করিয়া তাঁহার এমনই অনুতাপ জন্মিয়াছিল।

শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন;—"বিজয়বাবু আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু। বন্ধুর প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল তৎসম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার তিনি আমাদের দেশের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম না। তিনি আমাদের বাড়ীতে গিয়া "এই আমার বন্ধুর গৃহ" বলিতে বলিতে ভাবে এতদূর আত্মহারা হইয়াছিলেন যে সমস্ত উঠানে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন: এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বন্ধুর প্রতি হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

আর একবার তাঁহার বন্ধু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মজিলপুরের বাড়ীতে গিয়া "এই আমার বন্ধুর গৃহ" বলিয়া উঠানের মাটি মাথায় তুলিয়া দিয়াছিলেন।

একবার বহুদিন পরে জামালপুর (মুঙ্গের) তাঁহার প্রাচীন বন্ধু

ভক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উপনীত হইয়াছেন। অন্নদাবাবু জ্বরে শয্যাগত ছিলেন। বন্ধুর দর্শনে গোঁসাইজীর প্রাণে ভাবের তরঙ্গ উঠিল, তিনি মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুই বন্ধুতেই কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ হইল, অসুস্থতা কোথায় পলায়ন করিল। ঐদিন প্রায় সমস্ত রজনী তাঁহাদের এই ভাবে কাটিয়াছিল। *

একবার মজঃফরপুরে কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে গণ্ডকী নদীতীরস্থ এক চড়াতে কোন সন্ন্যাসী বন্ধুর দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ মাত্র গোঁসাইজী সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে দুই বন্ধুতে বহুক্ষণ নৃত্য হইল।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। গোঁসাইজী বলিয়াছেন ;—"আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম। সমস্ত দিনের প্রচারে ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইলেও আমরা হয়ত দুই এক পয়সার মুড়ি খাইয়া কেশববাবুর জন্য বাজার হইতে ভাল ভাল খাবার লইয়া যাইতাম। কেশববাবু বড়লোকের সন্তান, ভাল খাওয়া অভ্যাস, এখন গরীব হইয়াছেন ; ভাল খাবার পান না ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয়, ভাবিয়া আমরা তাঁহার জন্য ভাল ভাল খাবার লইয়া যাইতাম। তিনি এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন "আমাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রগাঢ় বন্ধুতা আছে তাহাতে ইচ্ছা হয় আমাদের ইহলোকের কার্য্য যেন এক সঙ্গেই শেষ হয়।"

আচার্য্য কেশবচন্দ্র কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইলে, গোস্বামী মহাশয় বন্ধুর গৃহে গমন করিলেন ; এবং রোগের অসহ্য যাতনা দেখিয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্য দেহত্যাগ করিলে গোস্বামী মহাশয় শয্যায় পড়িয়া বন্ধু-বিচ্ছেদে ছটফট করিতে লাগিলেন।

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাসমহাশয় বলিয়াছেন—গোঁসাই বলিয়াছেন—"তিনি শুনিলেন কেশবচন্দ্র বলিতেছেন—"বিজয়, বিজয়, আমার জন্য প্রার্থনা কর। উহারা ত করিল না, তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর।" তিনি বন্ধু বিয়োগে পাদুকা ত্যাগ করিয়া শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন।

৺ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার যৌবনের, প্রৌঢ়াবস্থার ও বার্দ্ধক্যের বন্ধু ছিলেন। গোঁসাই বলিতেন "নগেন্দ্রবাবু আমার তিন কালের বন্ধু।" এই বন্ধুর নিকট তিনি হৃদয়দ্বার মুক্ত করিয়া সকল কথা বলিতেন। বন্ধুকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল। নিজে যাহা ভালবাসিতেন বন্ধুকে তাহা দিতেন; কোন ভক্ত সাধুর সমাগম হইলে বন্ধুকে ডাকাইয়া পরিচয় করাইয়া না দিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। একবার গোস্বামী মহাশয় তাঁহার এই বন্ধুকে লইয়া মুরসিদাবাদের উৎসবে গিয়াছিলেন। একদিন অতি প্রত্যুষে হঠাৎ নগেন্দ্রবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি দেখিতে পাইলেন গোস্বামী মহাশয় চা প্রস্তুত করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আপনি এত প্রত্যূষে চা করিতেছেন কেন?" গোঁসাইজী বলিলেন;—"আপনি চা খান্, ঘুম হ'তে উঠেই চা পেলে আপনার কত আরাম হ'বে তাই চা প্রস্তুত কর্‌ছি।" *

বন্ধুত্ব সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ;—"পুত্র অপেক্ষা বন্ধু শ্রেষ্ঠ। পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনাৎ, বন্ধু চিরদিনই বন্ধু, সর্ব্বক্ষণ বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই, প্রয়োজন নাই। বন্ধু সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তৃপ্তিতে তৃপ্ত। এমন বন্ধু যাহার নাই সেই বন্ধুহীন। পূর্ব্বকালে বন্ধু সকলেরই দুই একজন অবশ্য থাকিত, এখন বন্ধু পাওয়া অতি অসম্ভব। মতে মতে মিলনে বন্ধুত্ব হয় না। এক উদ্দেশ্য, এক প্রয়োজন, এক বাণিজ্য, ইহা বন্ধুত্ব নহে; বাস্তবিক বন্ধুলাভ অসম্ভব হইয়াছে।"

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

"বন্ধু পাওয়া দূরের কথা যাহাকে মনের কথা বলিয়া প্রাণ খোলসা করা যায়, এমন বিশ্বাসী লোকই দুর্ল্লভ। বিশ্বাস করিয়া অতি গোপনে যাহা বলিয়াছ তাহা বাজারে শুনিতে পাইবে; তাহা লইয়া উপহাস চলিতেছে, দেখিবে। ইহা কালের অবস্থা। নিজের মনের সুখ, দুঃখ লোকে যদি ব্যক্ত করিতে না পারে তবে হৃদয় ক্রমেই কুটিল হইতে থাকে। কুটিলতা মহাপাপ, লোক যদি কোনও প্রকার সাধন ভজন না করে, সরলতার প্রভাবেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। সরল হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট হৃদয় সর্ব্বদাই অসত্য চর্ব্বণ করে, অসত্য রোমন্থন করে। এক বন্ধুহীনতার এত দুর্গতি।" *

ব্রাহ্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ অতি উন্নত ছিল। এজন্য ব্রাহ্ম-জীবনে কোন দোষ দুর্ব্বলতা দেখিলে প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেন। একদিন কলিকাতাস্থ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনের সম্মুখে এক গাড়োয়ান ভাড়া লইয়া গোলযোগ করিয়া কুকথা বলায় কতিপয় ব্রাহ্ম ঐ গাড়োয়ানকে প্রহার করেন। ইহাতে তাঁহার এত দুঃখ হইয়াছিল যে কাঁদিয়াছিলেন।

একবার সিঁতির বাগানে ব্রহ্মোৎসবে খুব জমাট উপাসনা হয়। গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কাজ করেন। উপাসনার পর রন্ধনের বিলম্ব হওয়ায় ক্ষুধিত উপাসকগণকে জল খাবার দেওয়া হইলে অনেকে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়াছিলেন, 'আমি অধিক খাব' এমন ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছিলেন। সরস উপাসনার পরই উপাসকগণের মধ্যে আহার্য্য লইয়া এইরূপ ব্যবহারে গোঁসাইজীর মনে অত্যন্ত ক্লেশ জন্মে। তিনি আহার না করিয়া উপবাসী থাকেন এবং নির্জ্জনে ধ্যানচিন্তায় যাপন করিয়া অপরের অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন।

* নব্যভারত ১৩০৬, ফাল্গুন।

প্রচারক জীবনে তিনি গভীর ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন;—"আমরা কত সময় একত্র সাধন ভজনে যাপন করিয়াছি। একদিন ছাদে বসিয়া আলোচনা করিতে করিতে আমরা ধ্যানস্থ হইলাম। কোন্ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল জ্ঞান রহিল না। অবশেষে তোপের শব্দে ধ্যান ভঙ্গ হইল; কিন্তু তখন ভোর ৫ টা।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন;—"একদিন আমরা উভয়ে কোন স্থানে উপাসনায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম; গোঁসাইজীর উপর উপাসনার ভার ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেকক্ষণ পূর্ব্বে তিনি ধ্যানে বসিয়াছিলেন। তৎপর যথা সময়ে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ না হওয়ায় আমি গিয়া উপাসনা করিয়া আসিলাম; বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে বলিলেন "কই উপাসনার সময় হয় নাই?" আমি বলিলাম;—"আপনাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া আমি যথা সময়ে উপাসনা করিয়া আসিয়াছি। সময় অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "তবে আমাকে ডাকিলেন না কেন?"

শাস্ত্রী মহাশয় একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন;—"ব্রাহ্মধর্ম্মের মৌখিক প্রচার আর কি করিব, গোঁসাইজীকে একটা আসনে বসাইয়া দ্বারে দ্বারে দেখাইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হয়।" এই সময় তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও শিরোমণি ছিলেন। যেখানে গোঁসাই সেইখানেই উৎসব, যে গৃহে তিনি সেই গৃহই সরস; কি সহর কি মফঃস্বল সকল স্থানের ব্রাহ্ম নরনারীগণের মনের আকর্ষণ তাঁহার দিকে ছিল।"

স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় লিখিয়াছেন;—"যখন নিদারুণ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া যার তার কাছে জলের অন্বেষণ করিতেছিলাম তখন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মের উৎস শ্রীগুরুদেবের নিকট যাইতে আমাকে উপদেশ করেন। আমি তাঁহার নিকটই পিপাসার বারি পাইয়াছি। কোন বুজরুকী দেখিয়া অথবা কোন প্রকার মতের

অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার অনুগত হই নাই। তৃষিত ব্যক্তি যে জন্য সুশী তল জলের নিকট যায়, নিদাঘ-তাপিত পথিক যে জন্য ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার কাছে বসিলে সাংসারিক চিন্তা থাকিত না, মনে পাপ থাকিত না, প্রাণে অশান্তি থাকিত না, সমস্ত শরীর মন জুড়াইয়া যাইত। অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসিলে যেমন শীত থাকে না, তাঁহার কাছে বসিলে রজ তম সেইরূপ দূর হইয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গ কি মধুর, কি উন্মাদক, কি ত্রিতাপহারী তাহা আমি কিরূপে বর্ণনা করিব? ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ ৺রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় শ্রীগুরুদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে (ঢাকা প্রচার আশ্রমে) চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন, দুই নয়নের ধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত। আমি এক দিন রজনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গোঁসাইজীর ধর্ম্মমতের সহিত আপনার মতের অনেক অনৈক্য আছে, কিন্তু দেখিতেছি আপনি তাঁহার সঙ্গ করিতে ভালবাসেন।" রজনীবাবু বলিলেন;—"মতের অনৈক্য আছে বটে, কিন্তু আমি তাঁহার নিকট বসিয়া যে উপকার পাই সে সৌভাগ্য হইতে আমি আমাকে কিছুতেই বঞ্চিত করিতে পারি না।" বস্তুতঃ তিনি মধুচক্রের ন্যায় ছিলেন। পিপাসু মাত্রেই তাঁহার সঙ্গ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে ইহলোকে হারাইয়া যে শোক পাইয়াছি আমাদের মাতৃশোক, ভার্য্যাশোক, পুত্রশোক কিছুই তাহার সমতুল্য নহে। এই রুগ্ন অবস্থায় তাঁহার কথা ভাবিয়া প্রাণে যে ভাবের সঞ্চার হইতেছে আমি সুস্থ থাকিলেও তাহা লিখিয়া জানাইতে পারিতাম না।"

"আমি নানাস্থানে তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা সংক্ষেপে লিখিতে পারিবনা। যে ঘটনাপুঞ্জ প্রবল

স্রোতের ন্যায় হৃদয় প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয় তাহাকে বিভক্ত করা বা বিচ্ছিন্ন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। নীতি, ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা তিনি সাধকের এই পাঁচ অবস্থার কথা বলিয়াছেন এবং ইহার প্রত্যেক অবস্থাই তাঁহার জীবনে এমন উজ্জ্বল ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহাকে না দেখিলে আমরা সে সমস্ত উচ্চ ভাবের কল্পনাও করিতে পারিতাম না। তিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম-বিদ্বেষের হস্ত হইতে এমনই উদ্ধার করিয়াছেন যে আমরা হীন হইয়াও জগতের সমস্ত ধর্ম্মকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। তিনি এইরূপে ধর্ম্ম-বিদ্বেষের একটা বিষম জ্বালা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। এখন ইহকাল অপেক্ষা পরকালই আমাদিগের অধিকতর প্রিয়।"

একবার দুইটী বন্ধুর সহিত হিজলীকাঁথিতে প্রচারে গিয়াছিলেন। যখন কাঁথিতে উপস্থিত হইলেন তখন রজনীর ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে, মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টিপাত হইতেছে। তাঁহারা পথ হারাইয়া অপরিচিত কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। গৃহে একটী স্ত্রীলোক ছিল সে শব্দ পাইয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল; এবং অপরিচিত লোক দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। ইতিমধ্যে গৃহের পুরুষেরা আসিয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা বলিলেন "আমরা পথিক, মাষ্টারের বাড়ী যাইতে পথ হারাইয়া এখানে আসিয়াছি।" সে পথ দেখাইয়া দিল। অবশেষে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন ঐ ব্যক্তি একজন বিখ্যাত ডাকাত, দিবাভাগেও লোকের সর্ব্বনাশ করা ইহার স্বভাব। তাঁহারা ডাকাতের হাতে পড়িয়া রক্ষা পাইয়াছেন।

মতিহারীতে একজন সংশয়বাদী মুন্সেফ ছিলেন। তিনি উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। গোস্বামী মহাশয় তথায় প্রচারার্থে

গিয়াছিলেন। গোঁসাইজীর ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঐ ব্যক্তির এরূপ পরিবর্ত্তন হইল যে তিনি গোঁসাইজীকে উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন; এবং তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন। তদবধি ঐ ব্যক্তির উপাসনায় অনুরাগ জন্মে।

কাঁথিতে একজন স্কুল ডেপুটিইন্স্পেক্টর ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন; ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না; উপাসনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতেন। গোস্বামী মহাশয় তথায় প্রচারার্থে গমন করিলে তাঁহার উপাসনায় যোগ দিয়া ঐ ব্যক্তির সংশয় দূর হইয়াছিল। তিনি গোপনে গোঁসাইজীর নিকট উপদেশ লইয়া উপাসনা আরম্ভ করেন এবং তদবধি উপাসনায় অনুরাগ জন্মে।

এক সময় সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার সঙ্গে একত্র নির্জ্জন সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন;—"গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাকুলতা, নিষ্ঠা, বিনয়, ধর্ম্মসাধনে অনুরাগ ও ভক্তিলাভের জন্য আগ্রহ এত অধিক ছিল যে ঐরূপ প্রায় দেখা যায় না। তিনি যখনই কোন সাধকের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন তখনই তাঁহার পদধূলি লইয়া দীনতার পরিচয় দিতেন। আমরা এক সময়ে কোন নির্জ্জন উদ্যানে এক ফুল গাছ তলে বসিয়া উপাসনা করিতাম। একদিন ধ্যানের সময় আমি হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখি তিনি কাঁদিয়া অধীর হইয়াছেন, এবং ক্রমাগত মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। তাঁহার কাতরতা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল ইনিই যথার্থ ধর্ম্মার্থী।"

"অপর একদিন তিনি কোন নির্জ্জন স্থানে সমস্ত দিন উপাসনায় যাপন করেন, কিন্তু তথাপি শুষ্কতা দূর হয় নাই। দিনান্তে শুষ্কমুখে দারুণ ক্লেশসহকারে গৃহে ফিরিতেছিলেন এমন সময় কোন বেশ্যাবাড়ীতে

উচ্ছ্বাসপূর্ণ কীর্ত্তন শুনিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন; এবং রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তথায় ধ্যানস্থ থাকিয়া সরসচিত্তে গৃহে ফিরিলেন।"

বরিশালের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক কালীমোহন দাস মহাশয় বলিয়াছেন;—"একদিন কথা প্রসঙ্গে গোঁসাইজী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন "ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা নাকি কাহাকেও মান্য করে না? কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। এখন ত ইঁহারা নির্ম্মিত গৃহে আসিয়াছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে গোঁসাইজী কাঁদিয়া আমার পায়ে পড়িলেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি গুরুজনদিগকে মান্য করিতে পারি।"

তিনি আরও বলিয়াছিলেন;—"গোঁসাইজীকে ধর্ম্মের জন্য যেরূপ ব্যাকুল দেখিয়াছি সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। এক সময়ে ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে আমার মনে গভীর প্রশ্নের উদয় হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলিলেন;—"এ প্রশ্ন বড় কঠিন; কিরূপে সকল অভাব দূর হয় এই প্রশ্নই লোকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু দর্শন সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করে না। অথচ এই ব্রহ্মদর্শন অতীব সত্য; আর ইহা ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের কোন মূল্য নাই। এজন্য সাধন ভজন প্রয়োজন। সাংসারিক অভাবে পড়িলে, আমরা যাহার নিকট সাহায্য পাই তাহার নিকট উপস্থিত হই। এই আধ্যাত্মিক অভাব পুরণের জন্য আমাদিগকে পরমেশ্বরের চরণে উপস্থিত হইতে হইবে। অকপটে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। এই প্রার্থনা জাগ্রত করিতে হইলে অন্তরের কপটভাব অর্থাৎ জীবনে যাহা লাভ হয় নাই তাহা বলা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অকপট ভাব সর্ব্বদা রক্ষা করিতে না পারিলে কখনও প্রকৃত প্রার্থনার উদয় হয় না। আর প্রকৃত প্রার্থনা ব্যতীত দর্শনও সম্ভবে না।"

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন “আমি একবার ঘোর শুষ্কতায় পড়িয়া তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থী হইয়াছিলাম। তিনি হাত নাড়িয়া বলিলেন ;—“আমার নিকট কেন ? তাঁর কাছে বল।” কথা কয়টি এমন বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত বলিলেন যে উহাতেই আমার মন গলিয়া গিয়া ভক্তির উদয় হইল, চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।”

বাঁকীপুরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে তথাকার ব্রাহ্মমণ্ডলী ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আগমনে মিলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—“আপনি কি মনে করেন ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মভাবের লাঘব হইয়াছে ?” তিনি উত্তর করিলেন ;— “আমার মনে হয় ধর্ম্মের জন্য একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে। এরূপ লোক আমি দেখি না। একটী লোক দেখিয়াছিলাম তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমি তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা দেখি নাই।” *

গোঁসাই অনেক সময় সমস্ত রজনী উপাসনায় যাপন করিতেন ; ‘ঈশ্বরস্মরণ করিয়া শয়ন করিবেন’ মনে করিয়া শয্যায় উপবেশন করিতেন এবং ঐ ভাবেই সমস্ত রজনী কাটিয়া যাইত। এক দিনের ঘটনা কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—“ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিব মনে করিয়া উপবেশন করিলাম, কিন্তু উপাসনা এত মিষ্ট বোধ হইল যে আর শুইতে ইচ্ছা হইল না, সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল।” †

সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রচারকনিবাসে অবস্থান কালে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর

* শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কথিত।

† ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত

মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে গোস্বামী মহাশয় অনেক সময় সমস্ত রজনী উপাসনায় যাপন করিতেন ; নিদ্রা যাইতেন না।

গোঁসাইজী বলিয়াছেন ;—"সে বস্তু ছাড়িয়া কি নিদ্রা ভাল লাগে ? সেই সুন্দর বস্তু কি এক পলক চক্ষের আড় করা যায় ?" "যিনি ব্রহ্মসংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করেন, প্রায়ই তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখা যায় না। যাহারা কৃপণ তাহারা তাহাদের সঞ্চিত অর্থ রক্ষার জন্য নিদ্রা যায় না। তদ্রূপ যাঁহারা বহু যত্নে বহুসাধনে সেই পরম সুন্দর করুণাময় প্রভু পরমেশ্বরকে পরমরত্নরূপে লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে হৃদয়ভাণ্ডারে লুকাইয়া রাখিতে চান। অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, পাপরূপ দস্যুগণ কখন আসিয়া আক্রমণ করে, এজন্য সর্ব্বদা ভয়ে জাগরিত থাকেন।" *

ধর্ম্মানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করিতেন না ; ভগ্নদেহ লইয়াও দেশদেশান্তরে গমন করিতেন। একবার পাহাড়ী বাবার নাম শুনিয়া কেবল ভক্তি শিক্ষার জন্য কলিকাতা হইতে গাজীপুরে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। অন্য এক সময় একজন গৃহস্থ সাধুলোকের নাম শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে দেখিতে কাঁথিতে গিয়াছিলেন। † এইরূপ বহু ঘটনা আছে যাহা তাঁহার ব্যাকুলতার নিদর্শন।

এমন ভগবদ্ভক্ত সাধু পুরুষদিগের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে—"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।" বঙ্গভূমি ধন্য যে বিজয়কৃষ্ণের মত পুত্ররত্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন।

একবার মতিহারিতে সূর্য্যোদয়ের প্রথম মুহূর্ত্তে দূরে হিমালয়ের ধবল গিরি দেখিয়া এমন আত্মহারা হইয়াছিলেন যে বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

---

* আশাবতীর উপাখ্যান। † ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

একবার শিবপুর বাগানে একটি অশোক ফুল দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে আদর করিয়া ফুলটি চোকে, মাথায় লাগাইতেছিলেন এবং বৃক্ষটিকে বার বার প্রেমালিঙ্গন করিতেছিলেন। এইরূপ ভাব দেখিয়া মনে হয় অন্যেরা আর ফুলের কি সৌন্দর্য্য অনুভব করেন; কিন্তু প্রেমিক ভক্তজন উহাতে সৌন্দর্য্যের আধার পরমেশ্বরের দর্শন পাইয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রে মগ্ন হন।

একবার রামপুরহাটে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেশ বড় একটি গোলাপ ফুল আনিয়া গোঁসাইকে দিয়াছিলেন। গোঁসাই ফুলটি হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে গভীর ধ্যানে ডুবিলেন। পরে ধ্যান ভঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।*

একবার প্রচারে তমলুক গিয়াছিলেন। তথায় কোন সরোবরে রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া ভাবে আত্মহারা হইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন। প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গোঁসাইজীর রক্ষার জন্য পরে তিনিও জলে ঝাঁপ দিলেন। প্যারীবাবু গোঁসাইজীর অবস্থা দেখিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

একদিন রামপুরহাটে জ্যোৎস্না রজনীতে নির্ম্মল চন্দ্র দেখিয়া এমন বিভোর হইয়াছিলেন যে ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিলেন; এবং সর্ব্বাঙ্গে যেন ব্রহ্মকে মাখিতেছেন এরূপ ভাবে গায়ে হাত বুলাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। *

তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন;—"একদিবস কোন নগরী মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দর্শন করিলাম একজন ভিক্ষুক সমস্ত দিন ভিক্ষা দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে উহা আর একজনকে অশ্রুপাত করিতে করিতে দান করিতেছে। যাহাকে দান করিতেছে সে অত্যন্ত অক্ষম, চলচ্ছক্তি-

* নগেন্দ্রবাবুর কথিত।

হীন, নিতান্ত দুর্ব্বল। এই পবিত্রভাব দর্শনে মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমার সঙ্গে যে বন্ধু ছিলেন তিনি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য শোভা, ঈশ্বর দয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়া দান করিতেছেন।" আমি মনে মনে দাতা ও ভিক্ষুককে অভিবাদন করিলাম এবং তৎসঙ্গে সেই মহান পুরুষ যিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন তাঁহাকেও অভিবাদন করিলাম। এই ঘটনায় বুঝিতে পারিলাম, উপাসনায় যেমন তাঁহার অপূর্ব্ব প্রকাশ, জনসমাজেও তদ্রূপ তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়।" *

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের খুব অসুখের সময় এক দিন গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। অন্যান্য কথার পর কেশবচন্দ্র বলিলেন;—"গোঁসাই তুমি নাকি কি একটা নূতন মত অবলম্বন করিয়াছ?" তিনি উত্তর করিলেন;—নূতন পুরাতন বুঝি না। ভগবানকে লাভ করিব বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি; সামাজিক বাহিরের বিষয়ে গোল করিতে আসি নাই। ভগবানকে পাইলাম ইহা প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে কিছুতেই ফিরিব না। যে কোন উপায়ে ধরিতে হয় ধরিব। বাহিরের উপায় কিছুই নহে। 'আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তুমিই সত্য' মৃত্যুসময়ে ইহা বলিয়া মরিব এই আকাঙ্ক্ষা। আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।"

কেশবচন্দ্র বলিলেন;—"গোঁসাই অনেক ঘুরিয়া, অনেক পথ হাঁটিয়া সেই পথ পাইয়াছি; যদি সারিয়া উঠি তোমাকে ডাকাইয়া সেই পথের কথা বলিব।" গোঁসাইজী বলিয়াছেন "কিন্তু হায় সেই মধুর কথা আর শুনিলাম না।" †

* স্বলিখিত।

† বরিশালের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক কালীমোহন দাস কথিত। শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি শুনিয়াছি কেশববাবু বলিয়াছিলেন—

লোকের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করা গোঁসাইর স্বভাব ছিল। এজন্য কখনও কাহারও নিন্দা করিতেন না। দোষ-দর্শনস্পৃহা তাঁহাতে একেবারে ছিল না। অপরে কাহারও দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারও অনুমোদন করিতেন না। বরং সময়ান্তরে ঐ নিন্দিত ব্যক্তির সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার এরূপ প্রশংসা করিতেন যে নিন্দাকারী তৎশ্রবণে লজ্জিত হইয়া তাঁহার পক্ষপাতী হইতেন।

তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হওয়ার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিনেল। ইহাতে কোন কোন শিষ্য ঐ সমালোচনাকারীদের প্রতি তীব্র ভাষার প্রয়োগ করেন। ইহা গোঁসাইজীর কর্ণগোচর হইলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া এরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন যে তাহাতে সকলেরই বিরুদ্ধ-ভাব অপনীত হইয়াছিল।

একবার বৃদ্ধব্রাহ্ম স্বাক্ষরিত নব্যভারত পত্রিকার কোন লেখায় গোঁসাইর প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ প্রকাশ হইয়াছিল। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়কে উহার লেখক মনে করিয়া শিষ্যদের কেহ কেহ লেখকের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। শুনিয়া গোঁসাই সান্যাল মহাশয়ের সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া শিষ্যগণের মনের উত্তাপের হ্রাস করিয়া দেন।

তিনি যখন কলিকাতায় সশিষ্যে বাস করিতেছিলেন তখন এক সময়ে অতি প্রত্যুষে ঘনিষ্ঠ শিষ্যগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন। ঐ সময় একদিন একজন শিষ্য কোন ধর্ম্মপ্রচারকের রাজদ্বারে অভিযোগের সংবাদ তাঁহার নিকট পাঠ করেন; তিনি শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিছুই

"গোঁসাই অনেক ঘুরিয়া তুমি যে পথ পাইয়াছ যদি সারিয়া উঠি তবে তাহা শুনিব।" কিন্তু আর সারিয়া উঠিলেন না।"

বলিলেন না। কিন্তু তদবধি ঐ সময়ের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। কার্য্যদ্বারা দেখাইলেন পরের দোষ আলোচনায় তাঁহার কিরূপ ঘৃণা ছিল। *

যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট তাঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার ভক্তি, ব্যাকুলতা, বিনয় ও দীনতার মধ্যে যে অলৌকিকতা দেখা গিয়াছে তদপেক্ষা অন্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা ধর্ম্ম পিপাসুর নিকট নয়। সাধু ভক্তের দর্শন মাত্র ব্যাকুলভাবে তাঁহাদের চরণে পড়িয়া তিনি যেরূপ বিনয় ও ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতেন তাহাতে মানুষের মন গলিয়া যাইত।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিয়াছেন "শেষ জীবনে আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলে তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মনির্ব্বাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে যে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে অতি-প্রাকৃত (super natural) কিছুই ছিল না। তবে তিনি যে অতি-প্রাকৃতকে সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করিতেন তাহা নয়। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সাধনায়, প্রেম বিশ্বাস লাভের পক্ষে ইহা (super naturalism) অত্যন্ত বিঘ্নজনক বলিয়া সর্ব্বদাই ইহার নিন্দা করিতেন।"

স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী মজুমদার লিখিয়াছেন—"গোঁসাই কখনও শক্তি দেখাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। আহারাদির সময় সন্দেশাদি মিষ্টদ্রব্যের অভাব হইলে তাড়াতাড়ি বাজার হইতে আনিতে লোক পাঠাইতেন। কিন্তু শক্তিবলে লোকদিগকে

---

* নব্য ভারত।

চমকিত করিয়া কখনও কিছু করিতেন না। কোন কোন ঘটনা যাহা আমাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইত তাহা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইত। আমার গোঁসাই বুজরুকি দেখানের ব্যক্তি ছিলেন না।”

শক্তিলাভ সম্বন্ধে গোঁসাই বলিয়াছেন—“লোকে শক্তি শক্তি করে, শক্তিলাভ অতি তুচ্ছ বিষয়। যাঁহারা ঈশ্বরকে চান এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাঁহাদের পাছে পাছে শক্তি সকল আসিতে থাকে। কিন্তু তাঁহারা ঘৃণা করিয়া তাহাদের প্রতি একবারও দৃষ্টি করেন না। লোকেরা কোন কাজ করে না, অথচ শক্তি চায়। তোমরা এক বৎসর বাক্যরক্ষা কর, এবং মিথ্যা পরিত্যাগ কর, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোমাদের বাক্য সিদ্ধ হইবে।” *

“এখন লোকে মিরাকেল দেখিতে চায়। কিন্তু ভগবানের মত আর কে মিরাকেল জানে। তিনি গাভীকে ঘাস খাওয়াইয়া দুধ করেন। কোন্ বিজ্ঞান ইহা করিতে পারে? লোকে ইহা দেখে না, কেবল মিরাকেল দেখিতে চায়। কেহ দম্ভ করিয়া বুজরুকি দেখাইলে তবে সন্তুষ্ট হয়। মহাপুরুষেরা কখনও বুজরুকি দেখান না। কোন প্রতিষ্ঠাও তাঁরা আশা করেন না। অষ্টসিদ্ধি আসিয়া তাঁহাদের নিকট সাধাসাধি করিলেও তাঁহারা তাহা চান না। তাঁহারা কেবল ভগবানকে চান। পৃথিবীর সম্রাট হইলেও তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। রসস্বরূপ ভূমা পুরুষকে ছাড়িয়া জগতের অপর কোন পদার্থেই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না।”

গোঁসাইর শক্তিলাভ সম্বন্ধে ৺নগেন্দ্রবাবুর কথিত কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ;—

* নব্য ভারত, ১৩০৬।

কলিকাতায় শিষ্যমণ্ডলীসহ বসিয়া আছেন, এমন সময় নগেন্দ্রবাবুর জ্ঞাতি ভাইপোর অঙ্গুলীতে বৃশ্চিকে দংশন করিল। তিনি যাতনায় অধীর হইলেন। গোঁসাই তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া দষ্টস্থান স্পর্শ করিলেন এবং নিমেষে তাঁহার সমস্ত যাতনার অবসান হইল। *

একবার রামপুরহাটের উৎসবে গিয়াছিলেন। তথাকার ব্রাহ্মগণ গোঁসাইকে বলিলেন "আপনার শরীর অসুস্থ, নগেন্দ্রবাবু আসিলে ভাল হয়।" তাঁহারা নগেন্দ্রবাবুকে আহ্বান করিয়া পত্র লিখিলেন। পরে গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন "তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।"

তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি? নগেন্দ্রবাবু স্বয়ং লিখিয়াছেন আসিতে পারিবেন না, আর আপনি বলিতেছেন তিনি নিশ্চয় আসিবেন।" উত্তর;—"দেখিবেন কি হয়।" অবশেষে সময়কালে নগেন্দ্রবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কেহ কেহ গোঁসাইজীকে বলিলেন, "তাইত আপনার কথাই ঠিক হইল, আপনি কিরূপে জানিলেন ইনি আসিবেন?" তিনি একটুও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না; যেন পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। সকলে উঠিয়া গেলে নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে গোপনে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিলেন, "আমি আপনাকে আসিতে দেখিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম, আপনি গাড়ী ভাড়া করিতেছেন, এবং তৎপরে হাওড়াতে ট্রেনে উঠিতেছেন। ইহা দেখিয়াই আমি বলিয়াছিলাম, আপনি নিশ্চয় আসিবেন।" *

তিনি একবার বাগআঁচড়ার কোন নিঃস্ব ব্রাহ্মের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও কিরূপে অভাব মোচন হইবে ভাবিয়া অধীর হইয়াছিলেন। পরে

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

রজনীতে স্বপ্নে তাঁহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ গৃহের কোণে লুক্কায়িত গুপ্ত ধনের সন্ধান বলিয়া দিলে উক্ত গৃহস্থকে তাহা বলিলেন ও গৃহস্থ উহা তুলিয়া অভাব দূর করিলেন।

ঈশ্বর প্রসাদে মানুষের কতদূর শক্তি লাভ হইতে পারে তৎসম্বন্ধে গেণ্ডারিয়া (ঢাকা) আশ্রমে একবার এক ফকিরের সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প বলিয়াছিলেন;—"ঢাকার হাতী খেদার কোন সাহেব বড় বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি হাতী ধরিতে পাহাড়ে গিয়া শিকার করিয়া বেড়াইতেন। একদিন শিকারে গিয়া প্রকাণ্ড এক বাঘের মুখে পড়িলেন। হাতী বাঘ দেখিয়া ভয়ে পলাইতে লাগিল। সাহেব লাফাইয়া পড়িয়া বন্দুক ছুড়িলেন, কিন্তু সব বিফল হইল। সাহেব বৃক্ষের আড়াল দিয়া পলাইয়া যাইতে এক ফকিরকে দেখিতে পাইলেন। সাহেব সেখানে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ফকির যত্ন করিয়া সাহেবকে সচেতন করিলেন। সাহেব চেতনা পাইয়া দেখিলেন সেই প্রকাণ্ড বাঘটী সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে। সাহেব আবার ভয়ে কাতর হইলেন। ফকির ইঙ্গিত করিলে বাঘ একটু দূরে গিয়া বসিল। ফকির সাহেবকে বলিলেন "তোমরা কি বাঘের মাংস খাও?" উত্তর—না। ফকির—"তবে বৃথা বনের বাঘ মার কেন?" সাহেব—"আপনি বাঘকে বশ করিলেন কি উপায়ে?" ফকির "কেবল ভালবাসা দ্বারা; উহারা বনে থাকে আমিও বনে থাকি।" ফকিরের এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া সাহেব তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং সেই হইতে মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলেন; ও সাধুসন্ন্যাসীকে সমাদর করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঢাকার প্রচার আশ্রমে নানা দেশ হইতে সাধু সন্ন্যাসীগণ তাঁহার নিকট আসিতেন। 'একদিন একজন হিন্দুস্থানী সাধু আশ্রমে উপনীত হইলে গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে পরিচিতের ন্যায় অত্যন্ত আদর ও সম্মান পূর্ব্বক

গ্রহণ করিলেন; এবং যারপরনাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া একটী বন্ধু গোপনে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাইজীর সঙ্গে তাঁহার কোথায় কি সূত্রে পরিচয়।" সাধু উত্তর করিলেন, "ইনি এক সময় কোন পাহাড়ে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন এবং হিমপাতে শরীর শীতল হইয়া গিয়াছিল। তখন অগ্নি জ্বালিয়া তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন।" *

কোন সময় একাকী কোথাও যাইতে পথে রাত্রি হওয়ায় এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই নির্জ্জন স্থানে অন্ধকারে তাঁহার মনে দস্যু তস্করের ভয় উপস্থিত হইল; কিন্তু রক্ষার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং বসিয়া একমনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তথায় একটী লোক আসিল; এবং কোন পরিচয় না দিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। গোঁসাই পরিচয়ের জন্য প্রশ্ন করিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। ঐ ব্যক্তি অগ্নি জ্বালিয়া তাঁহার শীতলতা দূর করিল, এবং হাত পা টিপিয়া দিয়া তাঁহার শ্রমক্লান্তি দূর করিল। পরিশেষে প্রত্যূষে অজ্ঞাতসারে কোথায় চলিয়া গেল।

বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় বলিয়াছেন; —"১৮৮৪ সনে গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আমি এক বাবাজির নিকট গিয়াছিলাম। বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল;—উপাসনায় প্রবেশ করার উপায় কি? তিনি উত্তর করিলেন;—"একদিন যে ব্যক্তি সত্য উপাসনা করে তাহার সঙ্গে উপাসনা করিও তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে।"

গয়ার পথে যে স্থানে চৈতন্যদেব স্নান করিয়াছিলেন আকাশগঙ্গার পীঠস্থ সেই বিষ্ণুপাদোদক তীর্থে আমরা চৈতন্যের জন্মোৎসব করিতাম। গোস্বামী মহাশয় আকাশগঙ্গা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া উৎসবে

* নব্যভারত, ১৩০৬।

যোগ দিয়াছিলেন। প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে তিনি কীর্ত্তনে যোগ দিলেন এবং দুই তিন ঘণ্টা ভাবে নৃত্য করিলেন। কীর্ত্তনান্তে উপাসনা করিতে বলা হইলে বলিলেন, "হরিসুন্দরবাবু করিবেন।" হরিসুন্দরবাবু উপাসনা করিলেন। ঐ দিন তাঁহার নৃত্য ও ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া উপাসকগণের মন অত্যন্ত আর্দ্র হইয়াছিল। একদিন তিনি গয়াতে মন্দিরে উপাসনার কাজ করেন এবং ধ্রুবের উপাখ্যান অবলম্বনে হৃদয়স্পর্শী উপদেশ দেন। তাঁহার ভক্তিভাবের দৃষ্টান্তে উপাসকগণ নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কাহারও মন্দের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আদৌ ছিল না। আমি এবং প্রকাশবাবু একবার একদিন দুই তিন ঘণ্টা তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলাম; দেখিলাম কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ তিক্তভাব তাঁহার মনে নাই। সকলের সম্বন্ধে মিষ্টভাব পোষণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বেশী দেখিলাম। প্রকাশবাবু বলিলেন;—"আমার গৃহে একবার যাবেন না?" উত্তর করিলেন—"গুরুর আদেশ দেবদর্শন, তীর্থদর্শন এবং গঙ্গাস্নান ব্যতীত অন্য কারণে আসন ত্যাগ না করি। আপনার গৃহে যাওয়ার ইহার কোন কারণ নাই তজ্জন্য যাইতে পারিব না।" তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সর্ব্বদাই মনে হইত তিনি অহর্নিশি মিষ্টতা সাধন করেন; মিষ্টতার সাধনে মিষ্টতালাভ করিয়া তিনি মিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। এজন্য মতের কোন কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিতে ইচ্ছা হইত না। কীর্ত্তনে তিনি খুব নৃত্য করিতেন; কিন্তু মত্ততার সঙ্গে অধীরতা ছিল না। আমার মনে হয় সকলের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হয় ইহাই তিনি ইচ্ছা করিতেন; এবং এই জন্য বলিতেন, যিনি যেরূপ বোঝেন তিনি সেই ভাবে চলুন। হয়ত এই কারণেই সকল সম্প্রদায় হইতে শিষ্য গ্রহণ করিতেন।"

এক সময় সৈদপুরে (রংপুর) খুব উৎসব হইত; কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্ম গিয়া উৎসবে যোগ দিতেন। উৎসবের সময় একদিন গোঁসাই বেদীতে বসিয়াছেন, এমন সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে তিনি এমন বিহ্বল হইলেন যে আর উপাসনা করিতে পারিলেন না। ঐ দিন কেবল কীর্ত্তনই হইল। কীর্ত্তনান্তে বলিলেন;—"যে দিন আমি বেদীতে বসি সেদিন যেন পূর্ব্বে কীর্ত্তন না হয়। কীর্ত্তনে আমার শরীর যেন কি এক রকম হইয়া যায়।" *

একবার কাকিনার (রংপুর) উৎসবে সাধারণ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তথাকার রাজার উদ্যোগে কীর্ত্তন মহাসমারোহে হইয়াছিল। কীর্ত্তনের দল ৮০টী খোলের গগনভেদীনাদে সহর মাতাইয়া ব্রহ্মনাম গান করিতে করিতে নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। সেই মহাকীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় রাস্তার ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। *

একদিন কাকিনার (রংপুর) মন্দিরে কীর্ত্তনের সময় তিনি বেদী হইতে লম্ফ দিয়া নীচে পড়িয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিয়াছিলেন;— "এখানে একজন অবিশ্বাসী থাকাতে ভাব খেলিতে পারিতেছে না। হরিনাম কর সব হইবে।" কীর্ত্তন থামিলে রাজার জামাতার কোন আত্মীয় আসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"আমি সেই অবিশ্বাসী, কেননা আপনি উপাসনার সময় যে বলেন, "পরমেশ্বর, আমি তোমাকে দেখিতেছি," ইহাতে আমার বিশ্বাস হয় নাই। আমার মনে হইয়াছে যে ভগবানকে দেখে সে কথা বলিতে পারে কিরূপে?" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন;—"আমি কীর্ত্তনের সময় কি বলিয়াছি আমার মনে নাই। তবে আপনি অবিশ্বাসী নহেন, অবিশ্বাসী ব্যক্তি

---

* স্বর্গীয় কৃষ্ণদয়াল রায় কথিত।

কখনও নিজকে অবিশ্বাসী বলে না। উপাসনাকালে ভগবানের প্রকাশের প্রথমাবস্থায় কথা বলা যায়, প্রকাশ একটু ঘন হইলে স্বর গদ্গদ্ হয়; তখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেছি; পরে আরও ঘন হইয়া প্রকাশিত হইলে কথা বন্ধ হয়।” কিছু দিন পরে এই ব্যক্তি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

একবার কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের দল নগর সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের সময় গোস্বামী মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া রাস্তায় ক্রমাগত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন। জীবনে কখনও পরমুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। এই স্বাধীনতা-প্রিয়তা তাঁহাকে প্রভুত্ব প্রিয় করে নাই; অপরের স্বাধীনতার প্রতি কিরূপ মর্য্যাদা দেখাইতে হয় তিনি তাহারও আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। “সমাজপ্রিয়তা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা মানবহৃদয়ের অতি দুশ্ছেদ্যশৃঙ্খল। এই শৃঙ্খল তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি নিজে যেমন স্বাধীন ও সত্যপ্রিয় ছিলেন অনুগতদিগকেও সেইরূপ হইতে উপদেশ দিতেন। তিনি গুরুর আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন এবং বহুতর শিষ্যও করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন মানুষ মানুষকে যতদূর স্বাধীনতা প্রদান করিতে পারে তিনি তাহার আদর্শ দেখাইয়াছেন।” শিষ্যদিগকে তিনি কখনও কোন বিষয়ে আদেশসূচক ভাষায় উপদেশ দিতেন না। কেবল উচিত অনুচিত বলিতেন। একদিন তাঁহার কলিকাতার বাসায় পাঠের সময়ে কতিপয় শিষ্য নীচের তালায় খুব তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন; গোলযোগে পাঠের ব্যাঘাত হইতেছিল; কিন্তু তবুও নিষেধ করিলেন না

কেবল বলিলেন ;—"কিসের গোলমাল ?" একজন শিষ্য তাড়াতাড়ি গিয়া গোলমাল থামাইয়া দিলেন এবং আসিয়া বলিলেন, নিষেধ করিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন ;—"আমি নিষেধ করিতে বলি নাই, কেবল জানিতে চাহিয়াছিলাম কিসের গোলমাল।" কলিকাতায় যে বাড়ীতে ছিলেন ঐ ভাড়াটিয়া বাড়ীর দেওয়ালে সকলে খুব লোহা পুতিত, এবং তাহাতে আস্তর খসিয়া পড়িত। একদিন বলিলেন ;—"পরের বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে লোকেরা যখন লোহা পুতিয়া আস্তর নষ্ট করে তখন আমার মনে হয় যেন আমার বুকে ঐ সকল লোহা বিঁধিতেছে। *

গেণ্ডারিয়া এক দিন একজনকে বৃক্ষ ছেদন করিতে দেখিয়া বলিলেন উহার প্রত্যেকটী কোপ আমার বুকে লাগিতেছে। নিষেধ করিলেন না, কিন্তু যে ভাবে কথা বলিলেন তাহাতে নিষেধের ফল হইল। অকারণে বৃক্ষছেদন কখনও অনুমোদন করিতেন না। বলিতেন "যদি প্রয়োজনবশতঃ ছেদন করিতেই হয়, বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া তবে ছেদন করিবে।"

শিষ্যগণের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ;— গেণ্ডারিয়া তাঁহার কোন অনুগত শিষ্য শালগ্রাম পূজায় ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি কোন বাধা দিলেন না। কেবল বলিলেন (শিষ্যের নাম করিয়া) "তুমি পূজা করিবে? যদি পূজা করিতে পার তবে কর।" উক্ত শিষ্য যথাসময়ে সমারোহে পূজা সম্পন্ন করিলেন। গোস্বামী মহাশয় উক্ত শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন "পূজা করিয়াছ?" উত্তর ;—"হাঁ পূজা করিয়াছি।" গোসাইজী।—"পূজা! পূজা! মিথ্যা কথা।" শিষ্য তাঁহার তেজ দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। † কাহারও অনুষ্ঠানে সরলতার অভাব দেখিলে তিনি কখনও তাহার সমর্থন করিতেন না।

* নব্যভারত। † শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় কথিত।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার শিষ্য সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। সম্মানিত, ধনী, যশস্বী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, মূর্খ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম নানা দলের লোক তাঁহার ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া শিষ্যদলভুক্ত হন; এবং তাঁহাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করিতে আরম্ভ করেন। একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন;—"তাঁহার সহবাসে যে আনন্দে ছিলাম স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া অথবা সংসারে ধন, মান কিম্বা অপর কোন প্রকার সম্পদ লইয়া সেরূপ আনন্দ পাই নাই। অনুগতশিষ্যগণের অনেকে তাঁহার উপর জীবনের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেন। অনেকে প্রশ্ন করিতেন;— "কন্যার বিবাহ হিন্দু সমাজে কি ব্রাহ্মসমাজে দিব?" তিনি উত্তর করিতেন "এ সব বিষয়ে অপরের মতের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের মত ও রুচির উপর নির্ভর করাই ভাল।" কালীপ্রসন্নবাবু কন্যাদের বিবাহ কোন্ সমাজে দিবেন গোস্বামী মহাশয়কে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিয়াছিলেন "মেয়েদের বিবাহ কখনও হিন্দুসমাজে দিবেন না; ব্রাহ্মসমাজেই দিবেন।" কাহারও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর তিনি তাঁহার কোন বিধি প্রয়োগ করিতেন না, কেবল সাধনের প্রতিকূল ও অনুকূল বিষয়ের উপদেশ দিতেন। একজন শিষ্য বিবাহের দিন দেখিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন;—"আমাকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। আমার নিজের কাজ হইলে আমি দিন দেখি না, কারণ আমার নিকট সব দিনই সমান।"

এক সময়ে কোন ব্যক্তি সাধনের বিধি পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাকে বিধি পালন না করিয়াই সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল;—"আমি কুঅভ্যাসও ছাড়িতে পারিব না।" তখন বলিলেন;—"মন্দ কাজ করিয়া আমার উপর দিও তবুও

সাধন কর।” এইরূপ প্রেমের কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তিনি ধর্ম্মসাধনে অনুরাগী হইয়াছিলেন।

তিনি শেষ জীবনে বৈষ্ণবভাবপ্রধান হইলেও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাঁহার বাহ্য চিহ্ন ও ব্যবহার ইহার অনুরূপ ছিল। কণ্ঠে বৈষ্ণবের তুলসীর মালা, পরিধানে গেরুয়া, বহির্ব্বাস, কৌপিন, গলদেশে শৈবের রুদ্রাক্ষমালা, মুসলমানের স্ফটিকমালা, কপালে তিলক, মস্তকে জটাজুট দেখিলে কাহারও মনে হইত না তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্ম গ্রন্থের মধ্যে যেমন তুলসীদাসের রামায়ণ ও নানকের পুস্তক এবং ভাগবতাদি ছিল, তেমনই কোরাণ বাইবেলও রাখিতেন। যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন তাহার অনুষ্ঠান করিতে সামাজিক কি ব্যবহারিক কোন প্রকার সংস্কারে ভয় পাইতেন না। ধর্ম্মের নামে দেশে নানা প্রকার ভণ্ডামি ও বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া সময় সময় বলিতেন ;—“আমার অনেক সময় ইচ্ছা হয় এই জটা জাল কাটিয়া ফেলি, গেরুয়া পরিত্যাগ করি, কিন্তু কি করিব, গুরুজীর বিশেষ আজ্ঞা তাই সং সাজিয়া বসিয়া আছি। নতুবা এমন ইচ্ছা হয় আমার নামটা পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় ; সকলের পায়ের ধূলি হইয়া থাকি।”

বলিয়াছেন “আমাদের কোন সম্প্রদায় নাই, আর আপনাকে কোন সম্প্রদায়ভুক্তও মনে করি না। যিনি যে ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন করুন কাহাকেও নিন্দা করি না, বরং প্রশংসার যদি কিছু থাকে তাহাই বলিব। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকিলে গম্যস্থানে পৌছিতে পারিবেন। আর তখন বিরুদ্ধ ভাবও থাকিবে না। ধর্ম্মের নামে সম্প্রদায় গঠন করা ও বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করা অপরাধ। ভগবান কর্ত্তা, তিনি কাহাকে কি উপায়ে উদ্ধার করিবেন তাহা আমি কি জানি এই মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত। বিবেক উজ্জ্বল থাকিলে যেমন নিজের মতের তেমনি অন্যের মতেরও সম্মান করা যায় ভুলভ্রান্তি সকলেরই থাকিতে

পারে, কিন্তু উঁহা সময়ে চলিয়া যাইবে। কেবল নিজের মতের লোক-দিগকেই উত্তম মনে করা অনুদারতা।

উদ্যানে নানাপ্রকার ফুল, ফল ও ঔষধি বৃক্ষ থাকে। উদ্যানের মালীক উহার প্রয়োজন ও ব্যবহার জানেন। অপরে অজ্ঞতা বশতঃ কোনটি উৎপাটন করিয়া ফেলিলে তাহা অন্যায় ও অপরাধ। জগতে কত প্রকারের জীব রহিয়াছে কিন্তু কেহই নিরর্থক নয়। বিচিত্র জগতে সৃষ্টিকর্ত্তার পদতলে এই সকলের কি শোভা। যিনি তাহা না দেখিয়া আঘাত ও মর্ম্মবেদনা দিয়া উৎপাটন করিতে চান তিনি দুর্বুদ্ধি পরবশ ও কৃপাপাত্র। উৎপাটন করা দূরের কথা কাহারও মার্য্যদা লঙ্ঘন করিলেও এ রাজ্যের দ্বার অর্গলবদ্ধ হয়। যেমন কলকারখানায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুরই আবশ্যকতা আছে, তেমনি মনুষ্য, পশু, কীটপতঙ্গ, তৃণলতা সকলেরই আবশ্যকতা আছে।”

কলিকাতায় তাঁহার আশ্রমে একদিন তাঁহার শিষ্য উমাচরণ দাস মহাশয় আসিয়াছেন। উমাচরণবাবু জাতিতে নিম্নশ্রেণীর ছিলেন। ইহাতে তাঁহার আহারের স্থান লইয়া শিষ্যগণের মধ্যে মতান্তর হয়। কেহ কেহ তাঁহার জন্য পৃথক স্থান করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না ভাবিয়া তাঁহার গোচর করেন। গোঁসাই শিষ্যগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পৃথক স্থানেই উমাচরণ-বাবুকে দিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের আসনও উমাচরণবাবুর সঙ্গে করিতে বলিলেন। অবশেষে সকলেরই একস্থানে আহার হইল।*

বৃন্দাবনে একদল কীর্ত্তনীয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইত। একদিন তাহা-দের অমনোযোগে বড় ব্যথিত হইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—“দেখ

---

* শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত নাগ বি, এল, কথিত।

দেখ তোমাদের ধর্ম্মের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। যেধর্ম্মে সকলকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা দেয়, প্রেমে সকলকে আপনার করিয়া লইতে, অভিমান, দাম্ভিকতা পরিহার করিয়া তৃণের ন্যায় সুনীচ হইতে বলে সেই ধর্ম্মের কি দুরবস্থা হইয়াছে।" ভাবে ও ব্যাকুলতায় তাঁহার নয়ন ধারায় কপোল ভাসিয়া যাইতেছিল। দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল।

বৃন্দাবনের পথে একটি বৃদ্ধা শিষ্যার মলত্যাগের বেগ হয়। কিন্তু গাড়িতে পায়খানা ছিল না। মহিলার সঙ্কটে অপর কাহারও মনোযোগ না হইলেও গোঁসাই স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি শুনিয়া অগৌণে উদ্যোগী হইয়া একটি কামরায় কাপড় আড়াল করিয়া দেওয়াইলেন, এবং ঐ মহিলা বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন।

গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি কাকিনার রাজকর্ম্মচারী। গোঁসাইজী একদিন কাকিনায় তাঁহার নিকট বড় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিতেছিলেন "আমি একটি বিষয়ের জন্য আপনার নিকট বড় কৃতজ্ঞ আছি।" সকলেই শুনিতে ইচ্ছুক হইলে বলিলেন "আমি যখন বাগআঁচড়ায় ছিলাম তখন একদিন চিঠি লিখিতে আঠা কোথায় পাই এই চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হই। গ্রামে আঠা পাওয়া কঠিন। এই সময় আপনার একখানা চিঠি পাইলাম। তাহাতে দেখিলাম টিকিট অপর পৃষ্ঠায় লাগাইয়া আঠার কাজ করা হইয়াছে। তদবধি আমি আঠার অন্বেষণ চিন্তা হইতে রক্ষা পাইয়াছি। একটি উদ্বেগ হইতে যিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন তিনি আমার অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার ভাজন।"

কেহ কোন গান শুনাইয়া তাঁহার ভক্তি পথের সহায়তা করিলে তিনি তাহাকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। বলিতেন "ইঁহারা আমাকে যাহা শুনাইলেন তাহার তুলনায় আমি আর কি দিলাম।"

রেলে ষ্টীমারে কোথাও যাওয়ার সময় গাড়োয়ান কুলীদের সঙ্গে প্রায়ই লোকের বচসা হয়। কারণ তাহারা কিছু বেশী চায়, আর লোকেও কিছু কম দিতে পারিলে স্থবিধা বোধ করে। গোঁসাইজীর ব্যবহার অন্যরূপ ছিল। তিনি তাহাদিগকে আশার অতিরিক্ত দিতেন, চাহিবার সুযোগ রাখিতেন না। এক আনা দুই আনার স্থলে চারি আনা কি আট আনা দিতেন। ইহাতে একজন শিষ্য এক দিন বলিলেন "ইহা কি অর্থের অপব্যবহার নয়?" তিনি উত্তর করিলেন "না, ইহাই অর্থের সদ্ব্যবহার, ইহাদিগকে কিছু দিতে পারিলে ভাল। ঝি, চাকর, মুটে, মাঝি, গাড়োয়ান-দের সঙ্গে অনেকে ভাল ব্যবহার করে না ইহা শুনিলে আমার কষ্ট হয়। ইহারা আমাদের প্রতিনিধি হইয়া কাজ করে। আমরা যাহা করিতে পারি না, ইহাদের দ্বারা তাহাই করাইয়া থাকি। আমাকে ঐরূপ একটি মোট কি তোরঙ্গ মাথায় করিয়া আনিতে হইলে কি ক্লেশই না পাইতে হইত। লোকে ইহা ভাবে না বোঝে না। লোকে চাকরের অসুখ হইলে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। যখন খাটিতে পারে তখন আদর, অসুখের সময় অন্যরূপ ইহা অত্যন্ত স্বার্থপরতা। সেই অবস্থায় সেবা করিলে, ঔষধ পথ্য দিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়।" একবার একটি ভদ্র লোকের এই প্রকার সেবার কথা শুনিয়া গোঁসাইজী তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় একদিন একজন অপরিচিত লোক আসিয়া বলিল "আপনার বাক্সে যাহা আছে আমাকে দান করুন।" গোঁসাইজী বলিলেন "আমার কোন বাক্স নাই।" লোকটি বলিল "ঐ পাশের ঘরে বাক্স আছে।" গোঁসাইজী যোগজীবনবাবুকে ডাকিয়া জানিলেন "একটি বাক্স আছে এবং উহাতে বাড়ীভাড়ার জন্য ধার করিয়া দুই শত টাকা রাখা হইয়াছে। বাড়ীওয়ালাকে আজই উহা দিতে হইবে।" গোঁসাইজী ইহা শুনিয়াই ঐ

ব্যক্তিকে সমস্ত দিতে বলিলেন। অবশেষে তাঁহার আদেশে তাহাই করা হইল। লোকটি টাকাগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া প্রস্থান করিল এবং যাওয়ার সময় বলিয়া গেল সে "অন্ত মধ্যাহ্নে এই স্থানে আহার করিবে।" কিন্তু মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত লোকটি আর আসিল না। গোঁসাইজী ঐ ব্যক্তির অপেক্ষায় রহিলেন, আহার করিলেন না। তাঁহার অনুমতিক্রমে অন্যান্য সকলের আহার হইল কিন্তু তিনি অতিথির জন্য উপবাসী রহিলেন; পরে রাত্রিতে ঐ ব্যক্তি আসিলে তাহাকে আহার করাইয়া আহার করিলেন।

কলিকাতায় একদিন কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় বন্ধু আসিয়াছিলেন। তখন চা প্রস্তুত হইতেছিল। গোঁসাইজী তাঁহাদের জন্যও চা করিতে বলিলেন। কিন্তু দুগ্ধের অল্পতা জন্য গোসাইজীর চাতে বেশী ও অন্যান্যের চাতে অল্প দুধ দেওয়া হইয়াছিল। গোঁসাইজী চার রংএ প্রভেদ দেখিয়াই কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দুধের কম বেশী শুনিয়া বলিলেন "আমাকে বিষ আনিয়া দিয়াছ? উহা এখনই ফেলিয়া দাও।" উহা ফেলিয়া দিয়া এবং বিনা দুধে শুধু মিষ্ট দিয়া তাঁহাকে চা দিতে হইল।

কোন সময় তাঁহার জন্য ভাল খাবার আনাইতে চাহিলে বলিতেন "যদি মেথর পর্য্যন্ত সকলের জন্য আনাইতে পার, আনাও, নতুবা আমার একার জন্য আনাইলে আমি খাব না।"

বৃন্দাবনের পথে তাঁহাদের গাড়ীতে বাহিরের একটি লোক উঠিয়াছিল, শিষ্যগণ তাহাকে নামাইয়া দিতে চাহিলে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "ঐ লোক আর তোমরা আমার নিকট তুল্য।"

পুরীতে তাঁহাকে এক ব্যক্তি বিষ দিয়াছিল এরূপ প্রকাশ। গোঁসাই-জীকে বিষদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "অন্যায়ের বিচারক ও শাস্তিদাতা একজন আছেন, তিনিই যাহা ইচ্ছা করিবেন। আমরা কেন সে ভার গ্রহণ করিতে যাই।"

কোন সময়ে কতিপয় শিষ্যসহ তিনি বৃন্দাবনে এক কুঞ্জে বাস করিতেন। তাঁহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ শিষ্যদের নিকট হইতে অর্থ আসিত। গোঁসাই মনিঅর্ডারে নাম সই করিয়া টাকা পূজারীর নিকট দিতেন। কথা ছিল পূজারী তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিবেন। পূজারী সমস্ত টাকাই লইতেন, কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে নানা কষ্ট হইলেও মনোযোগ করিতেন না। কেহ সে সম্বন্ধে গোঁসাইকে কিছু বলিলে তিনি বলিতেন "এই কয়েকটি লোককে আহার করাইয়া পূজারী মহাশয়ের যদি কিছু থাকে সেত ভালই।" সময় সময় কেহ গোঁসাইকে লক্ষ্য করিয়া ভাল খাদ্যাদি দিলে পূজারী তাহারও অধিকাংশ গ্রহণ করিতেন, গোঁসাইকে সামান্যই দিতেন। সে বিষয়েও কেহ কিছু বলিলে বলিতেন, "পূজারী ছেলে মেয়ে নিয়ে খাইবেন তাঁর ত বেশীই দরকার।"

বৃন্দাবনে একজন পদস্থ ডাক্তার কোন কুঞ্জের সেবায়তের নামে এইরূপ চিঠি দেন যে গোঁসাইর আহারাদির যেন যত্ন লন। শ্রীধরবাবু ঐ চিঠি গোঁসাইকে দেখাইলে তিনি বলিলেন "উহা ধুনির অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। বৃন্দাবনে থাকিয়া আহারের জন্য অনুরোধের প্রয়োজন কি?"

বৃন্দাবন হইতে মথুরা হইয়া গোকুলে রওয়ানা হইলে উক্ত ডাক্তার মহোদয় নূতন স্থানে গিয়া গোঁসাইর কোন কষ্ট না হয় এজন্য পুনরায় অপরের নামে একখানি পত্র দেন। যমুনা পার হওয়ার সময় গোঁসাই উক্ত পত্রের কথা অবগত হন। গোঁসাই পত্রখানা পড়িয়া যমুনায় ভাসাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"আবার পত্র কেন, আমরা যাঁহার উদ্দেশ্যে যাইতেছি তিনিই আমাদের ব্যবস্থা করিবেন।"

পরে নৌকা ঘাটে লাগিলে গোঁসাই তীরস্থ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সাধুদের নিকট গিয়া বসিলেন। তথায় কথাবার্ত্তায় কিছুক্ষণ কাটিল। ইত্যবসরে সাধুদের কেহ কেহ ভিক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি আনিলেন, সকলের

আহার হইল। তৎপর সমস্ত দেখিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। যাঁহার উপর তাঁহার নির্ভর তিনিই সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। নূতন স্থান কোথায় আহার, কোথায় বিশ্রাম হইবে এ সকলের কোন ভাবনা তাঁহার ছিল না।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে একদিন ঘরে কিছুই ছিল না। বুড়া ঠাকুরাণী নবকুমারবাবুকে বাজার হইতে ধারে কিছু জিনিষ আনিয়া দিতে বলিলেন। নবকুমারবাবু ধারে জিনিষাদি আনিলে রান্না ও আহারাদি হইল। আহারান্তে গোসাই নবকুমারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন বাজার হইতে ধারে জিনিষ আনা হইয়াছে। শুনিয়া বলিলেন "আপনি ভাল মনে করিয়া যাহা করিয়াছেন তাহাতে আপনার কোন দোষ নাই, তবে আমার একটি ব্রত আছে তাহা আপনাকে বলা উচিত। আমার ব্রত আকাশ বৃত্তি। আমি ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া আছি। তিনি যদি চর্ব্বা, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতির বিধান করেন সকলে তাহাই আহার করিব, যদি ভাতে ভাত, শাকান্ন অথবা তাহারও বিধান না করেন তাঁহার বিধানই মস্তকে ধারণ করিয়া অনশনে থাকিব। আমি নিজে সে ভার গ্রহণ করিতে গেলে আমার ব্রত রক্ষা না হইয়া ভঙ্গ হয়। তাই আপনাকে আমার কথা বলা আবশ্যক মনে করিলাম।" নবকুমারবাবু করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন "আমি কাহারও বাধ্য নই। তোমরা একটু সেবা কর বলিয়া আমাকে তোমাদের বাধ্য মনে করিও না। যাহার শ্বাস প্রশ্বাসে নাম চলে তাহার সঙ্গেই আমার যথার্থ সম্পর্ক। বৃক্ষতল ও অট্টালিকা আমার পক্ষে তুল্য।"

• রাখালবাবু জমিদার, গোঁসাইর শিষ্য। ইনি একবার কয়েক জন লোককে দীক্ষার জন্য উপস্থিত করিয়া গোঁসাইকে অনুরোধ করেন।

কিন্তু গোঁসাই "তাহাদের সময় হয় নাই" বলিয়া দীক্ষা দিলেন না। রাখাল-বাবু ক্ষুণ্ণ হইলেন। গোঁসাই তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। রাখাল-বাবু অনেক সময় গোঁসাইকে অর্থ সাহায্য করিতেন, কিন্তু তাহা তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে নাই।

মেয়ে জামাই তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে শিষ্যদের হইতে কোন পার্থক্য ছিল না। "বলিতেন আমার কাহারও সঙ্গে পুত্র, কন্যা, জামাতা এ সকল সম্বন্ধ নাই। সকলের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তোমাদের সহিতও তাহাই।" স্নেহের বাধ্য তিনি ছিলেন না।

কোন কোন শিষ্য তাঁহাকে ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিতে চাহিতেন। তিনি কখনও ফুল চন্দন পায়ে দিতে দিতেন না। তবে মাথায় দিতে চাহিলে বাধা দিতেন না। কাহারও মনে বেদনা না দিয়া যত দূর সাধ্য সাবধান করিতেন। একজন শিষ্যকে ফটো সাজাইতে দেখিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অন্তরের অনুরাগ বাহিরে বিকৃতি না ঘটায় সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ভক্তি, ভালবাসা তাঁহাকে আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই।

নবদ্বীপে গোস্বামীগণ গোঁসাইজীকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আহ্বান করেন নাই। পরে পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন এক সভায় শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে শাস্ত্রে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধি আছে। আর গোঁসাই শাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষীয় লক্ষণযুক্ত। তদবধি গোস্বামীগণ গোঁসাইকে মন্দির দর্শনে আহ্বান করিতেন।

গোঁসাইজী নবদ্বীপে মহাপ্রভুর উৎসব দর্শনে গিয়া মধুসূদন স্মৃতিতীর্থের বাড়ীতে হরিসভায় উপনীত হইয়াছেন। গৃহকর্ত্তা পত্রপুষ্পদ্বারা সুন্দর একটি কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়াছেন। নিকটে বসিয়া ৪।৫ বৎসরের দুইটি শিশু খেলা করিতেছিল। গোঁসাই গিয়া শিশু দুইটির প্রতি চাহিতেই বালকটি

খেলা ফেলিয়া উঠিল, এবং তাঁহার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। চক্ষুর জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। পরে বালিকা আসিয়া তাহার পাশে হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। শিশু দুইটির মিলন দেখিয়া গোঁসাই ভাবে মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন "আজ যথার্থই দোল দর্শন হইল। ভগবান শচীনন্দন অদ্যাপি শ্রীধাম নবদ্বীপের ঘরে ঘরে এইরূপে খেলা করিতেছেন।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

গোঁসাই শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত প্রভুর সাধনের স্থল বাবলা গ্রামে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিতে পথে একদল লোকের কীর্ত্তন শুনিয়া দূর হইতে ছুটিয়া গিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন; এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। সাধুর সমাগমে কীর্ত্তন খুব জমিয়া গেল। কীর্ত্তনের দল পরে এক ঠাকুর বাড়ী প্রবেশ করিলে সকলে আগ্রহ করিয়া গোঁসাইকে ঠাকুর ঘরে লইয়া গেল। তিনি ঠাকুরের দিকে পা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন; এবং উঠিয়া বলিলেন "আমার ঠকুরের দর্শন হইয়াছে।" তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন।

স্বর্গীয় প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের একজন মহা সাধক ছিলেন। তিনি গৃহত্যাগী হইয়া ওঙ্কারনাথ পাহাড়ে মৌনীবাবা নামে পরিচিত হন। মৌনীবাবা কোন সময়ে ঘোর শুষ্কতায় পড়িয়া গোঁসাইকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে নিম্ন লিখিত পত্র প্রেরণ করেন;—

"বাহিরের ধর্ম্ম লাভের জন্য যাহা প্রয়োজন সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎ ভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার জন্মে না। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু বনে বনে পদ্মপলাসলোচন বলিয়া কাঁদিয়া ছিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্ম দর্শন পাইলেন না।

ঈশা জর্নদি ব্যাপটিষ্টের নিকট দীক্ষিত, চৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন হয় না। আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনীও হইবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তিও করিবে তাহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করিতে চান তবে অন্তরের সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার দূর করুন। কি সত্য কি অসত্য তাহা আপনি জানেন না। এখনও সেই পূর্ব্ব শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে। ব্রহ্মদর্শনে যখন প্রকৃত জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে তখন এক একটি সত্য জানিতে পারিবেন। গুরুকরণ করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয় তখনই ব্রহ্মদর্শন পাওয়া যায়। অন্তরে যে বাসনা আছে তাহা পাইবেন ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিবেন না। যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে ততক্ষণ ব্রহ্মসহবাস অনেক দূরে।

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যত দূর করিতে পারে আপনি তাহা করিয়াছেন। এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ভগবান সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্য জগতের কোন কার্য্য যেমন অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগতও নিয়ম ভিন্ন চলে না। ব্রহ্মদর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অবার্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি এজন্য এত লিখিলাম।"

মৌনীবাবা তাঁহার দেহ ত্যাগের তিনমাস পূর্ব্বে জানাইয়া ছিলেন যে "তিনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া গোঁসাইকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।"

গোঁসাই অন্য সময় বলিয়াছেন :—বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি লোক গুরু গুরু করিয়া বেড়ায়। বেশভূষা, ও জটাজুট দেখিয়া ভুলিয়া যায় এবং বিপথে পতিত হয়। ধর্ম্ম লাভের জন্য যাঁহাদের যথার্থ

---

* মৌনীবাবা ৭৫ পৃষ্ঠা।

ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে তাঁহাদের গুরু খুঁজিতে হয় না। ঘরে বসিয়াই যথাসময়ে তাঁহারা গুরুলাভ করেন। সে জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া কাশীতে তান্ত্রিক গুরুর আশ্রয়ে আসিয়া একটি পরিবার কিরূপে বিপথগামী হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিলেন।

১২৯৯ সনের মাঘমাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে উক্ত সমাজের জেনেরল কমিটির সভ্য হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় মতে তদুত্তরে জনৈক শিষ্যকর্ত্তৃক নিম্নলিখিত পত্র লিখিত হয় ;—

"তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মতে নাই। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য জানিবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিজে করিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং যাগযজ্ঞ, মালা, তিলক, জটাজুট, ভস্ম, ব্রত উপবাস কিছুই অবজ্ঞা করা যায় না। এজন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ বাহ্য বস্তু জানিতে কত শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন, তীর্থাদি ভ্রমণ করেন, সর্ব্বভূতে ভগবৎ অধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমার নিকটে প্রণাম করেন। ভগবান বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এজন্য তিনি বলেন "তফাৎ থাকাই সার কথা।"

৺নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"গোস্বামী মহাশয় কখনই পৌত্তলিক বা সাকারবাদী হন নাই। কয়েক দিন হইল ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সহিত এ বিষয়ে কথা হইয়াছিল। তিনি যে শেষাবস্থায় সাকারবাদী হইয়া যান নাই তদ্বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণ দিলেন। সে প্রমাণ এই যে তাঁহার শিষ্য * এক সালগ্রাম শিলা রাখিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "সালগ্রাম গঙ্গাজলে

ফেলিয়া দিয়া এস।” ব্রাহ্মসমাজের মুসলমান ভৃত্য সকতআলিকে সালগ্রামের নিকটেই সান্নিধ্যে বসিতে দিতেন। তাঁহার উক্ত শিষ্য রাখাল-বাবুর বাড়ীতে ম্যাটিং করা বিছানার উপর এক শালগ্রাম চক্র আনিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া খুব জাকজমক করিয়া আরতি করিত। গোঁসাই তাহা দেখিয়া হাস্য করিতেন। একদিন উক্ত শিষ্যকে বলিয়াছিলেন “আমার এখানে ও সব চলিবে না। যদি বেশী হিন্দুয়ানী করিতে চাও, বাড়ী চলিয়া যাও।”

তাঁহার শেষ জীবনের মত সম্বন্ধে ৺নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন ;—“গোঁস্বামী মহাশয় উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া সাকারবাদী হইয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না। তবে তাঁহাতে কোন কোন বিষয়ে হিন্দুভাবের প্রাবল্য জন্মিয়াছিল। দেব দেবীর অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে ঈশ্বর মনে করিতেন না। বলিতেন “দেবদেবীর পূজায় মানুষের সাংসারিক উন্নতির সহায়তা হইতে পারে, কিন্তু পরিত্রাতা একমাত্র ব্রহ্ম।”

তিনি যে সর্ব্বদা নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করিতেন তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। শিষ্যদিগকেও যে করিতে বলিতেন তাহাও আমি জানি। একদিন একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আমি কি কোন সাকার মূর্ত্তির ধ্যান করিব?” তিনি পরিষ্কার ভাষায় অসম্মতি জানাইয়া-ছিলেন। তখন অনেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন বলিয়া সময় সময় আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ মতের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু আমি তাহাতে তাঁহাকে সাকারবাদী মনে করিতে পারি নাই। আবার সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ছিলেন তাহাও মনে করি না। শিষ্যদের অনেককেই তিনি ব্রহ্মনাম দিয়াছিলেন।

তাঁহার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান ষোলআনা ছিল। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ তাঁহার

মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি সম্পূর্ণ দ্বৈতভাবাপন্ন ছিলেন না। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। হিন্দি ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বেদান্তের ব্যাখ্যামূলক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তিনি অনেক সময় অতি আগ্রহের সহিত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতেন।

শঙ্করাচার্য্য অবতারবাদী ছিলেন, তিনি অংশাবতার স্বীকার করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ও অংশাবতার স্বীকার করিতেন।

ভক্তি, সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাব ও ভক্তির দিকে তাঁহার অত্যন্ত ঝোক ছিল। আমি সর্ব্বদা তাঁর নিকটে থাকিয়া দেখিয়াছি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ছিল। আমি বিশ্বাস করি তিনি যোগদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।"

গোঁসাইকে অনেক সময় পড়া শুনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া একজন এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "বেশী সময় পাঠ না করিলে আমাকে আভ্যন্তরিক আকর্ষণে এমন আত্মস্থ করে যে আমি কিছুতেই বাহিরের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে যোগ রক্ষার জন্যই আমাকে এই সমস্ত লইয়া কিছু সময় যাপন করিতে হয়।"

ধর্ম্মের যে যোগ তাহাই আধ্যাত্মিক যোগ। এ যোগ একবার হইলে কখনও বিরাম হয় না। গোঁসাইর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের এই আধ্যাত্মিক যোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও এই যোগের কোন দিন বিরাম ঘটে নাই। বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে ইহার পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদা যোগরক্ষা করিতেন। একবার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে থাকিয়া কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১১ই মাঘের উৎসবের সঙ্গে যে যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা শিষ্যগণের

নিকট বলিয়াছিলেন। শিষ্যগণ গোঁসাইর মুখে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশের মর্ম্ম শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া সকলেরই বিস্ময় বোধ হইয়াছিল।

গোঁসাই কীর্ত্তনে খুব নৃত্য করিতেন। অনেক সময় শিষ্যদের কেহ কেহ তাঁহার দেখাদেখি নৃত্য করিতেন। তিনি তাঁহাদের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া বলিতেন "সহজে নৃত্য করা উচিত নয়। ভাব চাপিয়া রাখিতে হয়। পরে বাহ্য জ্ঞানের লোপ হইলে নৃত্যের অবস্থা আসে। নতুবা কেবল লোক দেখান নৃত্যে অপরাধ হয়।"

রামশঙ্কর সেন মহাশয় শেষবয়সে কলিকাতায় মাঝে মাঝে গোঁসাইকে দেখিতে আসিতেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য জন্য তেতালায় উঠিতে পারিতেন না। ওদিকে গোঁসাইরও নীচে নামিবার শক্তি ছিল না। গোঁসাই লাঠি ভর দিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইতেন, উভয়ের সাক্ষাৎ হইত। একজন একতালায়, অন্যজন তেতালায়। দৃষ্টিযোগে ভাবের বিনিময়, প্রেমের বিনিময় হইত। সে দৃশ্যে দর্শকগণেরও চক্ষু জুড়াইত।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে থাকিতে তাঁহার কোন প্রীতি-ভাজন ব্যক্তির পতন হয়। ঐ ব্যক্তির দোষ তাঁহার নিকট গোপন রহিল না। তিনি শুনিয়া ঐ ব্যক্তিকে সাবধান করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন দোষীর দোষ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে অপরাধী লজ্জায় ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যক্তির কার্য্যে গোঁসাই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহার নিকট দোষের প্রশ্রয় পায় নাই। পাপের প্রশ্রয় কোনরূপেই তাঁহার নিকট ছিল না।

যেখানে ধর্ম্ম, ধার্ম্মিকের সেখানেই গতি। গোঁসাই কলিকাতায় অনেক সময় ইডেনগার্ডেনে গিয়া নির্জ্জন উপাসনায় যাপন করিতেন। তখন একদিন একটি মুচির জুতা সেলাই কর্ম্মে ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। তিনি দেখিলেন মুচিটি লোকের জুতা সারিয়া দেয় কিন্তু পয়সার

জন্য দর দস্তুর করে না, আপন ইচ্ছায় যে যাহা দেয় তাহাই সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করে। একজন সামান্য লোকের এইরূপ ব্যবহারে তাহার যথার্থ পরিচয়ের জন্য গোঁসাইর ইচ্ছা হইল। তিনি তাহার অনুগমন করিয়া দেখিলেন সে খিদিরপুরে তাহার গৃহে গিয়া প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে ও দিনান্তের উপার্জ্জন দ্বারা আটা ঘি আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ভোগ দেয় ও উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দিয়া নিজে খায়। দিনের উপার্জ্জন এইরূপে ব্যয় হয়, কিছুই সঞ্চয় করে না। আলাপে বুঝিতে পারিলেন মুচি হইলেও লোকটি ধর্ম্ম বিশ্বাসে পূর্ণ। তিনি তাহার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইলেন। ধর্ম্ম জাতি কি বর্ণগত নয় কিন্তু মানবাত্মার উন্নত অবস্থা ইহারই দৃষ্টান্ত তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

গোঁসাইর নারীর সম্মানে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সাধনার্থীকে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপদেশ করিতেন। বলিতেন "বঙ্গদেশে স্ত্রী জাতিকে সম্মান করা যেন উপহাসের বিষয়। কিন্তু উত্তরপশ্চিমে স্ত্রী জাতির সম্মান আছে। মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে নারীর সম্মান তাই তথায় বীরের জন্ম। ইংরেজ স্ত্রী জাতির সম্মান করিয়াই শ্রেষ্ঠ জাতি। পুরাণে আছে যথায় নারীর সম্মান তথায় লক্ষ্মীনারায়ণ বর্ত্তমান। নারীর প্রতি সম্মান জ্ঞান না থাকিলে চরিত্র পবিত্র রাখা কঠিন।"

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আমগাছতলে প্রতিদিন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইত। একদিন পাঠের সময় মাতাঠাকুরাণী আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার উন্মত্তাবস্থা। তিনি গোঁসাইর পার্শ্বে স্থাপিত মূর্ত্তি দুইটির একটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মূর্ত্তি দুইটি কৃষ্ণ রাধিকার, এবং কোন ব্যক্তি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। গোঁসাই মাকে একটি ভাঙ্গিতে দেখিয়া দুইটিই বিসর্জ্জন দিতে বলিলেন। মাতাঠাকুরাণী পরে অনেকখানি রেড়ির তৈল আনিয়া গোঁসাইর মাথায় জটে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাখাইতে লাগিলেন।

উপস্থিত সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে গোঁসাইর অবিচলিত ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। উন্মত্তা মাতার সমস্ত আব্দার তিনি নীরবে বহন করিলেন।

অন্তর্দ্দৃষ্টি বলে তিনি লোকের মনের কথা জানিতে পারিতেন, বহু লোকের নিকট ইহার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মার্থীগণ নানা প্রশ্ন লইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন। আর তিনি তাহার উত্তর দিতেন। অনেকে এরূপ বলিয়াছেন ;—"আমরা মনে মনে প্রশ্ন রাখি কিন্তু গোঁসাই অন্যের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। ভাবিয়া বিস্মিত হই, এ কি প্রশ্ন না করিতেই উত্তর? তবে কি ইনি মনের কথা জানিতে পারেন?" ফৈজাবাদে একবার এক ব্যক্তি তাঁহার সাধুর বেশ দেখিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, "এই যে সাধুতার বেশ ইহা কি আর্থিক সুবিধার জন্য!" গোঁসাই আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন ;—"যদি অর্থ লাভই জীবনের ব্রত হইত তাহা হইলে প্রচুর অর্থ লাভ করিতে পারিতাম।" লোকটী বিস্মিত হইলেন এবং অবশেষে মনের কথা বলিলেন।

৺বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"আমি মধ্যে মধ্যে বারদির ব্রহ্মচারীর নিকট যাইতাম। প্রত্যেকবার অনেক চিন্তা ও ভাব লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবামাত্র, আমার অন্তরের গোপনীয় প্রশ্ন সকল— যাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানেন না তিনি একে একে সকল গুলির উত্তর দিতেন। প্রশ্ন আমার প্রাণে, উত্তর আমার কাণে; আমি অবাক হইয়া থাকিতাম। একবার ভাবিলাম, যদি ব্রহ্মচারী আমাকে দীক্ষা দেন তাহা হইলে আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব। গিয়া বসিবা-মাত্র তিনি বলিলেন, "না—না, তা হইতে পারে না। তোমার গুরু অপেক্ষা করিয়া আছেন, তিনি তোমাকে ঘর হইতে ডাকিয়া লইবেন।"

তার পর আমি ঢাকায় গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রণাম করিয়া বসিবামাত্র তিনি বলিলেন, "আপনি সাধন পাবেন।" আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হইল। পরদিন স্নান করিয়া ক্ষেত্রের ঘরে উপাসনার জন্য বসিয়াছি, আমার মন উদ্বেগপূর্ণ; আমার ইচ্ছা আমার দীক্ষার সময় আমার বাল্যগুরু নগেন্দ্রবাবু (তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন) উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বলিতে পারিলাম না। গোঁসাইজী হঠাৎ বলিলেন "ক্ষেত্র, নগেন্দ্রবাবুকে ডাক।" নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইলেন, আমার দীক্ষা হইল। আমি যে কারণে চঞ্চল হইয়াছিলাম গোস্বামী মহাশয় তাহা দূর করিলেন দেখিয়া মনে হইল আত্মদর্শী সাধুপুরুষেরা অন্যের মন স্পষ্ট দেখিতে পান। আমার শ্রদ্ধার শতগুণ বৃদ্ধি হইল। যে নাম পাইলাম উহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মূলমন্ত্র; নামটী পড়িয়া উহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। দুই তিন বারে আমার আয়ত্ত হইল। নামের মহিমা কত, নাম কত মধুর তাহার তুলনা পৃথিবীর কোন বস্তুরই সহিত দেওয়া যায় না। নামের মত্ততাকারী শক্তি আছে। সংসারমুখী মন নামের মিষ্টতায় এমনি ভোলে যে ঐরূপ আর কিছুতেই হয় না। মত্ত মাতঙ্গ অঙ্কুশ আঘাতে বশ হয়, মত্ত মন নামে বশ হয়। ঐ যে সঙ্গীতে "নাম প্রসাদে দেখ্‌তে পাবে প্রাণ মাঝে প্রাণারাম" এটী কেমন সত্য তাহা যোগী ভক্তেরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করেন। বাহ্যদৃষ্টি মানুষকে প্রতারিত করে, কিন্তু অন্তর্দ্দৃষ্টি মানুষের মনকে ঈশ্বরচরণে সমাহিত করে। এমন মধুর আস্বাদন ভুলিয়া মানুষ কোথায় যাইবে? নাম প্রভাবে ইহকাল পরকাল এক হয়, আমি ইহা গোস্বামী কৃপায় ভোগ করিয়াছি।"

কোন ব্রাহ্মবন্ধুর উক্তি;—"ইংরেজী ১৮৭৯ সন হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের দ্বারে যাতায়াত আরম্ভ করি। প্রথম প্রথম সাধারণ ছাত্র-গণের ন্যায় কখনও একটী কখনও বা দুইটী গান শুনিয়া উঠিয়া আসিতাম।

এই ভাবে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে একদিন বুড়ীগঙ্গার তীরে গেরুয়া বসন পরিহিত একজন সমুন্নত পুরুষের দর্শন লাভ করিলাম। দর্শনমাত্র তাঁহার প্রতি মনশ্চক্ষু আকৃষ্ট হইল; ইনিই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় তখন পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির বন্যা বহিয়া যাইত; আর উহার আকর্ষণে শত শত নরনারী দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের জন্য ছুটিয়া আসিত। এই সময়ে একবার ফিকিরচাঁদ সদলে ঢাকায় আসিলেন, ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গে নদীয়ার লীলা আরম্ভ হইল। শিক্ষিত অশিক্ষিত কেহই বাদ পড়িল না, সকলেই ব্রহ্মরস-মদিরায় মত্ত হইল। উৎসবের পর উৎসব আসে আবার চলিয়া যায়; কিন্তু সেই যে "সত্যংহি, সত্যংহি, ত্বংহি, ত্বংহি" শুনিয়াছি অদ্যাপি তাহা প্রাণের তলদেশ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তৎপর যে কারণেই হউক গোঁসাই ব্রাহ্মসমাজের মন্দির ছাড়িয়া স্বতন্ত্র স্থানে গমন করিলেন, কিন্তু আমাদিগকে যেন বলিয়া গেলেন, "তোরা থাক্, এ দুয়ার ছাড়িস না।" তিনি কাহাকেও "তোরা সঙ্গে আয়" বলিয়া ডাকিলেন না। কিন্তু তবুও শত শত নরনারী তাঁহার মধুরকণ্ঠে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের কথা শুনিতে ছুটিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে আরও বহুদিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু ঐ যে "সত্যংহি সত্যংহি, ত্বংহি, ত্বংহি" উহা আজও প্রাণে বাজিতেছে। উদ্বোধন নাই, আরাধনা নাই, অনুতাপজনিত হাহাকার নাই, উপাসকমণ্ডলীর প্রতি অন্য উপদেশও নাই, কেবলই আশার বাণী, ত্বমেব, ত্বমেব। জানি না আবার কবে সেই মধুর বাণী শুনিব।"

রাজানগরের শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী ৺কুমুদিনী বসু লিখিয়াছেন—"একদিন রাত্রি শেষে স্বপ্নে এক জটাজুট সন্ন্যাসীর নিকট আমি দীক্ষা প্রার্থিনী হইয়াছিলাম। তখনও আমি গোঁসাইকে দেখি নাই, কেবল তাঁর নাম শুনিয়াছি। পরে ঢাকায় গিয়া গোঁসাইর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি; এবং ইনি

আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট সন্ন্যাসী জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হই। আমি তাঁহাকে "বলিলাম সেই সন্ন্যাসী কি কোন পরলোকবাসী মহাত্মা?" উত্তর করিলেন "তিনি ইহলোকেই বর্ত্তমান আছেন।" বলিলাম "তিনি যে কয়টি শ্লোক বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ কি?" উত্তর করিলেন "পরে জানিতে পারিবে।" বলিলাম "তিনি আকাশ দেখাইলেন কেন?" বলিলেন "উহা বাহিরের আকাশ নয়, চিদাকাশ। চিন্ময় পরমাত্মা অন্তরে প্রকাশিত হন। তাহাতেই সমস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে।" প্রশ্ন করিলাম "তিনি আমাকে অনায়াসেই ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন, কেন সঙ্কোচ বোধ করিলেন না" (অবশ্য স্বপ্নে) উত্তর করিলেন, তিনি সকল নারীকে মাতৃজ্ঞান করেন। বিশেষতঃ তুমি ভগবানকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া মাতৃত্ব লাভ করিয়াছ।"

পরে আমি তাঁর নিকট দীক্ষার্থিনী হইলাম। তিনি বলিলেন "তোমাকে স্বয়ং ভগবান দীক্ষিত করিয়াছেন তোমার আর দীক্ষার প্রয়োজন কি? তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ ইহাই সত্য, ইহাই সার, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ভগবানই জীবের একমাত্র পরম গুরু, পৃথিবীর গুরু পথ প্রদর্শক মাত্র। ভগবান স্বয়ং যাহার পথপ্রদর্শক তাহার মানুষের নিকট দীক্ষার কি আবশ্যক।"

তারপর অনেক অনুরোধে আমাকে দীক্ষা দিলেন। তাঁর সঙ্গে যে সব কথা হইয়াছে তার কিছু উল্লেখ করিতেছি।

প্রশ্নঃ—ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার। উত্তর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানকে জড় কল্পনা করা মহা অপরাধ। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।

প্রশ্ন ঃ—রাধা কৃষ্ণ কি? উত্তর ঃ—রাধা আনন্দ। সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর কৃষ্ণ। ইহাই রাধাকৃষ্ণ।

প্রশ্ন—অবতারবাদ কি? উত্তর তাঁহার শক্তি অবতীর্ণ হয়। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি পৃথিবীতে শক্তি প্রেরণ করেন ইহাই

অবতার। মানুষের নিকট কিছু জানিতে চাহিও না। তাঁহার নিকট জানিতে চাও। তিনি সকল সত্য প্রাণে প্রকাশ করিবেন। আর কাহারও নিকট কিছু জানিবার আবশ্যক নাই। তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাঁহার সঙ্গে যতই যুক্ত হইতে থাকিবে সমস্ত সত্য প্রাণে প্রকাশিত দেখিবে। মানুষের নিকট যাহা শুনিবে তাহার মূল্য অতি সামান্য।

প্রশ্ন ঃ—প্রাণায়ামের আবশ্যক কি? উত্তর— চিত্তের স্থিরতা এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের নিমিত্ত প্রাণায়াম আবশ্যক। চিত্ত স্থির না হইলে ব্রহ্মযোগ লাভ হইবে কিরূপে। সন্ন্যাসীরা প্রাণায়ামে অনেক অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। বাহ্য ক্ষমতা লাভের চেষ্টা ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিবে। কেবল তাঁহাকেই চাহিবে। আর কিছু চাহিও না। যোগের অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়া ফল কি? কেবল তোমাকে চাই এই প্রার্থনা, আর কিছু প্রার্থনা কামনা যেন না থাকে।

আমি একদিন তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে সম্ভ্রমে আমাকে বলিলেন "তুমি আমাদের মা। কেন আমাকে নমস্কার করিতে আসিয়াছ। তুমিই আমাদের নমস্যা।" বলিলাম "আমি আপনার কন্যা, শিষ্য, অবশ্যই আপনাকে নমস্কার করিব।" কহিলেন "না, না তুমি আমার মা, ইহাতে আমার অপরাধ হইবে।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন উপদেশ প্রার্থিনী হইলে বলিলেন "ভগবানই তোমার প্রাণে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিবেন। মানুষের উপর যত নির্ভর করিবে ঈশ্বরের নিকট হইতে জানিবার আকাঙ্ক্ষা ততই হ্রাস হইবে। তপস্যা দ্বারা যে সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় তাহার মূল্য অনেক বেশী"।

আমি কয়েকদিন গেণ্ডারিয়ায় ছিলাম। যোগজীবনের মাতার সমাধি মন্দিরের পশ্চাৎদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া ভোর হওয়ার পূর্ব্বে আমি উপাসনা করিতাম। একদিন উপাসনার পর মনে হইল যদি এই সময় গোঁসাই

আসিতেন নির্জ্জনে তাঁহাকে সাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতাম।" পরদিন চক্ষু খুলিয়া দেখি তিনি নিকটে দাঁড়াইয়া।

সাধন সম্বন্ধে দুই এক কথার পর বলিলাম—"এখানে নাকি বাঘ আসে, ভূত ইত্যাদির ভয় আছে!" বলিলেন "ভিতর হইতে অভয় পাইলে আর সংসারে কি ভয় আছে। ভিতর হইতে কথা শুনিয়া চলিও, আর কাহারও কথা শুনিও না। সর্ব্বজীবে অহিংসা জন্মিলে আর কেহ হিংসা করিবে না।"

শেষ জীবনে তাঁহার মস্তক দীর্ঘ জটাজালে শোভিত হইয়াছিল। যদিও উহা যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন, তবুও উকুণ জন্মিত। একবার রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার জট হইতে উকুণ বাহির করিয়া একজন শিষ্য একটী শিশিতে রাখিতেছেন। ঐ শিশিতে জটের ছিন্ন অংশ তৈলাক্ত করিয়া এই উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে যেন উকুণগুলি উহাদ্বারা জীবন রক্ষা করিতে পারে। গোস্বামী মহাশয় রজনীবাবুকে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ইহাও প্রকারান্তরে বিনাশ করা। তাড়াতাড়ি না মারিয়া (হস্তদ্বারা যেরূপে উকুণ মারে সেইরূপ দেখাইয়া) ধীরে ধীরে মারা।" সামান্য উকুণ গুলির প্রতিও তাঁহার হৃদয় কারুণ্যপূর্ণ ছিল।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় মহাশয় একদিন তাঁহাকে কাম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে উত্তর করিলেন; "কাম প্রবৃত্তি নাই। তবে ২।৪ দিন ক্রমাগত চিন্তা করিলে উপস্থিত হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা আছে।" * পরে বলিয়াছেন;—"গুরুজী কৃপা করিয়া এখন কাম একেবারে মুছিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে কত চেষ্টা করিলাম গেল না, পরে সাধন লইয়াও অনেক চেষ্টা করিলাম। সমস্ত

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

রাত্রি জাগিতে লাগিলাম। কেন জাগিতেছি জানি না, শুইতে ইচ্ছা হয় না। একদিন বৃন্দাবনে ভোরে শুইয়া আছি আমার সমস্ত শরীর ছারপোকায় ধরিয়াছে। হাজার ছারপোকা তবু আমার কোন বোধ নাই। একটী বেড়ার একপার্শ্বে শ্রীধর অপর পার্শ্বে আমি ছিলাম; কিন্তু শ্রীধরের দিকে ছারপোকা ছিল না। তারপর হইতেই দেখি কাম ক্রোধ নাই।" *

যিনি এক সময়ে বলিয়াছেন, "আমি নিতান্ত কামুক ও ক্রোধী ছিলাম, এই দুই রিপু আমার অত্যন্ত প্রবল ছিল" তিনিই আবার বলিতেছেন, "আমার কাম ক্রোধ মুছিয়া গিয়াছে।" এক ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত অপর কোন শক্তির সাহায্যে মানুষ দুর্জ্জয় রিপু জয় করিতে পারে না।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে একদিন নারীজীবনে ধর্ম্মসাধন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গল্পটী বলিলেন;—একটী নারী যৌবনে তীব্রবৈরাগ্যের উদয়ে স্বামীর উপর পুত্রকন্যার ভার দিয়া গৃহত্যাগী হইলেন এবং পুরুষোত্তম ইত্যাদি বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম; -"এই যৌবন কালে একাকিনী ভ্রমণ করিতে কি কোন বিপদ ঘটে নাই?" নারী উত্তর করিলেন;—"ভগবান যাহার সহায় তাহার আবার বিপদ কি? তবে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। যখন পুরুষোত্তম হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে যাই তখন একদিন নিশাকালে কতিপয় সাধুর বাসস্থান এক গৃহে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। অধিক রাত্রিতে একজন ব্যতীত একে একে সাধুদের সকলেই প্রস্থান করিলেন। তখন গৃহবাসী সাধুর দুরভিসন্ধি বুঝিয়া মনে হইল নির্জ্জন স্থানে অবলা নারী কামার্থীর হাতে পড়িয়াছি; ভগবান ভিন্ন আর উপায় নাই। নীরবে মা জগদম্বাকে ডাকিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ দেখি একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র গৃহে প্রবেশ

* নব্যভারত।

করিয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া প্রস্থান করিল। ঐ প্রদেশে তখন কেহ বাঘের নামও শুনিতে পায় নাই; মা জগদম্বা আমাকে রক্ষা করিলেন।" ভগবদ্বিশ্বাসীর জীবন কিরূপে ভয়বিপদ হইতে মুক্ত হয়, তাঁহার উপদেশে তাহাই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ মহাশয় বলিয়াছেন "একদিন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে নিরামিষ ও আমিষ আহার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। তথায় অনেকে উপস্থিত ছিলাম। নিরামিষ আহারের অনুকূলে নানাযুক্তি শুনিয়া সকলের মন তদুপযোগী ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একটী বড় ইন্দুর কোথা হইতে আসিয়া নিকট দিয়া যাইতেই একটি বিড়াল লম্ফদিয়া গিয়া উহাকে কামড়াইয়া ধরিল এবং নিষেধ করিতে করিতেও এক ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া বিড়ালকে তাড়না করিতেই বিড়াল মৃত ইন্দুর ফেলিয়া পলায়ন করিল। গোস্বামী মহাশয় এইরূপ আকস্মিক ঘটনায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—"জীব জীবস্য জীবনং।" উক্ত বিষয় লইয়া আর কোন আলোচনা হইল না। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

গোঁসাইর একখানি পত্র;—

মাতঃ,

তোমার এবং * * র পত্র পাইলাম। * * র পূর্ব্বপত্রের উত্তর দিয়াছি। আমার সময় অতি অল্প এজন্য সর্ব্বদা উত্তর দিতে পারি না। তজ্জন্য দুঃখ করিও না। যাহা ইচ্ছা আমাকে লিখিবে। আমি কাহারও ভ্রাতা কাহারও সন্তান, আমাকে লজ্জা নাই, ভয় নাই। জগদীশ্বর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সর্ব্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিবে। নিন্দা, হিংসা, মিথ্যাকথা ত্যাগ করিবে। স্ত্রীজাতির পতি দেবতা; পতি ইহলোকে থাকুন অথবা পরলোকে থাকুন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ মনে স্থান দিবে না।

পতিভক্তি হইলে বিশ্বপতিকে লাভকরা যায়। চিত্তকে নির্ম্মল রাখাই ধর্ম্ম। গুরুজনকে ভক্তি করিবে। কাহারও মনে ক্লেশ দিবে না। সংসার অনিত্য সর্ব্বদা মনে করিয়া দিন যাপন করিবে। তোমাদের মঙ্গল হউক।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শেষ জীবনে তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ভাবে বিভোর থাকিতেন। কখনও আহার করিতে করিতে বাহ্য জ্ঞান হারাইতেন, কখনও চা পান করিতে করিতে বাটী হাতে করিয়া অন্তরে ডুবিয়া যাইতেন, কখনও ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া তন্ময় হইতেন।

শিষ্যদল সহ ঢাকা হইতে জয়দেবপুর গিয়াছেন। আহারে বসিয়া ভাতে হাত দিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন, অস্পষ্টস্বরে বিড় বিড় করিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন। আবেশ ভঙ্গে বলিলেন, 'মা আমাকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করাইয়াছেন, আমি আর খা'ব না।" সে দিন তাঁহার আর আহার হইল না।

একবার মাঘোৎসবের সময় সূর্য্যগ্রহণে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হয়। গ্রহণের সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ আশ্রমে খুব কীর্ত্তন হইতেছিল। তিনি কীর্ত্তনে দুইহাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। পরে সূর্য্যের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

ঢাকায় একদিন হরিসভার লোকেরা তাঁহাকে তাঁহাদের কীর্ত্তনে আহ্বান করেন। কীর্ত্তনে খুব নৃত্য এবং পরে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত বনমালী গুপ্ত নামক জনৈক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কবিরাজ গোঁসাইজীর অবস্থা দর্শনে কৌতূহলী হইয়া অনুসন্ধান করেন ইহা মূর্চ্ছা কি সমাধি। আয়ুর্ব্বেদোক্ত লক্ষণ মিলাইয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল ইহা মূর্চ্ছা নয়, সমাধি।

তদবধি কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে একজন মহাযোগী জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। *

বৃন্দাবনের একটী ঘটনা তিনি স্বয়ং এইরূপ বলিয়াছিলেন;—বৃন্দাবনে আমি একদিন পায়খানায় গিয়াছি এমন সময়ে নগরসংকীর্ত্তন যাইতেছিল। মনে করিলাম জলশৌচ করিয়া আলখেল্লা ছাড়িয়া কীর্ত্তনে যাইব। ইহার মধ্যে কখন্ কীর্ত্তনে প্রবেশ করিয়াছি জানি না। কীর্ত্তনের পরে গৌরশিরোমণি মহাশয় প্রসাদ দিলেন, খাইলাম। বাসায় আসিয়া মনে হইল জলশৌচ করি নাই। পরে গৌরশিরোমণি মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিলাম "মহাশয় এই ঘটনা।" তিনি আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "আপনি যে ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন তাহা নিষ্ফল হয় নাই। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। এই জন্য মহাপ্রভু আপনাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা সত্যভাবে করা হয় তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না।"

একদিন দ্বারভাঙ্গার পথে বেড়াইতে ছিলেন। দেখিলেন পথপার্শ্বে পলাশবৃক্ষে পলাশফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; ভাবে বিভোর হইলেন; এবং মানুষকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেলে যেরূপ হয় সেই ভাবে গিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন;—"পলাশবৃক্ষের ভিতর হইতে মা উঁকি দিতেছিলেন।"

একবার একটি মুটে মোট লইয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে তাঁহার ভগবদ্দর্শন হইল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তখন মুটেও বাবা বাবা বলিয়া নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল। সে দৃশ্য যাহারা দেখিল তাহারাও চক্ষুর জল রাখিতে পারিল না।

* উক্ত কবিরাজ মহাশয় বরিশালে ৺নগেন্দ্রবাবুকে ইহা বলিয়াছিলেন।

একদিন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে প্রাতে পায়খানার পথে অতি সঙ্কোচে পদক্ষেপ করিতেছিলেন। এইরূপ করিতে করিতে মুহূর্ত্ত মধ্যেই বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলে পুনরায় জ্ঞান হইল। পরে বলিলেন, "দূর্ব্বাঘাসে শিশির বিন্দুতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উপদেশাবলী। *

শাস্ত্রে আছে যারা পৃথিবীর শক্তির উপর নির্ভর করে তারা অন্ধ। কেবল একমাত্র সহায় দীননাথ, কাঙ্গাল-শরণ; তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তাই বলি, যদি তাঁকে বিপদে সম্পদে ডাকিতে না পারি তবে আমরা দুঃখী। যদি প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা দেখে বলিতে পারি, 'এই ত মা; দেখ হে জগৎবাসী, আমার প্রাণের মধ্যে মা আনন্দময়ী বিরাজ করিতেছেন; তবেই ত সুখী হইব, নইলে যদি কথায় বলিয়া প্রাণে না পাই, তবে আমার মত দুঃখী কে? এই জন্য ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিব মা প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন কি না? পুস্তকে কি উপদেশে শুনে নয়। আমি নীচ, অধম, সামান্য তবু

*পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশ। প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও নানা ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর হইতে সংগৃহীত, এই সমস্ত উপদেশে তাঁহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইল। বাহুল্য ভয়ে সমস্ত উপদেশ উদ্ধৃত না করিয়া আমরা কেবল আংশিক উদ্ধৃত করিলাম।

আমার প্রভু পরমেশ্বর এ কথা ভাবিলে আনন্দের আর সীমা থাকেনা। আমি কেমন করিয়া 'না' বলিব ? খুব দেখেছি, নিশ্চয় করেছি, আমার প্রভু পরমেশ্বর। সত্য সত্য বলি, আমি যেমন 'আমার' বলিয়া তাঁকে বলিতে পারি এমন আর কাকেও পারি না। আপনাদের সকলের নিকট আমি ভিক্ষা করি,আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—আমার প্রভুকে যেন আমি প্রেম করিতে পারি। তাঁকে কেমন করে ভক্তি করিব কিছুই জানি না। প্রভু দীননাথ, দীনবন্ধু। তুমি সত্য, আমি কিছুই জানি না, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য।

যে সংসারে সমস্ত দিন তাঁর উপাসনা, পূজা, নামগান হয় সেই সংসারই ধন্য।' এইরূপ সংসার করিতে হইবে। কেবল কথাতে নয়, চিন্তাতে নয়, কল্পনাতে নয়। যদি প্রাণের সহিত তাঁকে রাজা, করিতে পারি তবেই সংসার ধর্ম্মের সংসার। আমার প্রভু পরমেশ্বর আমার সংসারের রাজা এ দেখিতে পাইলেই জীবন সফল। আমাদের সংসার ধর্ম্মের সংসার হউক। পরিবারে পরিবারে তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক। জয় প্রভু, জয় রাজা, জয় রাজা ; জয় প্রভু, জয় রাজা, জয় মহারাজা, জয় মহারাজা ; তোমারই জয়, তুমিই ধন্য।

যিনি তাঁকে প্রাপ্ত হন তিনি বলেন, "প্রভু তোমার জয় হউক, আমি মরে যাই। যে ব্যক্তি প্রভুকে পায় সে আর আপনার অস্তিত্ব রাখিতে চায় না। তার কিছুই থাকে না। কর্ত্তা আমি, জ্ঞানী আমি, সকল যায় কেবল দাস আমি বর্ত্তমান থাকে। তিনি নিত্য সত্য। আমার প্রভু কল্পনা নন্, কথা নন্, তাঁর আজ্ঞায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে ; সূর্য্য, চন্দ্র,বায়ু, মেঘ, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, সমুদয় প্রাণী আপন আপন কার্য্য করিতেছে।

আমার প্রভু সামান্য বস্তু নয় যে কথায় প্রকাশ করিব। তাঁকে দেখা যায়। তিনিই ধর্ম্ম, তাঁতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। আমি নিতান্তই অনুপযুক্ত; আপনারা আশার্ব্বাদ করুন আমি যেমন করিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াই সেইরূপ যেন তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারি। আমার মা, আমার জননী, এ কথা কবে বলবো? আড়ম্বর চাই না, হে সত্য দেবতা, হে সত্য দেবতা, সব সত্য হউক। আর কিছুই চাই না, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

বারম্বার দেখা আবশ্যক যে বাস্তবিক কি তাঁর আকর্ষণে পড়েছি? তিনি বড়শী হবেন আমি মাছ হ'ব, তিনি ধরিবেন আমি ধরা দিবো। তাঁর হাতে ধরা না পড়িলে আর উপায় নাই। আমি মৎস্য হইয়া তাঁর জালে, তাঁর ফাঁদে না পড়িলে হবে না। আমি কীটানুকীট, আমার কি ক্ষমতা, আমার কি সাধ্য? সকলই তাঁর ক্ষমতা। দুষ্ট মৎস্যের মত যেন তাঁর বড়শী ছিঁড়ে না পালাই। সংসারের প্রলোভন চারিদিক হইতে টানিতেছে; একমাত্র উপায় তাঁকে বলা। যখন দেখিবে আসক্তিতে মারা যাইতেছ অমনি বলিবে "হে প্রভু, আমাকে প্রলোভন চারিদিক হইতে টানিতেছে, আমি একা, প্রাণ কোন্ দিকে যায় স্থির নাই। প্রভু, রক্ষা কর। তখন তিনি টানিবেন। যেমন নদী পাষাণ ভেদ ক'রে সমুদ্রে চলে যায় সেইরূপ তাঁর আকর্ষণ প্রাণে লাগিলে সংসারের নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রাণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। আমি সেই আকর্ষণে পড়িব। নদী হ'য়ে সমুদ্রে যাব, মৎস্য হ'য়ে তাঁর জালে ধরা দিবো। অনেক পরীক্ষায় দেখিলাম, আমি অসার, আমার দীনবন্ধুই সর্ব্বস্ব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন আমি তাঁর আকর্ষণে পড়ে থাকি।

প্রভু দোহাই তোমার, তোমার নামের সারি গেয়ে এই ভবনদী পার হয়ে যাব। আমার স্বোপার্জ্জিত কিছু নাই, যা' দেখি সর্ব্বস্ব তুমি। তুমি

আমার মাণিক, সাত রাজার ধন, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, আমার অভাব কি? তুমি সব, তুমি সব, আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি। আমার প্রাণের দেবতা, তোমার মত আমার কেহ নাই। রক্ষা করেছ, বাঁচায়েছ। তুমি ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য। তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

যাঁকে লাভ করিবার জন্য জীবন, তাঁকে যেন প্রাণের সহিত লাভ করিয়া হাসিতে, হাসিতে, নাচিতে, নাচিতে, চলে যেতে পারি। ঊর্দ্ধে বাহু তুলে নাচিতে,নাচিতে,যেন বলিতে পারি, "আমার আশা পূর্ণ হয়েছে।" সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নর নারী, পশু পক্ষী, তরু লতা ও মানসিক প্রবৃত্তি সমূহকে বন্ধু বলে দেখিতেছি। আমার প্রভু, আমার মাণিক সকলের মাথায় দেখিতেছি, আনন্দে সব পরিপূর্ণ হইয়াছে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি দীন হীন কাঙ্গাল, আর কিছু চাই না। এই যে সোণার মাণিক দূর্ব্বাঘাস গুলিকে, সমস্ত জলস্থলকে, আলো করে তুলেছে। এই সোণার মাণিককে ল'য়ে যেন জীবন কাটাইয়া যেতে পারি। এই সোণার মাণিকের মতন আর কিছুই নাই। সমস্ত বস্তুই হারাতে হয়, কিন্তু এই সোণার বস্তু হারাতে হয় না। আশীর্ব্বাদ করুন, আর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, এই সোণার মাণিক গলে বেঁধে যেন যেতে পারি।

দীননাথ, দীনবন্ধু! আমি আর কিছু চাই না। আমি নরাধম, আমি অবোধ, মূর্খ। দয়াল তুমি দয়াল, হে দয়াল, হে প্রভু, হে কাঙ্গালের ধন, বড় দয়াল তুমি; এমন ক'রে পরিচয় না দিলে আমার কি আর রক্ষা ছিল? আমার হৃদয়ের ধন প্রভু, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না, আমি কি বলিব? আমার ইচ্ছা হয়, তোমাকে আমার এক এক টুক্‌রো মাংস বলি, আমার অস্থি মাংস বলিয়াও তৃপ্তি নাই। আমার প্রাণের বস্তু তুমি, তোমার শরণাপন্ন হই।

আমার মন একবার বল দেখি, তোমার উপাস্য দেবতা কে? হে আমার ধর্ম্মবন্ধুগণ! আপনারা বলুন দেখি আমার প্রভু কে? যিনি মাতৃগর্ভে আমার সঙ্গে থেকে রক্ষা করেছিলেন, তিনিই। এখন সেই প্রাণের দেবতাকে চাই। আমার পরীক্ষা আসুক, আমি পরীক্ষা চাই। আমি তপ্ত তেলের কটাহে পড়িব। প্রভু, বিশ্বাস চাই। কেবল বলিবো হরিবোল, হরিবোল। প্রভু আমাহইতে সব কেড়ে লও, আমাকে শ্মশানে লইয়া যাও, আমাকে কটাহে ফেল, আমার অস্থি মাংস ভস্ম হইয়া যাউক, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হরিবোল হরিবোল বল্‌বো। কে আমার এমন বন্ধু আছেন? যিনি থাকেন, তিনি আমাকে শ্মশানে পুড়িয়ে আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করুন। আমি মান যশ চাই না, আমাকে পোড়াইয়ে খাঁটি করুন। আমি এখনও খাঁটি হইতে পারিলাম না, আমার মন এখনও এদিক ওদিক দোলে, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয় যে আমি এখনও ঠিক হইতে পারিলাম না। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন আমার প্রাণ খাঁটি হউক, আমি সেই পরমেশ্বরকে খাঁটি হইয়া সেবা করি।

তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা ইহা কল্পনা নয়। তাঁকে দেখা যায়, ধরা যায়, আস্বাদন করা যায়, শোনা যায়, এ কথার কথা নয়, আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছি। তিনি যখন প্রকাশিত হন, তখনই আমার শক্তি নতুবা আমি অসার। তাঁকে একবার দেখিলে উৎসাহ ফুরায় না, শক্তি, কমে না, তখন সমস্ত রিপু তাঁরই পূজা করিতে থাকে। তারা বলে, "আমরা কেবল তোমার প্রভুকেই পুজা করিব।" তখনই চিদানন্দ। এই যে এখানে তিনি (চীৎকার) ত্বংহি, ত্বংহি, ত্বংহি ; কেবলই তুমি কেবলই তুমি ; আর যাহা দেখি তাহা শূন্য, সব অন্ধকার ; আর সব তোমাতেই দেখা যাচ্ছে ; ত্বংহি। জয় দেব, জয় দেব, ধন্য দেব, ধন্য দেব, ধন্য

পরিত্রাতা। করুণাময় দীননাথ, দীনবন্ধু, এমন করে তুমি রক্ষা কর, না হইলে কি পারিতাম। দুর্দ্দিনে কেবল তুমিই রক্ষা কর, মানুষ সাহায্য করে না। তুমিই আমার দরদী। হে আমার প্রাণের দরদী, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য; তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

ছোট বেলা যেমন সর্ব্বদা মাকে মনে করিতাম, সেইরূপ বিশ্বজননীকে ভাবিতে না পারিলে আর উপায় নাই। 'আমি কিছুই নই মা'ই সব, নিন্দা প্রশংসা কিছুই আমার নহে, মা'ই আমার সর্ব্বস্ব' মনে এরূপ ভাব আসিলে আর কষ্ট থাকিতে পারে না। আমি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হয়ে সর্ব্বদা মা'র কোলে থাকিব, রাত্রিতে মার কাছে শয়ন করিব, দিনে, মা'র কাছে বসে থাকিব, বিপদে সম্পদে, মা'র কাছেই রব। আপনারা মার সন্তান, আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, পদধূলি দিন, আমি এরূপ হয়ে যাই।

মা, আমার সব ভুলায়ে দাও। যা জেনে অভিমান করি, তা সব ভুলায়ে দাও, যেন শয়নে স্বপনে মা বলিতে পারি। যেমন ছোট বেলায় ক'রে দিয়েছিলে, তাই আবার দাও। তুচ্ছ আমি, তুচ্ছ আমি, তুচ্ছ আমি; কেবল তোমার দিকে দৃষ্টি করিব, আমার ভয় নাই, আমার মা, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

মা'র কাছে আর প্রার্থনা কি? আব্দার করি, কত কি বলি, কত কি চাই। তোমরা বল মা আমাকে টাকা দেন না, ঔষধ দেন না; না, মা আমাকে সব দেন; ধন দেন, ঔষধ দেন গায়ে হাত বুলান, ঘুমপাড়ান, রাজরাজরা কেউ আমায় কিছু দেন না।

আমার মা আমাকে সব দেন, ইহা আমার শোনা কথা নয়, দেখা

কথা; আমি দেখে' বলছি, জোর ক'রে বলছি। মার অনেক রাজা ছেলে আছে, আমি কাঙ্গাল, কীট হ'তে কীট, অধম হ'তে অধম। আমার প্রাণে যখন তিনি আরাম দেন তখন কারু ভয় নাই। আমার মত কীটানুকীট যদি তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করে, তখন কারু ভয় নাই, মাভৈঃ মাভৈঃ। সকলে শুনিতে পাবে, আমি ইহার প্রমাণ পেয়েছি। আমার মা সত্য মা, সকলে পাবে আমি এর নিদর্শন পেয়েছি। অপমানে মাকে ডাক, পাপে নির্যাতনে মাকে ডাক; সব আপদ অবিশ্বাস দূর হবে, আমার মা সব পূর্ণ করিবেন। আমার মা আনন্দময়ী। কেউ দুঃখে থেকো না। ভয় নাই, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন। জয় মা আনন্দময়ী।

আমার প্রভু, আমি আর কিছু চাই না, তোমাকে চাই। প্রভু তুমি অপমানে, শোকে, দুঃখে ফেলে আমাকে পোড়াও তাতে কি? আমাকে তোমার করে, লওয়ার জন্য যা' তোমার ইচ্ছা তাই কর। যথার্থই যদি তাঁকে চাই, তবে পাই। খুঁজিতে খুঁজিতে, হাহাকার করিতে করিতে দেখি পেছনে পেছনে কে ফেরে। কে তুমি, তুমি কে আমার পেছনে? একবার দু'বার দেখিতে, চিনে ফেলি। পরিপূর্ণমানন্দং। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পূরে গেল, তাঁর ভাষা নাই শব্দ নাই। মনে হল কত কি বলবো, তাঁর কথা কত কি প্রকাশ করবো। কিন্তু তখন নির্ব্বোধের মত, অজ্ঞানের মত, হয়ে যাই। তাঁর উপমা নাই, তুলনা নাই, বোবার স্বপ্ন দেখার মত।

প্রশ্নোত্তরে উপদেশ।

ধর্ম্ম—ধর্ম্ম দুই প্রকার, শেখা ধর্ম্ম ও ফোটাধর্ম্ম। ভগবানের নাম বীজরূপে হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া সাধন-বারি সিঞ্চনে অন্তর হইতে যে ধর্ম্মবৃক্ষ

ফুটিয়া উঠে তাহাই ফোটা ধর্ম্ম; আর বাহিরের মতামত শুনিয়া বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের কতকগুলি স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে যে আভাস ভাসিয়া বেড়ায় তাহাই শেখাধর্ম্ম। ধর্ম্ম অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে হয়। মনুষ্য সমাজ যাহা পাপপুণ্য স্থির করিয়াছে ভগবান তাহা দ্বারা বিচার করেন না। তিনি মানুষের হৃদয় দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন।

যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য লালায়িত এবং ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহাদের উপর যেন পাথর ঝুলিতেছে। কোন প্রকারে একটু অহঙ্কার অভিমান হইলেই মাথায় পড়িবে। যাহাদের ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নাই, তাহাদের কথা ভিন্ন। যেমন ধান বাতাসে উড়াইলে এক দিকে ধান অন্য দিকে তুষ পড়ে, ভগবান তেমনি ভাল মন্দের পৃথক করেন।

ভগবানের দয়া নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, অন্যের জীবন দিয়া বুঝা যায় না। অনেক ঘটনা আশু কেমন বোধ হয়। কিন্তু বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করিলে ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা বুঝা যায়। সুখের সময়ে যে দয়া তাহা গৌরবের, দুঃখ বিপদের সময়ে যে দয়া তাহা তৃপ্তিকর।

ধর্ম্মের সঙ্গে ধন, মান কি সাংসারিক সুখের আশা করিলে উহা পলায়ন করিবে। সময় সময় ভাল আহার আবশ্যক, কিন্তু শরীর রক্ষার জন্য নিত্য অন্নের প্রয়োজন। উপাসনা সম্বন্ধেও এরূপ জানিবে।

ভক্তিরস সুধার ন্যায়, যত পান করিবে তত আরও পান করিতে ইচ্ছা হইবে।

অল্পবিশ্বাসী ঈশ্বরের নিকট আপনার মন প্রাণ বন্ধক রাখে, এবং কিছুদিন পরে আবার ফিরাইয়া লয়। কিন্তু পূর্ণবিশ্বাসী আপনাকে সম্পূর্ণ তাঁর নিকট বিক্রয় করেন।

পাপের গরল ভিতরে, কিন্তু প্রকাশ বাহিরে। প্রকাশ বন্ধ রাখিয়া

নিশ্চিন্ত হইও না। ভিতর হইতে একেবারে গরল বাহির করিয়া ফেলিবে।

কোন কার্য্যের পূর্ব্বে যদি চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে বুঝিবে উহাতে ভগবানের সম্মতি আছে।

কীর্ত্তনে একটু নৃত্য করিলে কি ভাব হইলে লোকে ধর্ম্ম বলে। ইহা ধর্ম্ম সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ সত্য, ন্যায়, জীবেদয়া, পিতা মাতা গুরুজনে ভক্তি, সৎসঙ্গে স্পৃহা, পরস্ত্রীদর্শনে সাবধানতা, পরধনে অলোভ।

মানুষের দিকে চাহিলে ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না। মানুষে আমার কার্য্যের নিন্দাই করুক আর প্রশংসাই করুক সে দিকে দৃষ্টি পড়িলেই সর্ব্বনাশ। মানুষ কি বলে না বলে সে সকলের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া যাইবে তবেই রক্ষা, নতুবা নিজকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন।

দল—দলে থাকিলে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয় না। অবিরত ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণ ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে গ্রহণ করিতে হয়। সংসারে যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায় তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। লোকনিন্দা লোকপ্রশংসা অগ্রাহ্য করিতে হয়।

সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের বহির্ভাগ অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া দলাদলি। এই অবস্থা ভেদ করিয়া প্রকৃতধর্ম্ম যাহা জীবনে মরণে সহায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে ধর্ম্মের মতামত লইয়া বিবাদ অনেক পরিমাণে চলিয়া যাইবে। ধর্ম্মলাভ কঠিন কথা। জীয়ন্তে মৃত হইতে হইবে। বৃক্ষের বীজ যেমন না মরিলে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না, সেইরূপ অভিমান একেবারে নষ্ট না হইলে ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হইতে পারে না। অভিমান যতদিন আছে ততদিন ধর্ম্মকর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে ঠিক সমান রাস্তায় চলিতে হইবে।

ভগবচ্চিন্তায় মস্তিষ্কের শক্তি এত বৃদ্ধি হয় যে তাহা বলা যায় না। বৃথা

চিন্তা অর্থাৎ মিথ্যাচিন্তা মহাপাপ। উহাতে মস্তিষ্ক নষ্ট হয়। মিথ্যাকথা যেমন পাপ মিথ্যা কল্পনা করাও ঠিক তেমনি পাপ। যাঁহারা যোগপথে চলিবেন তাঁহাদের সকলই সত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে। নাটক ইত্যাদি পাঠ করা যোগ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। অন্তরের কুঅভ্যাস সকল দূর না হইলে ধর্ম্মলাভ হয় না। কিন্তু উহা কি এক দুই দিনে দূর করা যায়? উহা দূর করিতে অনেক সময় লাগে। মানুষ সেই সময়টুকু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে চায় না। আর একটী কারণে ধর্ম্মলাভ কঠিন—লোকে আপন আপন রুচি অনুসারে ধর্ম্ম চায়। রুচির সহিত অমিল হইলে ধর্ম্ম লইতে চায় না।

প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ।—ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া চালাইতেছেন। তাঁহার বিধি, ব্যবস্থা, নিয়ম, প্রণালী অব্যর্থ। প্রত্যেক পদার্থে দৃষ্টি করিলে সমস্ত অসীম বোধ হয়। যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহারই ব্যবস্থা আছে, নিয়ম আছে। তবে আমরা একটুকু ঝড়, তুফাণ, কি গ্রীষ্ম বর্ষার আধিক্য দেখিলে সৃষ্টি কর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া বিচার, অসন্তোষ প্রকাশ করি কেন? মূলে অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাসের মূল কি? পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ চিন্তা করিতে করিতে এ দুর্গতির উদয় হয়। এজন্য ধার্ম্মিকের একটি লক্ষণ তিনি প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না। আত্মপ্রশংসা বিষতুল্য জ্ঞান করেন। হিংসা সে হৃদয়ে স্থান পায় না। জীবে দয়া, ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া সন্তোষে জীবন যাপন করেন। অবিশ্বাস হইতে অসন্তোষ জন্মে। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের অবস্থা—"হয় সুখে না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুইই সমান।" এই অবস্থা লাভের জন্য আত্মদৃষ্টি চাই।

ভাব ও কীর্ত্তন।—একজন প্রশ্ন করিলেন "সময় সময় দেখিতে পাই কীর্ত্তনে এই খুব ভাব, নৃত্য আবার পরক্ষণেই রাগারাগি মারামারি এ কেমন? তদুত্তরে;—এই প্রকার ভাবকে গোস্বামী পাদেরা শ্মশান বৈরাগ্য

বা মর্কট বৈরাগ্য বলিয়াছেন। যেমন আত্মীয়ের মৃত্যুতে বা পুত্রশোকে বা প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণায় সাময়িক সংসারবৈরাগ্য জন্মে। কীর্ত্তন, প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা দ্বারা যেমন সহজে হৃদয় মন প্রাণ দ্রব হয়, উপদেশে তেমন হয় না। কিন্তু শুধু কীর্ত্তন লইয়া থাকিলে প্রকৃত অবস্থা লাভ হইতে পারে না। প্রকৃত অবস্থা লাভের জন্য সাধন, ভজন চাই। কীর্ত্তনে শুধু একটা উচ্ছ্বাস জন্মে, সাধন ভজন দ্বারা উহাকে স্থায়ী করিতে হইবে। স্থায়ী হইলে কোন অবস্থাতেই আনন্দের ব্যাঘাত হয় না। নিত্যানিত্য বিবেক ও বৈরাগ্য না জন্মিলে এই স্থায়ী ভাবোদয় হইতে পারে না। বিশ্বাসী ভক্তগণ হরিসংকীর্ত্তনে ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ করেন, তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটে। কিন্তু যাহারা ভাবের ঘরে চুরি করেন, ভাবকেলী দেখান, তাঁহাদের নিকট এ রাজ্যের দ্বারা অর্গলবদ্ধ। রূপগোস্বামীপাদ বলিয়াছেন ভাবের অঙ্কুর মাত্রের উদয় হইলে যে অবস্থা হয় তাহা এই :—

ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তি র্মানশূন্যতা
আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আশক্তি স্তৎগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে
ইত্যাদয়োনুভাবস্যুঃ জাত ভাবাঙ্কুরে জনে।

সে আবার কি ভাব যাহা এই আছে পরক্ষণে নাই? অঙ্কুরের উদ্গম হইলে কি উহা বীজে প্রবেশ করে? বরং ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। তদ্রূপ ভাবের অঙ্কুর হইলে উহা সাধককে তন্ময়ত্বে উপনীত করে, প্রেমে একেবারে ডুবাইয়া দেয়।

গুরুর একটু পা টিপিয়া, বাতাস করিয়া ধর্ম্মলাভ হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করে। সাধন ভজন না করিলে ধর্ম্ম লাভ কঠিন।

মতান্তরে বিচ্ছেদ—মতান্তরে বিশেষ হৃদয়বন্ধুর সহিতও বিরোধ

হয়, বন্ধু শত্রু হন। তখন লোকে বিরোধী মতকে ঘৃণিত করিবার জন্য সেই মতের লোকদিগকেও দোষারোপ করে, চরিত্রে কলঙ্ক দেয়। এই জন্য খৃষ্টীয়সমাজে কত নরহত্যা হইয়াছে ও হইতেছে। এই মতের ধর্ম্ম বিদায় না হইলে সত্যধর্ম্মের শোভা বিস্তার হইবে না।

ধর্ম্মলাভ—ধর্ম্ম প্রকৃতিতে লাভ হইয়াছে কি না কখন জানা যাইবে? উত্তর ;—আগুন যেমন সকল অবস্থাতেই একরূপ থাকে কোন অবস্থাতেই রূপান্তর হয় না, সেইরূপ বিপদের সময়ও যাহার ধৈর্য্য নষ্ট হয় না সত্যধর্ম্ম একরূপ থাকে, বিনয় ও সাম্যের কিছুমাত্র অবস্থান্তর হয় না সেই ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে বুঝিবে। বিপদের সময় ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বিনয় ও মিত্রতা ঠিক থাকিলেই ধর্ম্মলাভ হইয়াছে জানিবে।

হরিনাম—হরি এই শব্দ মাত্র হরিনাম নহে। যে নামে যাহার পাপের হরণ হয় তাহাই তাহার হরিনাম। দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, আল্লা খোদা, যীশু যিনি যে নামে বিশ্বাসী তাহাই তাঁহার হরিনাম।

হরিনাম করিতে করিতে নেশা হয়। ভাং গাঁজা ইত্যাদির নেশা কিছুই নহে। নামের নেশা ছোটে না, সর্ব্বদা স্থায়ী।

হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম ;—১ম পাপবোধ, ২য় পাপকর্ম্মে অনুতাপ, ৩য় পাপে অপ্রবৃত্তি, ৪র্থ কুসঙ্গে ঘৃণা, ৫ম সাধুসঙ্গে অনুরাগ, ৬ষ্ঠ নামে রুচি ও গ্রাম্যকথায় অরুচি, ৭ম ভাবোদয়, ৮ম প্রেম।

নাম—"যে দিন চব্বিশ ঘণ্টা একটী শ্বাসপ্রশ্বাস বৃথা না যাইবে নাম চলিবে সেই দিনই সিদ্ধিলাভ হইবে। চিররোগীর ঔষধ খাইতে খাইতে ঔষধে শ্রদ্ধা থাকে না। যন্ত্রনায় প্রাণ ছটফট করে, তথাপি ঔষধ খাইতে হয়, কারণ অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বজন্মে যে সকল কর্ম্ম করা হয় তাহার ফলভোগ করিয়া মুক্তি পাইতে হইলে অনেক জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা শেষ করিতে হয়। ভগবৎনামের বলে মুক্তি সহজে হয়। নানা

দুঃখকষ্টে পড়িয়াও নাম লইতে হইবে। শ্বাস প্রশ্বাসে একমাত্র নাম করিতে পারিলেই অবস্থা লাভ হইবে। তখন শাস্ত্রও সাক্ষ্য দিবে। যখন যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিবে দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাজাইয়া পরে গ্রহণ করিবে। দশ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হইলে তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

কলিতে ব্রহ্মনামের দীক্ষা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন কলির জীবের গতি নাই। ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশমতে দীক্ষিত হইতে হইলে হৃদয় প্রস্তুত কি না দেখিতে হইবে। উপযুক্ত সময় কি না তাহাও দেখিতে হইবে।

একাগ্রতা।—চিত্তের স্থিরতা লাভ ধর্ম্মার্থীর প্রধান ও প্রথম লক্ষণ। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, তপ, জপ সকলই স্থিরতা লাভের উপর নির্ভর করে। স্থিরতা লাভের অনেক উপায় আছে। তন্মধ্যে নাম কীর্ত্তন, উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠাদি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আশুফলপ্রদ। এজন্য সাধকদিগকে প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও স্তব স্তুতি পাঠের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। চঞ্চলমতি বালক যেমন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আবৃত্তি করিয়া আয়ত্ত করে, তেমনি চঞ্চলমতি সাধক উচ্চৈঃস্বরে স্তব স্তুতি ও সঙ্গীতাদি করিয়া ভগবানের পূজা করে। প্রতিদিন একই স্তব, একই গান, একই নাম বিধেয়। যখন যে ভাবের উদয় হয় সেই ভাব দ্বারা চালিত হইলে ভাবেরই অধীন হইতে হয়। ভাবকে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া উচিত, কিন্তু ভাবের অধীন হইবে না। সাধন সময়ে প্রতিদিন একই আসনে, একই গৃহে, একই দিকে মুখ করিয়া উপবেশন করিবে। যেমন শয্যা বা গৃহ পরিবর্ত্তনে অনেকের অল্পাধিক নিদ্রার ব্যাঘাত হয় সেইরূপ আসন, স্থান,অভিমুখ পরিবর্ত্তন করিলে সাধনের ব্যাঘাত ঘটে। চিত্তের স্থিরতার জন্য সাধনেও স্থিরতা চাই।

ভগবান আছেন সর্ব্বদা ইহা স্মরণ করিতে হইবে। স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিনটি একাগ্রতা লাভের প্রধান উপায়। প্রথমত সর্ব্বদা, সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্ব ঘটনায় অস্তিত্ব স্মরণ, তৎপর মনন। অস্তিত্ব বোধ হইলে আপনা হইতেই মন সেইদিকে যায়। যেমন সর্পে আলোক দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে পারে না। তৃতীয় নিদিধ্যাসন। গরুর জাওরকাটা যেমন। স্মরণ মননে যাহার স্বাদ পাওয়া গেল পুনঃ পুনঃ তাহা ভোগ করা।

সাধন—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগিলেও ঔষধ গেলার মত করিলে ক্রমে রুচি জন্মে। নামে অরুচি হইলে নামই তাহার ঔষধ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিয়া একঘণ্টা প্রাণায়াম ও নাম করিবে। পরে একঘণ্টা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, পরে বৃক্ষ, লতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের সেবা, অর্থাৎ বৃক্ষে জলসেচন ও প্রাণীদিগকে কিছু কিছু আহার দেওয়া, গৃহকর্ম্ম দেখা ও করা, নিকটে দুঃখালোক আসিলে তাহাদের তত্ত্বাবধান করা।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্তরে ভগবানের নাম করিবে, রাস্তার মাটির দিকে চাহিয়া চলিবে, এবং কর ধরিয়া নাম করিবে, ইহাতে মনোযোগ বাড়ে।

শিষ্যের প্রতি—শ্বাস প্রশ্বাসে নাম সাধন করিবে। ইহাই অজপা সাধন।

(ক) বিধি—(১) সত্যকথা বলিবে, দলাদলি ছাড়িয়া সত্যনিষ্ঠ হইবে। (২) পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। দোষের কথা বলিলেই নিন্দা হয় না, অন্যকে ছোট করার চেষ্টাই পরনিন্দা। (৩) সর্ব্বজীবে দয়া,—অর্থাৎ অন্যের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া। সকলের সেবা করিতে

করিতে দয়া জন্মে। বৃক্ষে জল সেচন বৃক্ষেসেবা। (৪) পিতা মাতার সেবা করিবে। (৫) সাধুকে ভক্তি করিবে। যিনি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, তিনিই সাধু। আপনার বিশ্বাস স্থির রাখিয়া সাধুসঙ্গ করিবে।

(খ) নিষিদ্ধ—(১) অন্যের উচ্ছিষ্ঠ খাইবে না। (২) মাদক সেবন করিবে না। (৩) মাংস খাইবে না।

বাগদ্বার রক্ষা—যে ব্যক্তি সত্য-ব্রত, মিষ্টভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করে তাহার বাগ্‌দ্বার সুরক্ষিত হয়।

সত্যবাদী হইবে—সত্যবাক্য বলিবে, সত্যচিন্তা করিবে, সত্য কার্য্য করিবে; অসার বৃথা কল্পনা করিবে না, বৃথাকথা কহিবে না।

পরনিন্দা—পরনিন্দা করিবে না, পরনিন্দা শুনিবে না, যেখানে পরনিন্দা হয় সেখানে থাকিবে না। পরের দোষ কখনই দেখিবে না; সর্ব্বদাই নিজের দোষ দেখিবে। নিজের মধ্যে যাহা লুক্কায়িত আছে তাহা অন্বেষণ করিয়া নিজের দোষ দেখিতে পাইলে পরের নিন্দায় প্রবৃত্তি হয় না। পরের দোষ দর্শনে ইচ্ছা হয় না।

পরনিন্দা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু গুণ আছে। দোষের অংশ পরিত্যাগ করিয়া গুণের অংশ গ্রহণ করিবে। তাহাতে হৃদয় পরিশুদ্ধ হইবে। নিন্দনায় বিষয় গ্রহণ করিলে এবং তাহা আলোচনা করিলে আত্মা অত্যন্ত মলিন হইয়া যায়। যাহার যে দোষের জন্য নিন্দা করা যায় সেই দোষ ক্রমে নিন্দকের মধ্যে আসিয়া পড়ে। অন্যকে অপরের কাছে হেয় করিবার জন্য কোন কথা বা ভাব প্রকাশ করার নামই নিন্দা। ইহা সত্যকথা হইলেও নিন্দা হইবে। যাহা পরের উপকারার্থে করা যায় তাহা নিন্দা নহে। যেমন পিতা পুত্রের উপকারের জন্য তাহার মন্দ বিষয় বলেন। নিজে রাগ করিয়া কোন কথা 'বলিলে

তাহাতে পরের উপকার হয় না। বলিতে হইলে কেবল উপকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বলিতে হইবে।

মানুষের সহস্র দোষ থাকা কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে যে টুকু গুণ আছে তাহা ধরিয়া তাহার প্রশংসা করিতে হইবে। সরল হৃদয়ে লোকের প্রশংসা করিলে ঈশ্বরোপাসনার কাজ হয়। গুণকীর্ত্তনে নিজের পাপতাপ পলায়ন করে। শান্তি আনন্দ আগমন করে। নিন্দা করিলে নিজের সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া নরক ভোগ হয়।

হিংসা—অহিংসা পরমধর্ম্ম, হিংসা অর্থ হননের ইচ্ছা। হনন অর্থে আঘাত বুঝায়। কোন ব্যক্তির প্রাণে আঘাত না লাগে এরূপভাবে চলিতে হইবে। কাম ক্রোধও হিংসার ন্যায় অপকার করে না।

অন্তঃকরণ হইতে হিংসা নষ্ট হইলে হাজার হাজার ছারপোকা প্রভৃতির মধ্যে থাকিলেও (যদি সরল মনে তাহাদিগকে দয়া করা যায়) তাহারা দংশন করিবে না। মনে একটু হিংসা থাকিলে দংশন করিবে।

সাধুগণ অরণ্যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের মন্ত্র তন্ত্র কি বুজ্‌রুকি নাই কেবল অহিংসাই কারণ। মনে কিছু মাত্র হিংসা না থাকিলে ব্যাঘ্রাদিও আপন হইয়া যায়।

ক্রোধ—ক্রোধ উপস্থিত হইলে কথা না বলিতে চেষ্টা করিবে। যাহার প্রতি ক্রোধ হইতেছে, তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবে। কেহ কোন কথা বলিলে অথবা অন্য কারণে ক্রোধ সঞ্চারের লক্ষণ বুঝিতে পারিলে নির্জ্জনে বসিয়া নাম করিবে।

অভিমান—প্রশ্ন ;—অভিমান নষ্ট হয় কিসে? উত্তর ;—নিজেকে সকলের অপেক্ষা হীন জানিতে পারিলে। যতদিন পর্য্যন্ত নিজেকে কাঙ্গাল করিতে না পারিবে ততদিন কিছুই হইল না। মুটে মজুর, ভাল মন্দ সকলকেই ভক্তি করিতে হইবে। সকলের নিকট নিজেকে ছোট মনে

করিতে হইবে। অভিমানের ভাব অনুমাত্র মনে প্রবেশ করিলে বড় বড় যোগীরও পতন হয়। অভিমান ভয়ানক শত্রু। কাম ছাড়িব, ক্রোধ ছাড়িব, লোকে সাধু বলিবে এ অভিমান সকলের অপেক্ষা শত্রু।

যতদিন ইন্দ্রিয় জয় না হয় ততদিন অভিমানে কি অনিষ্ট করে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয় দমন হইলেই বুঝা যায় অভিমান কত অনিষ্ট করে। ইন্দ্রিয় দমন না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই হইল না জানিবে। ইন্দ্রিয় দমন না করা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হয় না।

জাতি নাশ—হিংসা, মান, লজ্জা ইত্যাদি যতদিন আছে ততদিন কোন প্রকারেই মানুষ জাতি অতিক্রম করিতে পারে না। যার তার হাতে খাইলেই যে জাতি যায় তাহা নয়।

বিভিন্ন পথ—সম্মুখ যুদ্ধ কয় জনে করিতে পারে? যাহারা না পারে তাহারা অবশ্য অন্য উপায় অবলম্বন করিবে। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম করা উচিত মানুষ বলে বটে, কিন্তু যিনি তাহা না পারেন, যিনি নিজেকে দুর্ব্বল মনে করেন তিনি যে অবস্থায় যথায় যাইয়া ধর্ম্ম লাভ করিতে পারেন তাহাই করিবেন। সকলকেই যে এক পথে চলিতে হইবে তাহা নয়।

বিচার—বিচার বিহীন কখনই হইবে না। দয়াতেও বিচার চাই। যতটুকু সাধ্য ও কর্ত্তব্য ততটুকু মাত্র দয়া করিবে। অতিরিক্ত দয়া করিয়া অনেক বড় বড় সাধু মারা গিয়াছেন। দয়া করিতে যোগীদের খুব বিচার করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁহারা বিষম বিপদে পতিত হইবেন। যোগী যখন দেখিবেন এই ব্যক্তিকে এই পরিমাণে দয়া করিলে প্রকৃত উপকার হইবে তখনই তিনি দয়া করিবেন।

ভগবদিচ্ছা—অনেক সময় নিজের শক্তি দেখিয়া মনে হয় উহা কিছুই নহে। যখন যাহা প্রয়োজন ভগবৎ ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। যদি যথার্থ শিশুর মত থাকিতে পারি তাহা হইলে মাতা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাঁখেন।

আমার নিজের জীবন আলোচনা করিয়া দেখি আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করি নাই। টোলে পড়িতাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম, হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিলাম, অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হইলাম। পরে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম, প্রচার করিলাম, চিকিৎসা করিলাম, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় নাই।

যখন চিকিৎসা করিতাম মনে হইত এই ঔষধ দিলে ঐ রোগের উপশম হইবে। ক্রমে দেখি তাহা হয় না, এইরূপ দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম ঔষধ কিছু নহে, ভগবানের কৃপা চাই। প্রচার করিতে গেলাম, প্রথম প্রথম যেখানে যাইতাম সমস্ত লোক একমনে শুনিত, সাহায্য করিত, ক্রমে দেখি লোকের সে ভাব নাই; আর আমার কথায় কিছু হয় না। তখন বুঝিলাম আমার শাস্ত্রজ্ঞান ও বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নয়; ভগবৎ কৃপাই সার। এইরূপে আঘাত খাইয়া খাইয়া এখন বুঝিয়াছি আমি কিছুই নয়, অসারের অসার, ভগবানই সর্ব্বময়, ঐহিক পারত্রিক বিধাতা।

লোকালয়ে থাকিয়া ভগবৎ ইচ্ছার অধীন হওয়া অতিশয় কষ্টকর; এজন্য পাহাড়ে গিয়া থাকিতে পারি কি না প্রার্থনা করিলাম। উত্তর পাইলাম;—"দত্ত বস্তুতে দাতার কোন অধিকার নাই; পাহাড়ে যাওয়া কি নগরে থাকা ইহা যখন তুমি ভাব, তখন আমাকে আত্মদান কর নাই।" পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলে এক মাস পরে উত্তর পাইলাম, "পুনর্ব্বার তোকে গ্রহণ করিলাম, সাবধান, লুকোচুরি করিয়া ধর্ম্ম হয় না; আমার বস্তু আগুনে ফেলিব, সুখে রাখিব, দুঃখে রাখিব।"

নিজে কিছুই স্থির করিতে নাই। ভগবৎ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। নিজের হাতে ভার লইলেই কষ্ট। যে

ঘটনা ভগবৎ ইচ্ছায় হয় সে ঘটনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভগবান যখন যে ভাবে রাখেন তাহাতেই আনন্দ করিতে হইবে। আমার নিজের পছন্দ করিবার কিছুই নাই। প্রভু, কাষ্ঠের পুত্তলী যেমন কুহকে নাচায় আমাকে সেইরূপ কর। তুমিই জীবনের আধার।

সাধন ও কৃপা—কৃপার কথা অনেক পরে। যতক্ষণ আপনার মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ এ সমস্ত আছে ততক্ষণ নিজের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। এই চেষ্টার নামই সাধন। আমি পারি না এ সকল কথা কেবল ভাবুকতা মাত্র।

চতুরঙ্গ সাধন—প্রথম স্বাধ্যায় অর্থাৎ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও নাম জপ, দ্বিতীয় সৎসঙ্গ, তৃতীয় বিচার অর্থাৎ সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা। আত্মপ্রশংসা ভাল লাগে কি বিষবৎ বোধ হয়, পরনিন্দা প্রীতিকর কি অপ্রীতিকর বোধ হয়, অন্তরে ধর্ম্মভাবের প্রতিদিন হ্রাস কি বৃদ্ধি হইতেছে এই বিচার সর্ব্বদা প্রয়োজন। চতুর্থ দান। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন দান শব্দের অর্থ দয়া, কাহারও প্রাণে কোনরূপ ক্লেশ না দেওয়া। শরীর দ্বারা, বাক্য দ্বারা, বা অপর কোন উপায়ে কাহারও প্রাণে ক্লেশ দিলে দয়া হয় না। বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি সর্ব্বজীবে দয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সাধকের প্রতিদিন এই চতুরঙ্গ সাধন বিধেয়। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে তপস্যা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের শাসন অভ্যাস প্রয়োজন বলিয়াছেন।

ভিতরে প্রবেশ—শরীরের প্রধান যন্ত্র জিহ্বা। জিহ্বাকে বশে রাখিলে সমস্তই বশ হয়। যতদিন চক্ষু, কর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ বহির্ব্বিষয়ে আকৃষ্ট হয় ততদিন শরীর ছাড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ভিতরে প্রবেশ না করিলে কিছুতেই শরীর ভুলিতে পারা যায় না। কোন উপায়ে একবার ভগবানকে দর্শন করিলে তখন শরীরের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, সহজেই

শরীর বিস্মৃত হওয়া যায়। কিন্তু এ অবস্থা সকলের ঘটে না। এ জন্য কাহাকেও ভালবাসিতে হইবে। ভালবাসা অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ হইবে। এই ভালবাসা লাভ করিবার জন্য অহিংসা অভ্যাস করিতে হইবে। কাহাকেও কষ্ট দিব না, কেহ আমাকে প্রহার করিলে, গালি দিলে, এমন কি সর্ব্বনাশ করিলেও তাহার অমঙ্গল কামনা করিব না, কায়মনোবাক্যে ইহা অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে দ্বেষ, হিংসা নষ্ট হইলে প্রাণে ভালবাসা আসে। সেই ভালবাসাকে কোন স্থানে অর্পণ করিয়া, তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত বিস্মৃত হওয়া যায়। এই অবস্থা হইলে সহজে ভগবানকে লাভ করা যায়। একটি মনুষ্যকে বিশেষ রূপে ভালবাসা ধর্ম্ম সাধনের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ।

সেবা—যেমন নিজের প্রয়োজন হইলে তাহা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় তেমনি অন্যের প্রয়োজনে ব্যাকুলতা জন্মিলে সেবা। মা শিশুর সেবা করেন এই ভাবে। শিশুর অভাব পূর্ণ করিতে মাতা অস্থির ইহারই নাম সেবা। ভিতরে অনুরাগ নাই দেখাদেখি সাহায্য করার নাম সেবা নয়।

বৃক্ষসেবা, পশুপক্ষীসেবা, পিতামাতার সেবা, পতিসেবা, সন্তানসেবা, প্রভুসেবা, রাজসেবা, ভৃত্যসেবা, পত্নীসেবা এই ভাবে করিলেই সেবা; নতুবা সেবা নাম করা উচিত নয়। অহঙ্কার নষ্ট করিবার উপায় জীবের সেবা। পশু পক্ষীরও পায়ে নমস্কার করিতে হইবে। এমন কি বিষ্ঠার পোকাকেও ঘৃণা করিবে না। যেমন নক্ষত্র ছুটিয়া পড়ে, তেমনি অহঙ্কারে যোগীদেরও হঠাৎ পতন হয়।

জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভক্তকে সেবা করিবে। পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে। স্ত্রীকে ভগবানের জ্ঞান শক্তিরূপে, শ্রদ্ধা করিবে, ভরণ পোষণ করিবে, রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। যে ব্যক্তি

পত্নীকে সাক্ষাৎ দেবীরূপে না দেখে, তাহার গৃহের শান্তি ও মঙ্গল হয় না। স্ত্রীকে বিলাসের সামগ্রী কিম্বা দাসী বলিয়া মনে করিবে না।

সর্ব্বজীবে দয়া করিবে। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানব সকলকে দয়া করিবে, কাহারও মনে ক্লেশ দিবে না।

অতিথি সৎকার করিবে। অতিথির নাম ধাম কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। অতিথিকে গুরু ও দেবতা জ্ঞানে যথাসাধ্য পূজা করিবে।

একজনের প্রণাম গ্রহণ করিয়াও তাহার সেবা করা যায়। ইহা কিরূপে হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিলেন "যে প্রণাম করে সে নিশ্চয়ই ভক্তিভাবে করিয়া থাকে। তাহাকে প্রণাম করিতে বাধা দিলে তাহার ভক্তি শুকাইয়া যায় এবং প্রাণে ক্লেশ জন্মে। এইরূপ কঠোর ব্যবহারে নিজেরও ক্ষতি হয়। জয়গুরু বলিয়া তাহার প্রণাম ভগবানে অর্পণ করিলে নিজের প্রাণ সরস, আর প্রণামকারীর ভক্তি বৃদ্ধিরও সহায়তা হয়। ইহাই একজনের প্রণাম গ্রহণে তাহার সেবা।"

অর্থ—অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রয়োজন মত ব্যয় করিবে, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে করিবে। যদি তিনি লোক পাঠান অর্থাৎ কেহ অভাবে বা বিপদে পড়িয়া আসে তবে তাহাকে দিবে। যাহারা ধনী হইতে ইচ্ছা করে তাহাদের কথা ভিন্ন, যাহারা ধর্ম্মলাভের ইচ্ছুক তাহাদের কোন মতে দিন কাটিলেই হয়।

সংসারের হিসাবে যাহারা টাকা দেখে তাহারা তোমাদিগকে মন্দ বলিবে। ভগবানে নির্ভর করিয়া চল। তাহাতে ভয় নাই। তিনি যদি আহার না দিয়া মারিয়া ফেলেন তাহাও ভাল। তাহাতে ভয় নাই। তথাপি সংসারকে সার ভাবিবে না। লোকের কথা শুনিলে কষ্ট পাইবে। যদি সংসারে আসিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাও সম্পূর্ণ ঈশ্বরে নির্ভর কর। লোকের নিন্দা প্রশংসা শুনিও না।

রিপু—রিপু কি ? কাম ক্রোধ অধর্ম্ম নহে ; তাহা হইলে উহা মনুষ্যের আত্মার প্রকৃতি-মধ্যে থাকিত না। কাম ক্রোধের অবৈধ ব্যবহারই পাপ। যাহার প্রকৃতি যেরূপ সে তদনুরূপ কার্য্য করে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির তিনটি অবস্থা। এই তিন অবস্থা যত দিন থাকিবে, তাহার সহিত সংগ্রাম হইবে। কাম, ক্রোধ যদি বৈধভাবে চালিত হয় তাহা অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে, তাহাতে শত শত নরহত্যা হয়, তথাপি তাহা অধর্ম্ম নহে।

যত দিন কাম ক্রোধ থাকিবে, সময় সময় মনে উপস্থিত হইবে। উপস্থিত হইলে যদি নিবারণের চেষ্টা করি তবে পাপ হয় না। তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দে যোগ দেওয়াই পাপ। সংগ্রাম করিতে গিয়া পরাস্ত হই, তাহাও অপরাধ নহে। যতদিন ত্রিগুণের অধীন থাকিব, ততদিন গুণ অনুসারে আমাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে।

যদি ভগবৎ নাম অবলম্বন থাকে, ক্রমে ত্রিগুণ নষ্ট হইয়া শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

সাধু—যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে হৃদয়নিহিত ধর্ম্মভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয়, আপনা হইতে ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারিত হয় এবং পাপমতি সকল লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে তিনিই সাধু।

দান—যে সর্ব্বদা যাচ্ঞা করে, খোসামোদ করে, সে দানের পাত্র নহে। ভয়, স্নেহ, লজ্জা, মান, বংশমর্য্যাদা, প্রত্যুপকারপ্রত্যাশা, স্বর্গকামনা, পাপমোচন, পরকালের জন্য দান প্রকৃত দান নহে। যেমন পিপাসা হইলে অতি ব্যগ্রতার সহিত লোকে জলপান করে, সেইরূপ প্রকৃত দাতা দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে ব্যগ্র হন।

দেহরথ—রথ মনুষ্য দেহ, ইহার তিন তালা ; উপরতালায় সহস্র পদ্মে শ্রীশ্রীবামন দেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন, মধ্য তালায় সমস্ত

দেবদেবী এক এক পদ্মে ও কুটীরে বিরাজ করেন, নীচের তালায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপুগণ তাহাদের পরিবারগণের সহিত বাস করে। বামনদেব রথে উঠিবামাত্র চারিদিকে শঙ্খ,ঘণ্টা বাজিতে থাকে; নীচের তালায় সিঁড়ি পড়ে, চারিদিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ভিড় করেন। কাম, ক্রোধগণ সপরিবারে পলায়ন করে। তখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগাছি প্রকাণ্ড কাছি বাঁধিয়া রথ টানা হয়। সুখদুঃখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুরমন্দিরের নিকটস্থ হইলে কাছি খসিয়া যায়।

বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া কাহার নিকট এ তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন ইহা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বের পঞ্চ শিষ্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তখন তাঁহাদের নিকট গিয়া সমস্ত তত্ত্ব বর্ণন করিলেন। নিজের শরীর রথ, আর তাহাতে দেবতা ও কন্দর্পের প্রকাশ ও পরে ব্রহ্মলাভ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করাইলেন। বৌদ্ধগণ এই বিবরণ বলিয়া থাকেন। এই হইতে বৌদ্ধমন্দিরে রথযাত্রার আরম্ভ।

সাধকের ত্রিবিধ অবস্থা—প্রত্যেক সাধককে তিনটী অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান। প্রথম অবস্থায় মনুষ্য সমস্তই ব্রহ্মময় দর্শন করে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা চালিত হইতে থাকে, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই শক্তিদ্বারা চালিত হইতেছে, ইহা দেখিতে পায়। ইহার পর ভগবদ্দর্শনের অবস্থা। ব্রহ্মের লীলা দর্শন।

প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব, দ্বিতীয় অবস্থায় যোগ, আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ লাভ, তৃতীয় অবস্থায় ভগবৎ সম্বন্ধ, পূজা অর্চ্চনা। এই অবস্থায় তাঁহার রূপ দর্শন হয়। সেই রূপ সৎ, চিৎ, আনন্দ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা—ভগবান আমাদের হইতে দূরে আছেন তাহা নহে, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কাছে। সাধন দ্বারা বর্ত্তমান পাপরাশি

জ্বলিয়া গেলেই তাঁহার দর্শন লাভ করা যায়। তখন যেন সম্মুখে এক-খানি আরসির মত প্রকাশিত হয়। আর তাহাতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—ধূলি হইতে সৌরজগৎ পর্য্যন্ত—প্রত্যক্ষ হয়। মানুষের পাপপুণ্য প্রকাশিত হয়, গ্রহ উপগ্রহ সমস্ত স্পষ্টভাবে দৃষ্টীভূত হয়। অবশেষে রাসলীলা দর্শন। তখনই মনুষ্যজন্ম সফল হয়। মনুষ্য যতই কেন উন্নত হউক না একেবারে ভগবানের সহিত মিশিয়া যায় না। একটী পরমাণু যদি সমুদ্রগর্ভে সমুদ্রবারি মাপিবার জন্য অহঙ্কার করিয়া ডুব দেয়, এবং যদি তাহার পৃথকভাব থাকে তাহা হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা মানবাত্মারও ভগবানের চিদানন্দ সাগরে ডুবিলে সেইরূপ অবস্থা হয়। অন্য লোকে মনে ভাবে সে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু তখনও তাহার নিজের পার্থক্য বোধ থাকে। তখনও সে ভগবানের রাসলীলা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে থাকে, এবং ধন্য হয়। যখন জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে তখন সে মধুর সাগরে, চিনির সাগরে ডুবিয়া থাকে। ইহাও কেবল কাল্পনিক কথা, কেননা সে আনন্দের তুলনা নাই। তখন জীবাত্মা যেন আনন্দে একেবারেই বিহ্বল হইয়া পড়ে; মনে হয় কেমনে এ আনন্দে আসিলাম। মধুরং মধুরং।

ভক্তিরস—যখন আমাদের ক্রোধ হয় তখন মস্তিষ্কের কোন বিশেষ স্থানে রক্তের চালনা হয়, সেই রক্ত গরম ও অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আনন্দের সময়ও তদ্রূপ রক্তেরই ক্রিয়া হয়। মস্তিষ্কের কোন স্থানে রক্তের গতিতে আনন্দ হয়। কাম ইত্যাদি সকল বিষয়ই এই প্রকার মস্তিষ্কের কোন কোন বিশেষ বিশেষ স্থানে রক্তের ক্রিয়া বিশেষের ফলমাত্র।

যেরূপ ক্রোধকালে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত একপ্রকার ভিন্ন অবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভক্তিতেও মস্তিষ্কের কোন বিশেষ

স্থান হইতে রক্ত ভিন্নভাব লাভ করিয়া শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। মস্তিষ্কে যে রক্ত ভক্তির ক্রিয়া করে তাহা অত্যন্ত গরম হইলে (সামান্য ভক্তিতে হয় না) ঐ রক্ত হইতে চুয়াইয়া একপ্রকার রস নির্গত হয়। তাহার দু'চারি ফোটা পড়িলেই তাহা পান করিয়া ৫।৭ দিন অনায়াসে থাকা যায়। ঐ রসের মাদকতা শক্তি এত যে তাহা বলা যায় না। এই অমৃত খাইয়া লোক চেতনাহীন অর্থাৎ অচলশরীর হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও জ্ঞানের হ্রাস হয় না, পূর্ণরূপে থাকে। ভক্তির ভাব অনুসারে উহার ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ হইয়া থাকে। আমি ত দেখিতেছি উহাতে কোন অনিষ্টই হয় না, বরং শরীর খুব ভাল থাকে। ৫।৭ ঘণ্টা আহার না করিলেও কোন অনিষ্ট বোধ হয় না, শরীর খুব সরস থাকে। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করাই একমাত্র উপায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম করিতে পারিলে সব বিষয় ক্রমে হইয়া আসে।

ভক্তি সাধ্য সাধনায় হয় না, যার হয় সেই ধন্য। ভক্তিতে বিচার নাই। পুত্র ধূলিমাখা থাক্ আর পরিষ্কার থাক্, পিতা অমনি তাকে কোলে তুলে নেন। পুত্র হওয়ার পূর্ব্বে অপত্য-স্নেহ কেমন কেহই বুঝে না। ভক্তি অহেতুকী, ভালমন্দ বিচার করে না।

ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য তিনজন বৃদ্ধ ছিলেন। ভক্তিদেবী বৃন্দাবনে যাইয়া যুবতী হইলেন, জ্ঞান, বৈরাগ্য বৃদ্ধই রহিলেন।

ভক্তিকে কৃপণের ধনের ন্যায় গোপনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্র-কারেরা যুবতীর স্তনের সহিত উহার তুলনা করিয়া থাকেন। বালিকা মুক্তদেহে ঘুরিয়া বেড়ায়, যুবতী হইলে স্তন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে। স্বামী ব্যতীত পিতা, মাতা, গুরুজন কেহ তাহা দেখিতে পায় না। ভক্তিও তদ্রূপ। ভগবান ব্যতীত সকলেরই নিকট সন্তর্পণে গোপনে রক্ষণীয়া। প্রথম যখন ভাবের উচ্ছ্বাসের আরম্ভ হইল, একটু চক্ষু

দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তখন ভাবিতাম লোকে দেখুক। পরে দেখি ইহা কি করিয়া গোপন করিব। তখন ইহা হৃদয়ের নিভৃত স্থানে গোপন করিতে ইচ্ছা হইল ; ভক্তি গোপনীয়া।

অভক্তও যদি দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া ভগবৎ চরণে পড়িয়া থাকে ভক্তি দেবী অবশ্যই কৃপা করেন। কিন্তু আমি ভক্ত, এই অভিমান যেখানে তথায় ভক্তিদেবী গমন করেন না। ভক্তি অর্থ যাহার দ্বারা ভজন হয়। সাধকগণ ভক্তিকে বৈধী ও অহে-তুকী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈধী ভক্তি চারি প্রকারে লাভ হয়। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানীগণ বৈধী ভক্তি লাভ করেন। প্রাণে অবিশ্বাস, অভক্তি, শুষ্কতা, পাপ তাপ থাকিলেও করযোড়ে নাম লইতে হইবে। ভক্তির সহিত নাম করিলে পাতকীরও উদ্ধার হয়।

শুষ্কতা কি অবিশ্বাসের সময় নাম লইলে তাহা বৃথা যায় না। ঔষধ তিক্ত, তাহা বিরক্তির সহিত সেবন করিলেও রোগের শান্তি হয়। তেমনি নামে পাতকীর উদ্ধার হয়। ইহা বস্তুগুণ। বস্তুগুণ যুক্তির অপেক্ষা করেনা। অগ্নিতে হাত দিলে পুড়িবেই। যাহার একটুও ভক্তি আছ সে যদি অভ-ক্তির সহিত নাম করে তবে সে ভক্তি টুকুও শুকাইয়া যায়। অতএব ভক্তির সহিত নাম করিবে।

স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ—সম্বন্ধ দুই প্রকার—দৈহিক ও আত্মিক। আত্মিক সম্বন্ধ সহজে হয় না। শোক মোহ দৈহিক সম্বন্ধজনিত। দৈহিক শোক, মোহ অনিত্য, অস্থায়ী। দূরে থাকিলেও যদি উভয়ের মধ্যে একটী প্রেমের বন্ধন থাকে, তাহাতে সর্ব্বদা মিলিত মনে হয়।

স্ত্রীপুরুষের ভগবৎ লক্ষ্য হইলে ইহারা সতী ও সৎ হয়। আত্মিক সম্বন্ধ অতি বিরল। যদি উভয় আত্মার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবেই আত্মিক সম্বন্ধ দাঁড়ায়, যেমন ভক্তে ভক্তে।

সাধনের **প্রশস্ত সময়**—মহাপুরুষেরা রাত্রি ১॥০ টার সময় বাহির হন এবং ৪টা পর্য্যন্ত থাকেন। এই সময় রাত্রি জাগা অভ্যাস করা উচিত। এই সময় ধ্যানের প্রশস্ত সময়। দুই একবার প্রাণায়াম করিয়া নাম করিবে। কোন স্থানে বসিয়া, কি মশারীর মধ্যে বসিয়া করিলেও হয়। নাম করার সময় মহাপুরুষেরা কাছে আসিয়া দাঁড়ান এবং সাহায্য করেন। যাঁহারা এইরূপ সাধন করেন তাঁহারা হয়ত কেহ বা গন্ধ কেহ বা স্পর্শাদি এক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করেন। আর যাহারা কুকাজ করে তাহাদের নিকট হইতে মহাপুরুষেরা চলিয়া যান। যাহারা নিদ্রা যায় তাহাদের নিকট হইতেও প্রস্থান করেন। নিদ্রা যাইতে যাইতে তমোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তমোগুণে অহঙ্কার আনয়ন করে। অহঙ্কার সকলই নষ্ট করে।

মাদক সাধনের সহায় নহে—সাধনার্থীর মাদক সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মাদক সেবনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোথাও নাই। যাঁহারা পাহাড়ে পর্ব্বতে সর্ব্বদা ঘুরিয়া সাধনাদি করেন তাঁহাদের অনেক শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। শীত উষ্ণাদি)সহ্য করার জন্য তাঁহাদের মাদকের আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা শরীরের জন্যই মাত্র, উহাতে সাধনের কোন প্রকার সাহায্যই হয় না, বরং ভয়ানক অনিষ্ট হয়, নানাপ্রকার কল্পনা আসে। যাঁহারা শরীরের জন্য মাদক ব্যবহার করেন, কার্য্যসিদ্ধি হইলে তাঁহারা উহাকে ঔষধের মত পরিত্যাগ করেন।

প্রত্যাদেশ—প্রকৃত প্রত্যাদেশ ভগবৎ আদেশ। বিশেষ চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগবৎ আদেশ শুনা যায় না। ভগবৎ আদেশ বিবেক নহে, মনের ভাব নহে ; ভগবৎ আদেশ আত্মাতে শ্রবণ করা যায়। প্রকৃত প্রত্যাদেশ জীবনে দুই একটীর অধিক হয় না।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম বুদ্ধদেব ইহা শুনাইয়া জগতকে জাগ্রত করিয়া

ছেন। শ্রীচৈতন্য জীবে দয়া, নামে ভক্তি ইহা শুনাইয়া জগৎকে মত্ত করিয়াছেন। খৃষ্ট ভগবৎ সেবাতে জীব উদ্ধার হয়, একজন দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, শুনাইয়াছেন। এইরূপ যিনি যে প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন তাহা গৃহের কোণে লুক্কায়িত থাকে না। তাহা জগৎময় ব্যাপ্ত হয়। ঋষিগণ যে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছিলেন তাহাই উপনিষদরূপে বর্ত্তমান। প্রত্যাদেশ সত্য, পতিতপাবন, জ্বলন্ত, উৎসাহপূর্ণ, মধুর; তাহার সহিত কাহারও অনৈক্য হয় না।

মায়া—বাস্তবিক মায়া কি? যদি বল সংসারে পরমসুখে আছি, ইহা ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তবে বলি সংসারে কে তোমাকে ভালবাসে? একটু বিচার করিয়া দেখ। অধিকাংশ স্থানে ভয়ানক প্রতারণা। কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে কৃত্রিম প্রণয় দেখাইয়া অন্যকে ভালবাসিতেছে, কোন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা করিয়া অন্য নারীতে আসক্ত, কোন স্থানে পুত্র পিতাকে বধ করিয়া বিষয় লইতেছে, কোন স্থানে পিতা পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া অন্যকে সুখী করিতেছে। তবে সংসারে মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যে কিছু কিছু ভালবাসা ও ভক্তি দেখা যায়। যেখানে অর্থের সম্বন্ধ সেখানে যথার্থ ভালবাসা দুর্ল্লভ। বস্তুতঃ ধনীদিগের ন্যায় যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল।

যাঁহাদের ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই এরূপ লোক যদি সংসারে থাকেন তাঁহারাই সুখী। তাঁহাদের সংসার সংসার নহে স্বর্গ, আর সকলই অসারের অসার। এক হরিনাম ভিন্ন সহজ সুখের বস্তু আর কিছুই নয়। যথার্থ ভালবাসা হইলে মায়া হয়। সে ভালবাসা কোথায়? বিচার করিয়া দেখিলে সংসার অসারই বোধ হইবে। প্রকৃত মায়া হরিনামে। সংসারের কোন্ সুখের জন্য মায়া হইবে?

শক্তিসঞ্চার—ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে; একটী মহা-

পুরুষের প্রবল শক্তি দ্বারা সেই শক্তিকে (যাহাকে পরমাত্মা বা কুলকুণ্ড-লিনী বলে) জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তিসঞ্চার বলে। ঐ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। শক্তিসঞ্চার দ্বারা জাগরিত করিলেও পুনরায় উহা নিদ্রিত হইতে চেষ্টা করে। যাঁহারা অনবরত শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিয়া উহাকে আর ঘুমাইতে দেন না তাঁহাদের শক্তি বেশ খেলিতে থাকে।

পরলোক—মানুষ যতদিন জীবিত থাকে পরলোক জানিতে ব্যাকুল হয়, পরলোকের কথা বলে ও শুনে। কিন্তু মরিয়া গেলে বন্ধুদের নিকট আসিয়া কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে না। ইহাতেই এই সিদ্ধান্ত হয় পরলোক সকলের পক্ষে একরূপ নয়। যিনি সকাম কর্ম্মী তাঁর পরলোক এক প্রকার, যিনি নিষ্কাম কর্ম্মী তাঁর অন্যরূপ। পাপীদের প্রবৃত্তি অনুসারে পরলোকের অবস্থা নানা প্রকার। এজন্য যাঁহারা পরলোকে তাঁহারা সক্ষম হইলেও পৃথিবীর লোকদিগকে তাহা বলা অপ্রয়োজন মনে করেন। বলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। তপস্যা দ্বারা আত্মা যতই নির্ম্মল হইবে পরলোক ততই নিকটে মনে হইবে, শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে।

অদ্বৈতবাদ—অদ্বৈতবাদ আত্মার এক প্রকার অবস্থা। জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন হইলে আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। আত্মা তখন যাহা দেখেন কেবল ব্রহ্ম সত্তাই দেখেন। অনন্ত সাগরে একটী জলকণা প্রবেশের ন্যায় চারিদিকে সমুদ্রের হিল্লোলে কল্লোল দেখা। আত্মা কখন ডোবেন কখন ভাসেন কিন্তু তবু আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহারই জন্য ঋষি মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিতেন। ইহাই পরম সম্পদ।

চকমকির পাথর—যাহারা সাধুর নিকট উপদেশ শুনিয়া উপদেশ মত কার্য্য করে না তাহারা চকমকির পাথরের মত। চকমকির পাথর জলের

মধ্যে ফেলিয়া রাখ অথবা প্রতিদিন সহস্র কলসী জল তাহাতে ঢাল তথাপি যখনই ঠুকিবে আগুণ বাহির হইবে।

মোক্ষদ্বার—মোক্ষের চারি দ্বার—শম, বিচার, সন্তোষ, সৎসঙ্গ। যাহাই ঘটুক তাহাতে অধীর না হওয়া শম লাভের উপায়; নিত্য অনিত্য বিচার; যে দিন যে অবস্থা ঘটে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা, কাহারও মনে উদ্বেগ না জন্মান, কাহারও নিকট প্রত্যাশা না করা এবং ভগবান পালন-কর্ত্তা এই বিশ্বাস রাখা সন্তোষ লাভের উপায়। সৎসঙ্গ অর্থ সাধুত্ব লাভ।

শিষ্য ও অপর—(শিষ্যগণের প্রতি) আমার এখানে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদিগকে আর কেহই কিছু বলিবে না। অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা অনিষ্ট হয়। আমার এখানে তোমাদের কোন অধিকার নাই। তোমাদের যেমন অধিকার তেমনই সমস্ত নর নারীর; আমাকে একটু সেবা শুশ্রূষা কর বলিয়া তোমরা আপনার, আর সকলে পর ইহা কখনও ভাবিও না।

অশান্তি—মানুষের অশান্তির মূল কি? উত্তর;—মানুষের সকল অশান্তিই ধৈর্য্যের অভাবে। ধৈর্য্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব; চঞ্চলতাই অশান্তির কারণ।

মানুষের লক্ষণ—মানুষের লক্ষণ কি? উত্তর;—মানুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যখনই যাহা করিবে সুন্দর রূপে বিচার পূর্ব্বক করিবে। হঠাৎ কোন কার্য্যই করিবে না। সকল বিষয় খুব ধৈর্য্য ধরিয়া বিচার পূর্ব্বক করাই মানুষের ধর্ম্ম। ধৈর্য্যই ধর্ম্ম, উহাই মানুষের মনুষ্যত্ব।

সাধুর লক্ষণ—সাধুর লক্ষণ কি? তাঁহার কর্ত্তব্য কি? উত্তর;—সাধুর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত হইবে তিনি সে সমুদয় ঈশ্বরের নিকট ধরিবেন; পরে যাহাতে ঈশ্বরের জ্যোতি সুস্পষ্ট পড়িয়াছে দেখিবেন

তাহাই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা এই নিয়মে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। সাধু সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া চলিবে।

আদেশ—ঈশ্বরাদেশ কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? উত্তর;—বাল্যকালে একজনের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল, সেই ব্যক্তির সহিত ঘটনাক্রমে বিশ বৎসর দেখা হয় নাই। একদিন হঠাৎ সেই বন্ধু নাম ধরিয়া ডাকিলে তাঁহার স্বর কিরূপে চিনিতে পারি? ইহা যেমন প্রকাশ করিতে পারি না তদ্রূপ ঈশ্বরাদেশ কিরূপে জানা যায় তাহা কেহ বুঝাইতে পারে না।

ভিন্ন ব্যবস্থা—শাস্ত্রে ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে ইহার অর্থ কি? উত্তর;—শিশুর আহার একপ্রকার, বালকের আহার একপ্রকার, যুবার আহার একপ্রকার, বৃদ্ধের আহার একপ্রকার, রোগীর আহার একপ্রকার। প্রত্যেকে আপন আপন আহারে পুষ্টিলাভ করে। এক জনের আহার অন্যকে দিলে তাহার জীবন নষ্ট হয়।

সদ্‌গুরু—সদ্‌গুরু আশ্রয় পাওয়ার অর্থ কি? উত্তর;—ভগবৎশক্তির আশ্রয় পাওয়া।

প্রশ্ন;—যত লোকে সৃষ্টিকাল হইতে সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছে সকলেই কি একই শক্তি পাইয়াছে? উত্তর;—ভগবান এক, সুতরাং তাঁহার শক্তিও এক; প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। একটা ইঞ্জিন, তাহার সহিত শত শত যন্ত্রের যোগ, কেহ করাতের কার্য্য করে কেহ ঢালাই কার্য্য করে। বহির্জগতে এক শক্তি, তাহাতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋতু হইতেছে, বনমধ্যে নানা বৃক্ষে নানাপ্রকার ফুল ফল নানা বর্ণ দিতেছে, জনসমাজে দেশ কাল পাত্রভেদে পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, বীর, দাতা, মূর্খ, রাজা, প্রজা হইতেছে।

প্রশ্ন;—কুলগুরু বলিলে কাহাকে বুঝায়? উত্তর;—কুলগুরু শব্দের অর্থ পৈতৃক গুরু নহেন, যিনি সাধন দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত

করিয়াছেন তাঁহাকে কুলগুরু কহে। শিষ্য এক বৎসর গুরুকে পরীক্ষা করিবেন। কুলগুরু যদি লক্ষণযুক্ত হন তবে তাঁহার নিকট মন্ত্র লইবেন।

কর্ম্ম ;—কর্ম্ম করা বৃথা নয়। প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের নাম করিলে বাসনা নষ্ট হয় ; বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হয়। যাহার কর্ম্ম কাটে নাই সে সমস্ত দিন নাম করিতে পারে না। বৃথা চিন্তায়, পরনিন্দায়, তর্ক বিতর্কে তাহার প্রবৃত্তি হয়। এজন্যই সন্ন্যাসীও তাস দাবা খেলে, বিবাদ করে। কর্ম্ম আছে কিন্তু জোর করিয়া ছাড়িতে চায়। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করাই শ্রেয়। অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম কাটিয়া বাসনাহীন হওয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য অপরাধ। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম শেষ হয়। তখন বিশ্বাসের রাজ্য। তখন শ্রবণ, কীর্ত্তন, সাধন ভজনে মতি হয়। সাধন ভজন করিতে করিতে ভক্তির প্রকাশ হয়। ভক্তিতে হৃদয় ব্যাকুল হইলে বালকবৎ, উন্মাদবৎ অবস্থা, ইহার পরে দর্শন, তৎপরে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি।"

প্রশ্ন ;—কর্ম্ম বিনা অন্য উপায়ে মুক্তি হয় কি না? উত্তর ;—তীব্র বৈরাগ্য দ্বারাও হয়। কিন্তু সেই প্রকার বৈরাগ্য কোথায়? বিষয় হইতে মনকে সম্পূর্ণ ভিতরে আকর্ষণ করিয়া প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম সাধন করিতে পারিলে তদ্দ্বারা হইবে। একটি শ্বাস প্রশ্বাসে নাম না হইলেই গেল। বাসনাবিহীন হইয়া ঐ প্রকার তীব্র সাধন করা সহজ নহে। বৈধ বিচার দ্বারা কর্ম্ম শেষ করিলেই অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে কার্য্যসিদ্ধি হয়।

লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে তাহাতে ক্ষতি হয় না, উপকার হয়। তবে নিজের বিবেক মতে না চলিয়া যদি অপরের মত ও আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করি তাহাতে হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া নিজের বিবেক মত চলিলে বিশেষ উপকার হয়।

প্রশ্ন ;—কর্ম্মত্যাগী কাহাকে বলে? উত্তর ;—স্বার্থত্যাগ করিয়া

যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই কর্ম্মত্যাগী। নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মত্যাগী হওয়া যায়।

প্রশ্ন ;—সিদ্ধ হইলে, নিঃস্বার্থ হইলে আর কি কর্ম্ম থাকে? উত্তর ;—তখনি ত কর্ম্মের আরম্ভ হয়। যতদিন স্বার্থ আছে ততদিন আর কর্ম্ম কোথায়। স্বার্থ গেলেই প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভ হয়। তখন সকল সংসারের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়, সকলের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতে হয়। নিঃস্বার্থ না হইলে কর্ম্মের আরম্ভই হয় না।

প্রশ্ন ;—প্রারব্ধে যাহা আছে তাহা কি না করিয়া পারা যায় না? কর্ম্ম না করিয়া কি থাকা যায় না? উত্তর ;—ভগবান যে কর্ম্মটুকু করাইবেন তাহা কোন প্রকারেই ছাড়াইতে পারিবে না। তবে যাহারা প্রফুল্লমনে কর্ম্ম করিয়া যায় ঝাঁ করিয়া তাহাদের কর্ম্ম শেষ হয়, আর যাহারা বেগারের মত করিয়া যায় অনেক বেশী কর্ম্ম তাদের জড়িয়ে ধরে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শাস্ত্রে দুইটী উপায়—বিচার ও অজপা সাধন বিহিত হইয়াছে। যখন যাহা করিবে বিচারপূর্ব্বক করিবে, স্নানাহারাদি সমস্ত কার্য্যই বিষ্ণু প্রীত্যর্থে নিষ্কাম হইয়া করিবে। বিচারপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য বিষ্ণু প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম্ম শীঘ্র শেষ হয়।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনার বক্তৃতাতে রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, তাহাই কি সত্য? উত্তর ;—হাঁ তাহাই সত্য; ঐরূপ ব্যাখ্যা গোস্বামীদের মতে ব্যাখ্যা। গোস্বামীগণ ভিন্ন অন্যান্য বৈষ্ণবেরা নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া নাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন ;—রাধাকৃষ্ণ সংবাদে রাধা কি জীবাত্মা না আর কিছু? উত্তর ;—এ সকল সংবাদ অতি দুরূহ, এখন বলিলেও তাহা বুঝিতে পারিবে না। অসময়ে বলিলে প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও করিতে পারিবে না।

বিকৃত অর্থ ধরিয়া আত্মা এবং বচনীয় বিষয় দূষিত করিবে। দেখ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্য চরিতামৃত লিখিয়া জীবানন্দ গোস্বামীর নিকট লইয়া যান, কিন্তু জীবানন্দ গোস্বামী মহাশয় তাহা প্রচার করিতে নিষেধ করেন। কারণ তিনি বলেন, "যদিও ইহা দ্বারা ভক্ত বৈষ্ণবদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, তথাপি ইহাদ্বারা জনসমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। অতএব সৰ্ব্বদা নাম সাধন করিতে থাক, সকল ভাব লীলা খুলিয়া যাইবে। চৈতন্য কি খৃষ্ট প্রভৃতি ভগবানের লীলা সকল আপনা আপনি খুলিয়া যাইবে।

সাধন করিতে করিতে পাঁচটী অবস্থা খুলিয়া যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। ধীরে ধীরে সকল অবস্থা লাভ হয়। এ সকল অবস্থা লাভ করিতে হইলে প্রথম কৰ্ম্ম করিতে হয়; কৰ্ম্মে লোভ, মোহাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিষম পরীক্ষায় পতিত হইতে হয়। পরীক্ষায় আক্রান্ত হইয়া কখন জয়, কখন বা পরাজয় হয়। যেমন নদী কি সমুদ্র মধ্যে নাবিক একখানা ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া অগ্রসর হইলে কখন বা উৰ্দ্ধে কখন বা নিম্নে পতিত হয়। পরীক্ষার সময় অনেকে সাধন ভজন একেবারে পরিত্যাগ করে। নানারূপ অবিশ্বাস ও আসক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াই এরূপ করিয়া থাকে। এ সময়ে কেবল নাম উচ্চারণই উদ্ধারের পথ। পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া ক্রমে নিজকে যখন একেবারে হীন জ্ঞান হইবে, নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই, একগাছা তৃণও নিজ শক্তিতে উত্তোলনের সাধ্য নাই বলিয়া মনে হইবে তখনই উন্নতির চিহ্ন দেখা দিবে। ভক্তি তখনই বিকশিত হইতে থাকিবে। যখন মনুষ্যের এরূপ অবস্থা হয় তখন তাহার হৃদয়ে ভগবৎ তত্ত্বের প্রকাশ হয়।

নিরাশা—সাধনের অবস্থায় সময় সময় অত্যন্ত শুষ্কতা ও নিরাশা আসে, ঐ সময় সাধন ভজন ভাল লাগে না। এইরূপ নিরাশা আসে কেন?

উত্তর ;—দেখ এই বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল কেমন ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। অথচ এই গ্রীষ্মকালই প্রকৃতির সমস্ত শোভার মূল। গ্রীষ্মকাল হয় বলিয়াই বর্ষার সুখ আমরা সুন্দর রূপে অনুভব করি। সাধনের সময়ও শুষ্কতার বিশেষ দরকার। সাধনের সময় বিবিধাবস্থা ভোগ করিতে হয় বলিয়াই ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নানা বিচিত্রাবস্থার ভিতর দিয়া যখন ধর্ম্মপর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিবে তখনই চিরশান্তি। ঐ শান্তি একবার লাভ হইলে আর নষ্ট হয় না। নানাপ্রকার নিরাশা ও শুষ্কতা না আসিলে ধর্ম্মের এতটা শোভা হইত না। ধর্ম্মের মূল্য বুঝিবার জন্য ঐ সকল অবস্থা ভোগ করিতে হয়।

বিনয় ও আত্মগৌরব—সর্ব্বদা নিজকে হীন মনে করা উচিত নহে। একদিকে তৃণ হইতে নীচ, অন্য দিকে আমি ভগবৎ অংশ, আমার ক্ষমতার সীমা নাই, ধর্ম্মের সীমা নাই, পবিত্রতার সীমা নাই, ইহা বিশ্বাস করিবে। এই বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। আমি তৃণ হইতে নীচ আমার উচ্চতা বোধ করিলে তবে ইহা বলিতে পারি।

লোভ—যাহার যে বিষয়ে লোভ হয়,সেই বস্তুতে তাহার একটা আকৃতি পড়ে নাকি ? উত্তর ;—মানুষ যাহা কিছু দেখে তাহাতেই তার একটা আকৃতি পড়ে। কিন্তু সেই আকৃতি আসক্তিতেই স্থায়ী হয়। যেমন ফটো-গ্রাফ রসেতেই স্থায়ী হয়। ফটোগ্রাফের আয়নায় যে আকৃতি পড়ে তাহার কারণ রস। আয়নাতে যে রস থাকে তাহাতেই আকৃতি বদ্ধ হইয়া পড়ে। সেইরূপ যে বস্তুতে আশক্তিরূপ রস থাকে, তাহাতে আকৃতি পড়িলে আর উঠে না, একেবারে বদ্ধ হইয়া যায়। যাহাদের সেই চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারা দৃষ্টিমাত্রেই অনায়াসে ঐ ফটো দেখিতে পায়। এই সব তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলেই জানা যায়। শুনিয়া বুঝা যায় না। যে কোন বিষয়ে যাহার লোভ হউক না কেন নিশ্চয় ঐরূপ আকৃতি পড়িবে।

প্রশ্ন ;—আসক্তি হেতু বিষয়েতে যে চেহারা পড়ে তাহা কিরূপে দূর হয়? উত্তর ;—যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়েতে আসক্তি থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তই ঐ আকৃতি স্থায়ী হয়, যখনই আসক্তি চলিয়া যায়, অমনি আকৃতিটীও চলিয়া যায়।

শাক্ত ও বৈষ্ণব—শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি? উত্তর ;—শাক্ত ও বৈষ্ণবের শেষ অবস্থা এক প্রকার। কিন্তু রাস্তা ভিন্ন দৃষ্ট হয়। যাঁহারা বৈষ্ণব প্রকৃতির লোক তাঁহারা কোন প্রকারেই ঐশ্বর্য্য চান না, দাস হইতে চান। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুভক্তিই আশা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া অভয় পদ প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহাদের আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এই ঐশ্বর্য্য তাঁহারা চান না, প্রকাশও করেন না; ঐশ্বর্য্য দাসদাসীর ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করে। আর যাঁহারা শাক্ত তাঁহারা ঐশ্বর্য্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা তাঁহারা ভগবানের কার্য্য করেন, পৃথিবীর নানা মঙ্গল সাধন করেন, অবশেষে ভগবানের সেবাদ্বারা তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

ত্রিতাপ—ত্রিতাপ কখন যায়? উত্তর ;—কর্ত্তৃত্ব যতদিন আছে ততদিন তাপ যায় না। ত্রিতাপ না গেলে মানুষ মুক্ত হয় না। মুক্ত ব্যক্তিরা কর্ম্মত্যাগ করেন না, অনাসক্ত হইয়া বালকের ক্রীড়াবৎ, উন্মাদবৎ তাঁহারা সকল কার্য্য করেন। কেন যে করেন তাহা তাঁহারাও জানেন না। ভিতরে অকর্ত্তা ও বাহিরে কর্ত্তা মহাপুরুষদের এই লক্ষণ। কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকিলে কোন তাপই স্পর্শ করে না।

প্রশংসা ও নিন্দা—সরল হৃদয়ে লোকের প্রশংসা করিলে ঈশ্বরোপাসনার কার্য্য হয়; এবং নিজের পাপ তাপ পলায়ন করে, শান্তির উদয় হয়। নিন্দায় নিজের সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

ব্রাহ্ম সাধনার্থীর প্রতি—ধর্ম্মসাধন কোন প্রকার কল কৌশল নহে

যে তদনুসারে কার্য্য করিলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যইবে। ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য জগতে নানা প্রকার প্রণালী আছে। সেই অসংখ্য প্রণালীর একটা মাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ধর্ম্ম লাভ করিতে যত্ন করিয়া থাকি। এ প্রণালীতে (গোস্বামী মহাশয়ের অবলম্বিত প্রণালী) সাধন করিলে কেহ শীঘ্র কেহ বিলম্বে ফল লাভ করিয়া থাকেন। অনেক বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ নিরাশ হইয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রণালী মতে কার্য্য করেন। ভগবৎ কৃপা ভিন্ন কোন প্রণালীদ্বারা সহজে কিছু হয় না।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালী ত্যাগ করিয়া যখন আর একটা পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন হঠাৎ কিছু করা ভাল নহে। আমাদের কার্য্যকলাপ ভাল করিয়া আলোচনা করুন, পরীক্ষা করুন। লোকের মুখে কিছু শুনিয়া হঠাৎ তাহাতে প্রবেশ করা উচিত নহে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে উপাসনা যাহা করিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইলে সেই প্রণালীতে যাঁহারা তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন, হঠাৎ অন্য সাধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

ব্রাহ্মসমাজ—যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে সাধনা দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞানের আভাস পাইয়াছিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার মনে হয় কতকগুলি ভাল বৃক্ষের বীজ একত্র হইয়াছে। তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব বৃক্ষ আছে। কিন্তু বীজ হইতে বৃক্ষ বাহির করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় তাহা হইতেছে না। ব্রাহ্মসমাজে গেলে কি উপবীত ত্যাগ করিলে ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া হয় না, যথার্থ ধর্ম্মার্থী হইয়া যাওয়া চাই।

উচ্চ অবস্থা—দারজিলিং গিয়া যতক্ষণ নীচে ছিলাম বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাড়ী, নদী প্রভৃতি পৃথক পৃথক দেখিলাম। ক্রমে উপরে উঠিতে উঠিতে

যখন উচ্চ শিখরে উঠিলাম তখন সমস্ত একাকার বোধ হইল; একটী আকাশে যেন সমস্ত আবৃত হইয়াছে। এইরূপ ধর্ম্মের সোপানে সেই অনন্ত ভূমা পুরুষের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার সত্তাতে নিশ্চয়ই সমস্ত আচ্ছন্ন বোধ হয়। তখন পৃথক পৃথক কল্পনা করাও যায় না।

শরীর ও আত্মা—পূর্ব্বে শরীরে একটু পাড়া হইলেই মন খারাপ হইত। এখন দেখি শরীর ও আত্মা সম্পূর্ণ দুইটা বস্তু। যেমন হিমালয়ের নিকটে গেলে শরীরে শীত বোধ হয়, সেইরূপ শরীরে কোন ব্যথা কি পীড়া হইলে জানা যায় মাত্র, ভোগ হয় না; ভোগ শরীরেরই হয়।

সাধনের উপযুক্ত স্থান—যথার্থ উপযুক্ত স্থান হিমালয়; তৎপর নর্ম্মদা, গোদাবরী, গঙ্গা, যমুনা এই সকল নদীর তীরস্থ প্রস্তরময় স্থান এবং পঞ্জাবের রাভী নদীতীরস্থ স্থান। বঙ্গদেশ নানাকারণে উপযুক্ত নহে, এ স্থানের জল, বায়ু, মৃত্তিকা সমস্তই বিরোধী।

হিমালয়;—হিমালয়ে বৌদ্ধ লামাদিগের মঠ আছে। আমি সেখানে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। তাঁহাদের সাধনপ্রণালী দেখিয়া আনন্দ হইল।

মৃত্যু মনুষ্যের হাতে নয়—দ্বারভাঙ্গায় সাতজন ডাক্তার একমত হইয়া আমাকে বলিলেন অদ্য ৩ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইবে (দ্বারভাঙ্গায় ইনি এক-বার সঙ্কটাপন্ন রোগে পড়িয়াছিলেন)। সেই দিন সন্ধ্যায় আমি উঠিয়া বসিলাম, এবং ৩ দিন পরে কলিকাতা আসিলাম। ঢাকাতেও মৃত্যু হইবে বলিয়া ডাক্তার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জাতি বিচার—শূদ্র ঘরে গেলেই খাদ্য নষ্ট হয় না, শূদ্রেও ব্রাহ্মণত্ব আছে। গুণ দ্বারাই জাতির বিচার করিবে। যাঁহাদের একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাঁহারা শত চেষ্টা করিয়াও জাতিভেদ রাখিতে পারেন না।

নামসাধন—প্রতি নিয়ত নাম করিতে করিতে শরীরে এক অভিনব

সৌন্দর্য্য জন্মে। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে যাহাদের ভগবানের নাম হয় তাঁহারা ধীরে ধীরে ভাগবতী তনু লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের রক্তমাংসে, প্রতি লোমকূপে, অস্থিতে আপনা আপনি নাম হইতে থাকে।

বিশ্বাস বস্তুটি সত্য বস্তু। যাহা সত্য তাহা নিত্য। বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইলে পুনরায় তাহা যেমন বীজে প্রবিষ্ট হয় না, তেমনি বিশ্বাস একবার উৎপন্ন হইলে তাহা আর কখনই বিনষ্ট হয় না।

ধর্ম্ম লাভের ইচ্ছা থাকিলে সংসার ত্যাগ করিতে হয় না। মানুষের বাসনা, কামনা, প্রভৃতির অশান্তিই সংসার। তাহা থাকিতে সংসার ত্যাগ করিলেও তাহা যায় না।

পায়খানায় বসিয়া রসগোল্লা খাওয়া যায় না। প্রাণটা পায়খানার মত থাকিলে ভগবানকে সম্ভোগ করা যায় না। সাধন ভজন দ্বারা উহা পরিষ্কার করিতে হইবে। সাধনে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, কেবল প্রস্তুত হইয়া থাকা কখন তিনি আসিবেন।

মানুষের কিছু স্বাধীনতা আছে; যেমন দড়িবাঁধা গরু। দড়ি যতদূর লম্বা গরু ততদূর যাইতে পারে, ততোধিক নয়। সেইরূপ মানুষের প্রবৃত্তি যতটুকু ততটুকুই স্বাধীনতা। চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ যতদূর শক্তি ততদূর। তার বাহিরে ক্ষমতা নাই। নিজের ছেলেতে কেমন ভালবাসা, পরের ছেলেতে তেমন নাই। হাজার চেষ্টা করিয়াও পারা যায় না।

জগতের যে বস্তু স্বভাবে আছে তাহাতেই আনন্দ। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষলতা, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী সমস্তই আনন্দময়। মনুষ্যও যতটুকু স্বভাবে থাকে ততটুকু আনন্দ পায়। তাহার স্বভাবের যত বিকাশ হয় আনন্দের তত বৃদ্ধি। যাহারা পাপ চিন্তা দ্বারা স্বভাবকে বিকৃত করে তাহারা নিরানন্দ ভোগ করে। পাপে শরীর রুগ্ন হয়, মন অপবিত্র

হয়। পুণ্য লাভ করিয়া স্বভাবস্থ না হইলে আনন্দ লাভ হয় না। রোগ, ও পাপ যন্ত্রণায় জীবন গত হয়।

এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাঁকে চাই। প্রাণ তাঁর জন্য কাঁদে। আমার প্রভুকে যদি কেউ ডাকে অমনি আমার প্রাণ কেড়ে লয়। তাঁকে যে যা বলিয়া ডাকুক—হরি, রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, খোদা, আল্লা, সূর্য্য, জল কিছুতেই ক্ষতি নাই। তাঁর কোন নাম নাই। ভক্তেরাই নামকরণ করেন। যে নামে পাপ হরণ হয় তাহাই হরিনাম।

মনে সর্ব্বদাই সংকল্প বিকল্পের উদয় হইতেছে। ইহাতে মনের স্থিরতা নাই। ইহার কারণ দুইটি ইন্দ্রিয় প্রবল—জিহ্বা ও উপস্থ। উপস্থ লোকে অনায়াসে দমন করিতে পারে কিন্তু জিহ্বা সহজে বশে আনা যায় না। কেহ নিন্দা করিয়া কটু বাক্য বলিলে জিহ্বা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিবে। এই জিহ্বা বশীভূত হইলে নিন্দা প্রশংসা মনকে চঞ্চল করিতে পারে না।

শিষ্যদের প্রতি ঃ—

(১) সত্য বাক্য বলিবে। (২) পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। (৩) পিতা মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। (৪) পতি ও পত্নীর মধ্যে ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, কদাচ কেহ কাহারও অনাদর, অযত্ন ও অপমান করিবে না (৫) প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞের—দেবযজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ও ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে (৬) হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ প্রভৃতি যাবতীয় সাধু ভক্ত দিগকে ভক্তি করিবে। সাধুদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ সম্প্রদায় বা বর্ণাশ্রমের বিচার করিবে না। (৭) আপনাকে কোন সম্প্রদায় বা দলভুক্ত মনে করিবে না। যিনি যে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় ভুক্ত তিনি তাহার অন্তর্গত থাকিয়া

সাধন করিবেন। (৮) তামাক ব্যতীত সকল প্রকার মাদক সেবন বর্জ্জন করিবে। উহা সাধনের ঘোর অন্তরায়। (৯) মৎস্য ভক্ষণ করিবে না। ইহা তমোগুণ বর্দ্ধক। পীড়ার জন্য আবশ্যক হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু রোগ সারিলেই পুনরায় ছাড়িবে। (১০) উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। কিন্তু পিতা মাতার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ জ্ঞানে ভক্তির সহিত খাইবে।

ভক্ত ও ভগবান—ভগবান প্রথমে বামন অবতার হইয়া মানবাত্মা রূপ অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। মনুষ্য সংসারের ধর্ম্ম করিতে বসিয়া অত্যন্ত অভিমান প্রকাশ করে। আমি দাতা, আমি জ্ঞানী, আমি ভক্ত, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দেবগণের রাজা। মানুষের এই ধর্ম্মাভিমান দেখিয়া পরমেশ্বর বামন হইয়া অর্থাৎ আত্মার আত্মা হইয়া মানুষের নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। ত্রিপাদ শুনিতে সামান্য, কিন্তু উহাই জীবের সর্ব্বস্ব। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ। ভগবান্ ত্রিপাদ ভূমি অধিকার করিয়া বিরাট মূর্ত্তি গ্রহণ করেন এবং জীবের সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া নিয়ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বামনদেব বলীর দ্বারে দ্বারী হইয়া পাতালে ছিলেন ইহার অর্থ;—যে ব্যক্তি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ তাঁহার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাঁহার আর কোন ভাবনা ভাবিতে হয় না।

আত্মজ্ঞান—জন্ম ও মৃত্যু মোহ। যখন জন্ম ও মৃত্যু বৃক্ষের পত্র পতিত হওয়া ও গজানবৎ বোধ হইবে তখনই যথার্থ আমি কি বুঝিতে পারিবে। কোন ঘটনা আত্মাকে স্পর্শ করাই অধীনতা।

ব্রহ্মলাভ—অধ্যাত্মযোগ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হইলে যে সমাধি হয় তাহাতেই ব্রহ্ম লাভ হয়, ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন এরূপ সমাধি হয় না।

ব্রহ্মের দুইটী ভাব, নিত্য ও লীলা। নিত্যসাধন গীতাতে এবং লীলাসাধন ভাগবতে ব্যক্ত হইয়াছে।

আমার পরিচালক—আমার এখন গমনাগমন নিজের ইচ্ছাধীন নহে ; পৌষমাসে যদি পশ্চিমে যাওয়া হয় তবে তথা হইতে কোথায় যাইব কিছুই জানি না। এজন্য কোন বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমার ক্ষমতা নাই। সমস্ত কার্য্যই ভগবানের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়।

প্রার্থনা—প্রভু, আমি গলায় পাথর বেঁধে সাগরে ডুবেছি, এখন আমার নিজের শক্তি নাই, তুমি উদ্ধার কর।

তুমিই সব। হে প্রভু, কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে। হে ঠাকুর তুমিই সব। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার রচনা, তোমার দয়ার পরিচয়। তুমি পিতা, তুমি মাতা, ভাই, ভগিনী। প্রভু তুমি দাতা, তুমি রাজা, প্রজা, স্বাধ্বী স্ত্রী সকলই তুমি। চোর, ডাকাত, সাধু, লম্পট সকলই তুমি। সমস্ত প্রশংসা, স্তব, স্তুতি, ভালবাসা সকলই তোমার। তুমি বাজীকর, কেবলই ভেলকি খেল। সার তুমি, বস্তু তুমি, প্রয়োজন তুমি। ইহলোক, স্বর্গলোক, যমলোক, সত্যলোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক, পিতৃলোক, মাতৃলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলক, সকলই তুমি। আমি কিছু না, কিছু না, ছাই ভস্ম কিছুই না। তুমি আমার ঘরবাড়ী, তুমি আমার দর্পণ। মধুর তুমি, মধুর তুমি, মধুর তুমি। মধুরং, মধুরং, মধুরং, মধুরং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।*

তিনি পরমাত্মা পরমধন, পরব্রহ্মে ভুলনারে মন।
(তিনি জীবের জীবন) (তিনি পতিতপাবন)
ব্রহ্মনামটী বলরে রসনা, কথা শোন্‌রে ও মন।
এই বেলা দিনতো ব'য়ে যায়, ঐ দেখ শিয়রে
বসিয়ে শমন করিছে বন্ধনেরি আয়োজন।

ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা।
ও মন দয়ালনাম সাধন হ'লে, শমন ভয় আর র'বে না।
ওরে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার'
যদি ভবে হ'বে পার ;
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কুপথগামী হ'য়ো না।
ওরে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কারো নয় ; মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্‌লে না।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান ;
ভুলনা তাঁহারে মন ভুলনা কখন।
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়া দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।

* গোস্বামী মহাশয়ের রচিত কয়েকটী সঙ্গীত গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে ; আরও যে কয়েকটীর নাম জানা গিয়াছে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

হৃদয় কপাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
দাও প্রীতি অঞ্জলি, কর দরশন।

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হ'বে কিছু দিনান্তর।
হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা র'বে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে র'বে, হ'য়ে শবাকার।
পিতামাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন,
গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।
এখন প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ-গমন,
কুৎসিৎ ভাবে দর্শন নরনারী চয়।
সর্ব্বলোক অপমান, অনাথ-অর্থ-হরণ,
পরনিন্দা পরপাড়া কর পরিহার।

নির্ম্মল হইবে যদি মুখে দয়াল বলরে,
নির্ম্মল হইবে যদি (রসনারে)
প্রভুর নামরসানে মাজ হৃদিরে।
ঐ দয়াল নাম সুধাসিন্ধু, এ নাম কর্ণে লওরে এক বিন্দু,
(ওরে রসনা) ঐদয়াল নাম সিংহেরই শব্দ,
শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ। (ওরে রসনা)

বাসনা করেছি মনে দেখিব তোমায়;
তোমার করুণা বিনা না দেখি উপায় হে
পাপে মলিন আমি দিবস যামিনী,

দয়া করি ত্রাণ কর দেখি দীনহীন হে।
দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে
লয়েছি শরণ পিতা দেহ দরশন হে।

এই বাসনা করিহে প্রভু, হৃদয়ে ধরিয়ে রাখি তোমার শ্রীচরণ।
হবে শান্তমন, যাইবে দুঃখ পাইব অমূল্য ধন।
তুমি নাকি পাপী দেখি, করহে তারণ, তায় শুনে এসেছি নাথ,
লইলাম তব শরণ।

আমার এই বাসনা করহে পুরণ,
ওহে অনাথ নাথ, অধম তারণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি,
হৃদয় মন্দিরে সদা দাও দরশন।
না চাহি বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ,
তা'হলে যাইবে দুঃখ আনন্দে হ'ব মগন।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ!
হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ পথ পরিহরি,
কেমন এ প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীনশরণ, কর কর কর ত্রাণ
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের হস্তাক্ষর।

প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল.
আর সইতে নারি কাতর প্রাণে,
পাপেতে মন ডুবিল।
এখন যে দিকে হেরি হে দয়াময়
দেখি প্রেমহীন শুষ্কভাব মলিনহৃদয়,
কোথাও নাহিক সুখ মনের দুখে
ভ্রমিতেছি হয়ে ব্যাকুল।
তুমিত নাথ প্রেমেরি সাগর,
এসেছি তোমার দ্বারে হইয়ে কাতর,
পূরাও পূরাও আশা প্রেম দানে
তাপিত প্রাণ কর শীতল।

চিরদিন জ্বলিব কি হৃদয়অনলে প্রভো।
কৈ বিষয় বাসনা, পাপের বেদনা এখনোত ঘুচিল না।
দেও দরশন, জুড়াই হে নয়ন, নাহি প্রয়োজন অন্য কোন ধন।
প্রভু তোমার চরণ অমূল্যরতন, আমি শুনেছি হে;
দুখানলে দগ্ধ হ'ল হে জীবন, ওহে দীননাথ, লইলাম শরণ।
দরিদ্রের দুঃখ করহে মোচন, দরিদ্রের দুঃখহারী হে।

চেয়ে দেখ নাথ, একবার এ অধম সন্তানে,
পাপে তাপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়া দানে।
তোমা বিনা বল আর, কে করিবে নিস্তার,
কে তারে কাতরে, ওহে কাতরশরণ,
দয়াগুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে।

কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
(ভূষণ বাকি কি আছেরে, প্রেমমণিহার পরেছি)

দয়াল নামের যদি করেছ ভাই সুধাপান,
তবে থেকো না মোহে আর অচেতন।
নামে পাতকী তরে যায়, অনন্ত জীবন পায় ;
বল বলহে বদন ভ'রে সর্ব্বক্ষণ।
পাপে তাপে পুড়ে মরি, দেখ সব নরনারী,
হাহাকার করিতেছে না দেখে উপায়।
তুমি পাইয়ে দয়াল নাম রবে কি হয়ে বাম।
পিতার করুণা বলিতে কি লজ্জা হয়।
এস সব ভাই মিলে, মহানন্দে প্রেমে গলে,
দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্ত্তন।
পাপ যন্ত্রণা দূরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে,
এ নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় পরিত্রাণ।

প্রেমগিরি-কন্দরে যোগী হইয়ে রহিব,
আনন্দ নির্ঝর বারি দুহাতে পান করিব।
মিটাতে বিষয়তৃষা সংসারের কূপজলে আর যাব না,
হৃদয়করঙ্গ ভরি শান্তিবারি পান করিব।

সম্পূর্ণ।

শ্রীবঙ্কবিহারী কর প্রণীত

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

জীবনবৃত্তান্ত।

স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যে জীবনী আপনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে উপাদেয় হইয়াছে। তাহাতে এই সাধক মহাত্মার পরিচয়টী অতি উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই চরিতগ্রন্থ রচনায় আপনারও যথেষ্ট নিষ্ঠা, নৈপুণ্য ও সংযম প্রকাশ পাইয়াছে। পুস্তকটির মধ্যে কোথাও আপনি সাম্প্রদায়িক উগ্রতাকে প্রশ্রয় দেন নাই, অথচ সাম্প্রদায়িক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়া যে পবিত্র জীবনস্রোত সমুদ্র-সঙ্গমে যাত্রা করিয়াছে তাহার ইতিহাস আপনি অসঙ্কোচে সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করিয়াছেন ইহা দেখিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছি। আমি আজ কাল লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি, নতুবা এরূপ গ্রন্থের উপযুক্ত সমালোচনা আমি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই করিতাম।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনচরিত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। গোস্বামী মহাশয় আমার সহাধ্যায়ী ও ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। আমি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছি। বঙ্কবিহারীর লিখিত জীবনচরিতে সেই মহৎ জীবনের ভাব বহুল পরিমাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার ভাষা ও ভাব উভয়ই প্রশংসনীয়।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"ভক্তজীবনী ও ভক্তিগ্রন্থ একই বস্তু। ইহা একখানি

ভক্তিগ্রন্থ। যাঁহারা ভক্তিপন্থাবলম্বী এ গ্রন্থ তাঁহাদের ভক্তি সাধনের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।”

৺মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় লিখিয়াছেন;—“তোমার রচিত জীবন-চরিত পাঠ করিয়া আমি যে কেবল সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা নহে আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়া তুমি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছ, আমার অনেক ধর্ম্মবন্ধুর মত এ বিষয়ে আমার মতেরই অনুরূপ। যেরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ, তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলার সহিত তুমি উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছ তাহা আরও প্রশংসনীয়। আমি তোমার কয়েকখণ্ড পুস্তক ক্রয় করিয়া আমার পরিজনমধ্যে বিতরণ করিয়াছিলাম; তখন আমাদের পরিবারবর্গ নিদারুণ শোকের উত্তাপে জ্বলিতেছিল। উক্ত গ্রন্থ তাহাদের উত্তপ্তহৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়াছে। যখন আমি সর্ব্বপ্রথম পুস্তক প্রাপ্ত হই, তখন শারীরিক মানসিক অত্যন্ত পীড়িত ছিলাম। কিন্তু সেই অবস্থায়ও তোমার প্রেরিত গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ না করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারি নাই। একবার পড়া হইলে কয়েকটী ধর্ম্মবন্ধুর সহিত মিলিয়া কোনও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু পাঠ ও শ্রবণ করিয়াছি, পড়িতে পড়িতে শুনিতে শুনিতে কতবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, কতবার ভক্তিভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হওয়ায় আমরা পুস্তক বন্ধ করিয়া ধ্যানে ডুবিয়া গিয়াছি। অহিংসুক, নিরপেক্ষ, ধর্ম্মপিপাসু যে কোন ব্যক্তি তোমার পুস্তক পড়িলে তাঁহার নিকট একটা অপূর্ব্ব অত্যুদার, অতুলনীয় মহিমাময় রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে।”

প্রবাসী—“গ্রন্থকার বহু অনুসন্ধানে এই প্রেমিক ভক্ত সাধু পুরুষের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাষা সরল ও